বিক্ষোভ

শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন

দ্বিতীয় খণ্ড

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৪১

মূল্য আড়াই টাকা

বন্দীপর্ব্ব

বিক্ষোভপর্ব্ব

বন্দীপর্ব্ব

বন্দিনী

১

ট্রেন ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি আসিলে লতিকার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। কাহাকে বলিবে—সে কি জন্য আসিয়াছে? কে তাহাকে চিনিবে? লতিকার মনে হইল, সে আসিয়া ভাল করে নাই। সে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ফিরিবে কোথায়? মনকে সে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিল। নাই বা তাহাকে কেহ চিনিল, তাহাতে ভয়ের কারণ কি থাকিতে পারে? অপর সকলের মতই সে লবণ তৈয়ারী করিবে। কিন্তু পুলিসের অত্যাচার। তাহাই কি হয়। মেয়েদের গায়ে কি সত্যই তাহারা হাত দিবে? তবে দুঃখ যদি দেয়ই—সহ্য করিবে, কত দুঃখই ত সে সহ্য করিতেছে। ধরিয়া লইয়া গেলেই বা তাহার কি ক্ষতি হইবে? বাহিরে থাকিয়াও তো তাহার কোনো আশা-ভরসা নাই, জেলের ভিতরেও থাকিবে না।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। হঠাৎ জয়ধ্বনি শুনিয়া জানালা দিয়া লতিকা মুখ বাড়াইল।

দশ-বার জন তরুণ যুবক শুভ্র খদ্দর-বিভূষিত হইয়া জাতীয় পতাকা হস্তে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিল।

লতিকা তাড়াতাড়ি তাহার কামরা হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কাছে গিয়া বলিল, আপনারা আমায় নিয়ে যাবেন? আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

তাহার অপ্রত্যাশিত আগমনে যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কিন্তু কেহ কোন কথা বলিল না, সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

লতিকা মিনতি করিয়া বলিল, আপনারা আমায় নিষেধ করবেন না, কোন অসুবিধা আমি আপনাদের ঘটাব না।

ট্রেন চলিয়া গেল।

দলের নেতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কোন কথা হতে পারে না, অনুগ্রহ করে ষ্টেশনের বাইরে চলুন।

সকলে বাহিরে আসিলে যুবকটি লতিকার সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি না—আপনি আমাদের দলের নন।

তাহার কথা শুনিয়া লতিকা দমিয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না, কি করিলে সে তাহাদের দলের লোক হইতে পারবে। জিজ্ঞাসা করিল, কি হলে আপনাদের দলে যেতে পারবো?

যুবকটি তাহার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া সে মরমে মরিয়া গেল।

লতিকা অপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিল, আমার কোন হাত ছিল না। কাল সন্ধ্যা অবধি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—আমি কংগ্রেসের কাজ করবো।

—না ভাবলেও এ কাপড় আপনার অনেক দিন আগেই পুড়িয়ে

দেওয়া উচিত ছিল। বলিয়া যুবক তাহার দলের ছেলেদের লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

নিরুপায় হইয়া লতিকা তাহাদের পিছনে পিছনেই যাইতেছিল। সহসা যুবকটি তাহার দিকে ফিরিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, আপনি কেন আমাদের সঙ্গে আসছেন? কিছুতেই আমরা আপনাকে দলে নিতে পারব না।

ক্ষোভে ও অপমানে লতিকা বজ্রাহতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। কিছু দূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া লতিকার ভয় হইল, হয়তো তাহার লাঞ্ছনার এখনও শেষ হয় নাই।

যুবকটি লতিকার কাছে আসিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, আপনাকে এভাবে বলা আমার ঠিক হয়নি, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে নিয়ে যেতে আমার কোন আপত্তি ছিল না।

আশান্বিত হইয়া লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে সঙ্গে যেতে বারণ করছিলেন কেন, মেয়ে ব'লে?

ছেলেটি জিভ কাটিয়া উত্তর দিল, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আপনি নারী, কিন্তু অবলা নন।

—তাহলে আমাকে সঙ্গে নিতে আর কি বাধা থাকতে পারে?

যুবক ধীর ভাবে জবাব দিল, দেখুন, সব কাজে নিষ্ঠা থাকা দরকার। বে-আইনী ভাবে সামান্য একটু নুন তৈরী করে গভর্ণমেণ্টের কি ক্ষতি করতে পারি আমরা, যদি এর পেছনে আমাদের নিষ্ঠা না থাকে। এ রকম বে-আইনী নুন তৈরী এদিককার লোক তো রোজই করে।

তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভেতরে নিষ্ঠার অভাব রয়েছে, কি করে জানলেন আপনি ?

—কি করে জানলুম ? আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না ? আপনি কি সমস্ত কষ্ট, সব দুঃখ, সকল রকম লাঞ্ছনা অপমানের কথা ভাল করে তলিয়ে দেখেছেন ? আপনি কি সে সব সইতে পারবেন ? এ সব সহ্য করবার শক্তি কি আপনার আছে ? আপনি এখনও খদ্দর পরেননি ! মিহি সূতোর কাপড় পরে এসেছেন আইন অমান্য করতে ?

তাহাকে বাধা দিয়া লতিকা কঠিন স্বরে বলিল, আপনি আমাকে আজ যে অপমান করলেন, এর চেয়ে কি বেশী লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে নুন তৈরী করলে ?

যুবক অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, অপমান ! অপমান আমি আপনাকে করিনি, সে ইচ্ছাও আমার নেই। আপনাকে শুধু আমি জানিয়েছি, সঙ্গে করে নিতে পারব না। আপনার যদি একান্ত ইচ্ছা থাকে—আপনি একলা নুন তৈরী করতে পারেন। ওই কাপড় পরে থাকা পর্য্যন্ত আপনাকে আমাদের সঙ্গে নেওয়া অসম্ভব।

লতিকা সহাস্যে বলিল, তা এ কথা আগে বললেই হতো, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে এত লোক জড় না করলেও চলতো। দিন আপনার একখানা খদ্দর, আমি ওয়েটিংরুম থেকে বদলে আসছি।

যুবক কাঁধের গাঁঠরি হইতে একখানি কাপড় বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। লতিকা কোন রকমে হাসি চাপিয়া ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিল।

মিনিট দশেক পরে শুভ্র খদ্দরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লতিকা তাহার পরিত্যক্ত বস্ত্র যুবকের হাতে দিয়া শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, দিন ওখানাতে আগুন ধরিয়ে, সেই আলোতে আমাদের জয়যাত্রা সুরু হোক।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যুবকদল—বন্দে মাতরম্, গান্ধীজি কি জয়—বলিয়া চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

২

তখনও বেলা আটটা বাজে নাই।

দুই মাইলের পথ, খানিকটা কাঁচা রাস্তা—রাস্তা তাকে বলা চলে না, পায়ে চলার পথ—তারপর ঝোপ ঝাড়। খানিকটা খোলা জায়গা—ছোট একটা মাঠ, তারপর বনজঙ্গল।

লতিকার পথ চলিতে খুব কষ্ট হইতেছিল, জীবন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

দলের নেতা যুবকের নাম জীবন।

লতিকা উত্তর দিল, না। তবে একেবারে হচ্ছে না বলি কি করে? কোনদিন এতটা পথ পায়ে হেঁটে চলিনি কি না। আমাদের আর কত দূর যেতে হবে?

—এসে পড়েছি, আধ মাইলটাক হবে।

—আপনি কি করে জানলেন, এর আগে কোনদিন এখানে এসেছেন?

—আসিনি? এসে দেখে গিয়েছি—নইলে জায়গা ঠিক করবো কোত্থেকে?

ইহার পর তাহারা নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। মিনিট কয়েক পরে জীবন হাঁকিল, ডান দিকে।

তারপর লতিকাকে মৃদুস্বরে বলিল, খুব সাবধানে চলবেন, বড্ড কাঁটা এখানে, মাঝে মাঝে দু'একটা সাপও দেখতে পাবেন। ভয়ানক সাপ, কামড়ালে আর রক্ষা নেই।

সাপের কথা শুনিয়া লতিকা শিহরিয়া উঠিল। জীবনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে ভয় ও আশঙ্কার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

একটু পরে তাহারা একটা বিলের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবন হাঁকিল, থাম।

এই বিলটিকে স্থানীয় লোকেরা লোনা বিল বলে। সমুদ্র এখান হইতে সোজা দুই মাইলের পথ। পঞ্চাশ-ষাট গজ দূর দিয়া একটা বিশাল নদী সাগর বক্ষে পড়িয়াছে। বর্ষার সময় নদী ও বিল এক হইয়া যায়।

•

যুবকের দল একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিল। লতিকা একটু দূরে বসিল।

জীবন বসিল না। সে একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া বিলের ধারে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর নয়, এবারে সবাইকে কাজে লাগতে হবে। তাহার কথা শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের এখন কি করতে হবে?

জীবন উত্তর দিল, আপনি ববং আর একটু জিরিয়ে নিন, পথ চলতে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।

লতিকা ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, এ কি কখনও হতে পারে? আমি যে আপনাদেব সহযাত্রী—এক পথেব পথিক। বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে আমার, গলাটা ভেজাতে পাবলে আমি সব কাজ কবতে পাববো।

তাহাব কথা শুনিয়া জীবন চিন্তিত ভাবে বলিল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! এ জল তো মুখে দেওয়া যাবে না, জল আনতে গাঁয়ের ভেতর যেতে হবে, মাইলখানেকেব পথ।

লতিকা অপ্রতিভ ভাবে কহিল, এত হাঙ্গামা করে কাজ নেই। না হয় পবেই জল খাব, এখন কাজে লেগে যাই। কি কবতে হবে হুকুম করুন।

জীবন তাহাব সহকর্ম্মীদিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিল, তোমাদের সবাবই জল তেষ্টা পেয়েছে। বিপিন ভাই, তুমি ববং ছুটে গিয়ে গাঁ থেকে এক ঘড়া জল নিয়ে এসো। আব শোন, ফেরবাব সময় পয়সা আটেকেব মুড়কি কিনে আনবে, এই নাও পয়সা।

বিপিন দ্রুতগতিতে গ্রামেব দিকে চলিয়া গেল। জীবন বলিতে লাগিল, এবার সবাই কাজে লেগে যাও। চারটে বড় উনুন তৈরী কবতে হবে, দাগ কেটে এসেছি—কোথায় করতে হবে। তুজন উনুন তৈরীতে লেগে যাও, তুজন কাঠ কেটে নিয়ে এসো। যোগেশ, হাঁড়িগুলো বের কর, মাপ ঠিক হওয়া চাই। কাঠ পুড়বে অনেক, খুব বেশী করে গর্ত্ত করতে হবে। তাহার পর সে লতিকাকে বলিল, আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, উনুন তৈরী করা দেখিয়ে দেবেন আসুন।

সকলে উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেল। একটা লোক বনের

ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। খানিক পরে সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

রৌদ্রে লতিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। রাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই, তাহার উপর পথের ক্লান্তি। তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। জীবন বলিল, আপনি এখন গাছতলায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

খানিকটা সুস্থ হইলে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, রাত্তিরেও কি আমাদের এভাবে গাছতলায় কাটাতে হবে? জীবন কহিল, সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।

আরও কিছুক্ষণ কাটিলে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সবাইকে কি আজই ধরে নিয়ে যাবে?

জীবন কহিল, কোন সন্দেহ নেই।

একটু পরে বিপিন জল লইয়া উপস্থিত হইল। সকলে তাড়াতাড়ি জল খাইতে যাইতেছে দেখিয়া জীবন বলিল, আর সবাই একটু রয়ে সয়ে। ওঁর তেষ্টা মিটলে, তোমরা সবাই একটু একটু করে খাবে; এর পর জল আনতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে পারবে না। ইহার পর লতিকার পক্ষে আকণ্ঠ জল পান করা অসম্ভব। কোন প্রকারে সে গলা ভিজাইয়া লইল।

জীবন হাঁক দিল, এবারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

ছেলের দল জীবনকে ঘিরিয়া গাহিতে লাগিল, ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। এ গান লতিকা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। এত বাংলা গান থাকিতে কেন তাহারা হিন্দি গান গাহিতেছে লতিকা বুঝিতে পারিল না। গানের সুর শুনিয়া তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। খুব সোজা সুর, কত উন্মাদনা তাহাতে রহিয়াছে। বাংলা গান স্বদেশী যুগের গান। বাংলার কবি এবার নীরব, বাঙালীকে হিন্দি-ভারতীর শরণ

লইতে হইয়াছে। জয়ধ্বনির সহিত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইল।

জীবন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, আজকে আমাদের শুভদিন। ভারত-মাতা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর এক কন্যাকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, তাঁর মুক্তি সাধনায় পৌরোহিত্য করতে। ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, ভারতের পুণ্যতীর্থ ডাণ্ডীতে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং সর্ব্বপ্রথম আইন অমান্য করে নুন তৈরী করেছেন। ভারত-নারীর পক্ষ থেকে, আজ এখানে, আমাদের সম্মানিতা সহ-কর্ম্মিণী সর্ব্বপ্রথমে আইন অমান্য করবেন। এস আমরা সকলে জয়ধ্বনি করি। বল বন্দে মাতরম্—মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়—ভারত-নারীকি জয়!

সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। লজ্জায় ও আনন্দে লতিকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে ধীর পদক্ষেপে বিলের ধারে গিয়া হাঁড়ি করিয়া জল আনিয়া উনানে বসাইল। তারপর উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। যুবকদলও চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। সেই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল।

আরও তিনটা উনানে লোনা জল চড়ানো হইলে জীবন বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে কষ্ট পেতে হবে না। যোগেশ ও সুরেশ তোমরা দুজন এখানে থাকবে, আর সবাই গাছতলায় বসবে চল।

ছায়ায় আসিয়া ছেলেরা যে যার মত শুইয়া পড়িল। লতিকা বসিয়া আছে দেখিয়া জীবন বলিল, আপনিও শুয়ে পড়ুন না কেন? ঘুমে আপনার চোখ জড়িয়ে আসছে। লতিকাকে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইল না, সে শুইয়া পড়িল।

জীবন বিলের ধারে গিয়া সুরেশ ও যোগেশকে বলিল, তোমরা দুজনেও গিয়ে একটু জিরোও, আমি এখানে রয়েছি।

—আপনি একা থাকবেন, বড্ড কষ্ট হবে যে!

—এটুকুও যদি সহ্য করতে না পারি তাহলে এখানে এসেছি কি করতে?

তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

হাঁড়ির জল কমিতেছে দেখিয়া জীবন বিল হইতে জল আনিয়া তাহাতে দিল। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে জল মরিয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া আসিল। জীবন হাতছানি দিয়া ডাকিতেই যোগেশ, সুরেশ ও বিপিন তাহার নিকট আসিল। সকলে ধরাধরি করিয়া হাঁড়িগুলি মাটিতে নামাইয়া রাখিল।

লবণ দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেদের কি উত্তেজনা, গোলমাল শুনিয়া লতিকার ঘুম ভাঙিল, সেও ছুটিয়া দেখিতে গেল।

জীবন লতিকাকে বলিল, আপনি সবাইকে একটু করে নুন দিন, আমরা চেখে দেখি।

সকলে কলরব করিয়া নুন চাখিতে লাগিল। আমায় আর একটু —জীবনদার চেয়ে আমার কম হয়েছে—চমৎকার হয়েছে—বড্ড লোনতা—বেশ ফরসা—আর একটু সাদা হলে ভাল হত।

লতিকা হাসিয়া বলিল, নুন তো খাওয়া হলো, মুড়কি খাবেন কখন, ক্ষিদে পায়নি আপনাদের?

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। একজন কহিল, তেষ্টায় কিন্তু ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

লতিকা বলিল, আসুন, আমি জল দিচ্ছি।

জীবন কহিল, দেখবেন, বেশী জল নষ্ট করবেন না। এসব ব্যাপারে একটু কড়া হতে হয়।

বিকাল তিনটার সময় জীবন অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, এখনও এল না কেন?

স্বরেশ জিজ্ঞাসা করিল, কে এল না জীবনদা?

জীবন কহিল, কিছু নয়, তোমরা আবার কাজে লেগে যাও। অ্যারেষ্ট না কবা পর্য্যন্ত আমাদের আর কোন কাজ নেই। লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, পুলিসের লোক আজ যদি আমাদের ধরে না নিয়ে যায়, কি হবে? কোথায় থাকবো আমরা?

জীবন এ কথার কোন উত্তর দিল না; ছেলেদের ডাকিয়া বলিল, তোমবা আর বসে থেকো না, যাও। সকলকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া জীবন কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিল, এতে ভাববার কি আছে? তোমাদেব যা বলা হলো করো গে।

একটি ছেলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, এভাবে নুন তৈরী করে লাভ কি হবে?

জীবন বলিল, লাভ-লোকসানের কথা এতে নেই। কংগ্রেস-কর্ম্মী আমরা—মহাত্মার হুকুম সব সময়ে আমাদের মেনে চলতে হবে। যাও, আর দেরী করো না। সে লতিকাকে কহিল, আপনারও বসে থাকা চলবে না।

লতিকা উত্তর দিল, আপনার নেতৃত্ব আমরা সবাই স্বীকার করেছি, হুকুম মানব বইকি।

সকলে ক্ষুণ্ণ মনে বিলের ধারে যাইতেছে দেখিয়া জীবন বলিল,

তোমাদেব খুবই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পাবছি, কিন্তু এসব কি আমাদেব এখন ভাবা চলে? যে কাজ কবতে এসেছি, সেটা শেষ কবতেই হবে। ভাবছো, নুন একবাব তৈবী কবেছি আব কতবাব কববো, যেটুকু নুন তৈবী হয়েছে, তাতেই আমাদেব কয়েক দিন খাওয়া চলবে। এই উদ্দেশ্যই কি আমবা এখানে এসেছি?

লতিকা জিজ্ঞাসা কবিল, আচ্ছা নুন তৈরী আমবা করছি কেন? শুধু জেলে যাওয়াব জন্যে?

জীবন কহিল, ঠিক তা নয়। জেল হতেও পাবে, না-ও হতে পাবে। এদিককার লোকেরা সব সময়ে লুকিয়ে চুবিযেই নুন তৈবী কবে। আমরা চাইছি তাদেব স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠা কবতে, তাদেব আত্ম-অবিশ্বাস ভেঙে দিতে। তাবা জানুক, তাবা শিখুক, ভয় কববাব এতে কিছু নেই। যতদিন ভয় না ভাঙবে ততদিন স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এব জন্যই হয়তো আমাদেব বোজ বোজ নুন তৈবী কবতে হবে।

তাবপব সে যোগেশ, সুবেশ ও মতিকে বলিল, তোমাদেব তিন জনকে একবাব গাঁয়ে যেতে হবে, আমাদেব খাবাব থাকবাব বন্দোবস্ত কবতে। মতি, তুমি চাল, ডাল, তেল আব আলু কিনে পাঠশালাব কাছে দাঁড়িযে থাকবে, নুন তোমাকে কিনতে হবে না। সুবেশ, তুমি এসে আমাদেব খবব দেবে, আজ বাত্রেব মত কোথাও আমাদেব আশ্রয় মিলবেন কি না। ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে তোমাব ফেবা চাই।

লতিকা তাহাব কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল, বলিল, আমরা আব এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি কবব? চলুন, সবাই নুন তৈবী কবিগে।

জীবন বাধা দিয়া বলিল, আপনাকে এখন আব ওখানে যেতে হবে না। আপনার কাজ এব পব—আমাদেব সবাইকে বেঁধে খাওযাতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীরু, কাহারও বাড়ীতে তাহাদের স্থান হইবে না। জীবন গম্ভীরভাবে বলিল, বেশ আজ রাতটা তাহলে পাঠশালার ঘরেই কাটাতে হবে।

খিচুড়ি রাঁধিয়া লতিকা সকলকে খাওয়াইল। বে-আইনী লবণের খিচুড়ি! সকলে প্রাণ ভরিয়া খাইল।

গভীর নিশীথে পাঠশালার ঘরে একাকী আঁচল বিছাইয়া শুইয়া লতিকা ভাবিতেছিল, এই দিনটা তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহিরে।

বাহিরের বারান্দায় তখন ছেলের দল গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

৩

পরদিন সকালে কলিকাতা হইতে আরও একটা নূতন দল আসিল, লতিকাকে লক্ষ্য করিয়া সে দলের অবিনাশ যোগেশকে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একে জোটালে কোত্থেকে? তোমাদের বেশ ফূর্ত্তিতে কেটেছে কাল?

যোগেশ ভীত চকিত ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

—ওরকম করছো কেন?

—চুপ, জীবনদা শুনতে পেলে—

—আরে রেখে দাও তোমার জীবনদা! সবাইকে আমার জানতে বাকি নেই। মিষ্টার দত্ত ওকে একটু ইয়ে করেন কিনা, এতেই ওর পায়া

ভাবি হয়েছে। কেন, ওকে ভয় করব কেন? আমরা কি ওর চাইতে কম স্যাক্রিফাইস করেছি?

জীবন হাঁকিল, আজ যারা এসেছ, এখনি কাজে লেগে যাও, জলের ধারে গিয়ে নুন তৈরী করগে। কালকের দলকে ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে, এক্ষুনি।

তারপর লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে থাকবেন, না আমাদের সঙ্গে যাবেন?

অবিনাশ লতিকার উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল, লতিকা কহিল, আপনার সঙ্গে যাব।

অবিনাশ সুরেশের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিল না।

তিন মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া জীবনের দল ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছিল। তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

কাছারীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সহসা জয়ধ্বনি হইতে সকলে চমকিয়া উঠিল। হাতের কাজ ফেলিয়া সকলে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কাছে আসিতে যাহাদের সাহস হইল না, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

জীবন হাঁকিল, গাও,—ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। সকলে গাহিল, বিজয়ী বিশ্বকি রভ পেয়ারা। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা হস্তে লতিকাকে পুরোভাগে রাখিয়া যুবকের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিতে লাগিল। জীবন গান গাহিল না, বে-আইনী লবণ কিনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্রমে জনতা বৃদ্ধি পাইল, কাজ-কর্ম্ম

একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কেহই বে-আইনী লবণ কিনিতে অগ্রসর হইল না। যুবকের দল গাহিল, স্বতন্ত্রতাকে ভীষণ রণসে—। কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে লইয়া একজন দারোগা আসিল। কাহাকেও গ্রেপ্তার করিল না। দূরে দাড়াইয়া সত্যাগ্রহীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ছেলেরা গাহিতেছিল,—আও পেয়ারে আও, আও—

সহসা জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভীড় ঠেলিয়া স্থানীয় প্রবীণ উকীল সতীশবাবু জীবনের কাছে গিয়া বে-আইনী লবণ ক্রয় করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লোক চারিদিক হইতে নুন চাহিতে লাগিল।

জীবন হাঁকিল, গোল করবেন না, সবাই পাবেন। সুরেশ ও যোগেশ লবণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কখন এসেছেন? কোথায় উঠেছেন?

জীবন উত্তর দিল, কোথাও উঠিনি, সোজা এখানে এসে পৌঁছেছি।

—আপনাদের খাওয়া হয়নি?

—না। সে আমরা ঠিক করে নেব এখন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—এও কি হয়? আপনারা সবাই এবেলা আমার ওখানে স্নান-আহার করলে বাধিত হব। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার মুহুরীকে বাড়ীতে খবর দিতে পাঠাইলেন।

যুবকের দল আবার গাহিল, বিজয়ী বিশ্বকি রড্ পেয়ারা, ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা—

সতীশবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, আর নয়, চলুন, বাড়ী গিয়ে

একটু জিরিয়ে নেবেন—বড্ড বেলা হয়েছে। বিকেলের দিকে তখন সমুদ্রের ধারে মীটিং করা যাবে।

জীবন কহিল, বেশ তাই হবে। কিন্তু আমাদের সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে হবে। এর ভেতরে মীটিং শেষ করতে পারবো ?

—আগে পুলিসের হাত থেকে বাঁচুন, তারপর ফেরবার কথা ভাববেন। চলুন, আর দেরী করবেন না ; বলিয়া সতীশবাবু অগ্রসর হইলেন।

ডায়মণ্ড হারবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবন দেখিল, বিলের ধারে মহা গোলমাল স্বরু হইয়াছে। লবণ খুব বেশী তৈয়ারী হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে, তাহাও গতকল্যের অপেক্ষা অনেক কম। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, কিন্তু জল আনিবার চেষ্টাও কেহ করে নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া সকলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিরক্ত হইয়া জীবন জিজ্ঞাসা করিল, সারাদিন তোমরা কি করেছো তাহলে, এখন তো সবাই ঝগড়া করছো দেখছি !

অবিনাশ মারমুখো হইয়া বলিল, তুমি তো টিপ্পনি কাটবেই। তোমায় তো নিজে থেকে কিছু করতে হয় না—হুকুম দিয়েই খালাস। আবার কত নুন তৈরী করবো ? একঘেয়ে নুন তৈরী করতে কারই বা ভাল লাগে ?

তাহার কথার উত্তর না দিয়া জীবন সকলকে লইয়া পাঠশালায় আসিল।

প্রথম হইতেই অবিনাশ লতিকার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহাকে রান্নার আয়োজন করিতে দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল, এতগুলো লোককে রেঁধে খাওয়াতে আপনার খুবই কষ্ট হবে, আপনাকে হেল্‌প করতে পারি?

লতিকা হাসিল, গভীর মনোযোগের সহিত উনানে কাঠ গুঁজিতে গুঁজিতে সে বলিল, সারাদিন খেটেছেন, পেটে একটা দানা অবধি পড়েনি; একটু জিরোবেন না আপনি?

—না, না, এতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। দেখবেন, আমি কি খাটতে পারি? হট্টগোল দেখে আপনি ভেবেছেন আমি—এ শুধু ঐ ডেঁপো ছেলেগুলোর জন্যে—কেউ কারো কথা শুনতে চায় না।

লতিকা হাসিল, মনে মনে বলিল, সবাই জীবনদা নয়।

৪

পরদিন সকালে দূর হইতে জীবন দেখিল, বিলের ধারে পুলিস আসিয়াছে। বুক তাহার দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

পুলিস দেখিয়া সকলের সে কি উত্তেজনা! সমস্বরে জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া যুবকের দল অগ্রসর হইতে লাগিল।

জীবন লতিকাকে বলিল, খুব শক্ত করে আপনি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ধরে থাকবেন, কিছুতেই যেন ছিনিয়ে নিতে না পারে। জাতীয় স্বাধীনতার প্রতীক এই পতাকার মর্য্যাদা যেন আজ নষ্ট না হয়।

অবিনাশ হাত নাড়িয়া বলিল, এ কাজটা তোমার ঠিক হচ্ছে না, যদি লাঠি মেরে পুলিস ওর হাত ভেঙে দেয়?

—দেয় দেবে। এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। শ্রীমতী গুপ্ত বরং তাতে ধন্য হবেন।

—সব তাতেই তোমার জেদ! এত সব ছেলে থাকতে, ওর ঘাড়ে তুমি এ ভার চাপাচ্ছো কেন?

—জাতীয় পতাকা বইবার শক্তি, একে রক্ষা করবার গৌরব কি আমি নারী বলে পেতে পারি না, বলিয়া লতিকা জীবনের মুখের দিকে চাহিল।

জীবন উত্তর দিল না। ছেলেদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, পুলিস হয়তো আজ একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে। গান্ধীজীর আদেশ মনে রেখে সব সময় আমাদের কাজ করতে হবে। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষা। কোন বাধা, কোন নিষেধ আমরা মানবো না।

সার বাঁধিয়া গান করিতে করিতে সকলে জলের ধারে আসিল। লতিকা জয়ধ্বনি করিল, বন্দে মাতরম্। প্রতিধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করিল।

পুলিসও সেদিন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। এমনভাবে তাহারা জলাটা ঘিরিয়া রাখিল যে ফাঁকটুকু অবধি নাই।

জীবন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া সে উনান ধরাইতে আদেশ দিল।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, উনুন ধরিয়ে কি হবে? জল আনবে কি করে?

জীবন কোন জবাব দিল না। শুধু হাঁকিল, চারদিক থেকে সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে; যেমন করে হোক জল তুলতেই হবে। তারপর লতিকাকে বলিল, আপনি শুধু জাতীয় পতাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

অতর্কিত আক্রমণে পুলিস চকিত হইয়া উঠিল। সুরেশ ও বিপিন ত্বরিতপদে দুই ঘড়া জল লইয়া আসিল। উনানে হাঁড়ি চাপাইতেই লাঠির আঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইল। আগুন নিভিয়া গেল। ছেলেদের উৎসাহ কমিল না; মহা উল্লাসে তাহারা আবার আগুন ধরাইল, আবার জল আনিতে গেল।

বন্দে মাতরম্, গান্ধীজী কি জয়, আইন অমান্য কী জয়, বন্দে মাতরম্, উত্তেজিত ভাবে জয়ধ্বনি দিয়া লতিকা জাতীয় পতাকা হস্তে সকলকে উৎসাহ দিতে লাগিল। পুলিস-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিক হইতে লাঠি চালাইতে লাগিল। যুবকদের কাহারও হাত ভাঙিল, কাহারও মাথা ফাটিল, একজন পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী লতিকার হাত হইতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিল, পারিল না। লতিকা দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিয়াছিল। সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াও প্রাণপণ শক্তিতে পতাকাটি নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল।

পুলিস সে দিন সকলকে গ্রেপ্তার করিল।

সত্যাগ্রহী

১

শিবরামবাবু কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। কলিকাতা হইয়া যাইবার সময় পবিত্রকে তিনি সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন। পবিত্র যায় নাই। কিন্তু কলিকাতাও তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। দিন দশ বারো পরে একদিন সন্ধ্যাকালে পবিত্র হালিসহরে উপস্থিত হইল। ছেলের

মুখের দিকে মহামায়া তাকাইতে পারিলেন না; তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। এ শোকের সান্ত্বনা নাই; মহামায়া স্বয়ং তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু চিরদিন কি শোক করা চলে? না, কখন সম্ভব? পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার মন অধীর হইয়া উঠিল। শিবরামবাবুরও বিশেষ অনিচ্ছা নাই। কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া পবিত্রকে এ কথা বলিতে পারিলেন না। শেষে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়া মহামায়া এক দিন কথাটা পাড়িলেন। প্রত্যুত্তরে পবিত্র শুধু একটু হাসিল। দরজার আড়াল হইতে সে হাসি দেখিয়া মহামায়া শিহরিয়া উঠিলেন।

হালিসহরেও পবিত্রের মন টিকিল না। কলিকাতায় যাইতেছি, বলিয়া সে আবার বাহির হইয়া পড়িল।

২

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস। আইন-অমান্য আন্দোলনের যুগ। বেআইনী লবণ তৈয়ারী, পিকেটিং, মীটিং, শোভাযাত্রা—লোকেরা একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। পুলিসও মাতিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে লোকে মার খাইতেছে, জেলে যাইতেছে; ফিরিয়া আসিয়া আবার আন্দোলনে যোগ দিতেছে। গ্রামের লোকেরা খাজনা বন্ধ করিলে পুলিস আসিয়া মারিয়া-ধরিয়া তাহাদের ঘটি-বাটি যাহা পাইতেছে লইয়া যাইতেছে। বিলাতী কাপড়, সিগারেট, মদ্য প্রভৃতির বিক্রয় একেবারে কমিয়া গিয়াছে। সহরে দুই বেলা খবরের কাগজ বাহির

হইতেছে। 'টেলিগ্রাফ' 'টেলিগ্রাফ' চীৎকারে সমস্ত সহর মুখরিত হইয়া উঠে। জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় খবরের কাগজ বন্ধ হইলে লোকে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা বুলেটিনের জন্য অধীর হইয়া উঠে। কোথায় কি ঘটিল, কাহাকে গ্রেপ্তার করিল, তাহা জানিবার জন্য লোকের আগ্রহের অন্ত নাই।

এই সময়ে একদিন মেঠো পথ বাহিয়া পবিত্র ধীরে ধীরে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটীর—হাতে গোণা যায়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিধবাই বেশী। এই নিয়ে রসুলপুর। গ্রামে ছয় ঘর মুসলমান, আর সব হিন্দু, তথাপি কেন যে রসুলপুর নাম হইল কেহ বলিতে পারে না। বড় গৃহস্থ কেহই নাই। পেট-ভাতের যোগাড় সকলের একরকম হয়। পরনের কাপড়, জমিদারের খাজনা, কেরোসিন তেল আর লবণ কিনিতে বাকী ফসল বিক্রয় করে। হিন্দুদের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিবাহ এবং বাপমায়ের শ্রাদ্ধ ভিন্ন বার মাসে তের পার্ব্বণ আর নাই। মুসলমানদের মধ্যে শ্রাদ্ধ নাই; তবে খাওয়ান দাওয়ান হিন্দুদের মতই হয়। দেনা তো সকল ঘরেই। সুদ দিতে হয় অনেক। টাকা সব সময় শোধ হয় না। আসলের চেয়ে সুদ বেশী হয়। গ্রামে মহাজন আছে। ছোট একটা দোকান কোন রকমে টিকিয়া আছে। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে, কেনা-বেচা সব এই দুই দিনেই করিতে হয়।

প্রায় সবাই নিরক্ষর। পাশের একটা বড় গ্রামে পাঠশালা আছে। তবে শুধু লেখাপড়ার জন্য কে আর এত দূরে ছেলে পাঠায়! লেখা-পড়া যে শেখে সে আর গ্রামে থাকে না, কলিকাতায় গিয়া কাজ করে। স্বার্থের হিসাব কিন্তু সবাই রাখে, জমির আল লইয়া মারামারি করিয়া লোক খুন করিতে কেহ দ্বিধা করে না।

দারিদ্র্য, ব্যাধি ও আলস্য গ্রাম্য জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বেলা দ্বিপ্রহর। মাথার উপরে খর রৌদ্র। অবসন্নদেহে পবিত্র ঃএকটা গাছের তলায় বসিল। পথে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়া পবিত্র বলিল, আমাকে একটু জল দেবেন?

পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

ষোল সতের বছরের একটি বালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আপনিই মার কাছে জল চেয়েছিলেন? আসুন আমাব সঙ্গে, পুকুর দেখিয়ে দিই।

—আমি আর চলতে পারছি না, তুমি নিয়ে এস।

—আমরা যে বাগদী, আপনি—

—তোমার হাতের জল আমি খাব।

—আমার যে তাহলে পাপ হবে।

পবিত্র আর কিছু বলিল না, উঠিয়া বালকেব অনুসবণ করিল।

পুষ্করিণী দেখিয়া পবিত্র কহিল, এই পুকুর? এই জল তোমবা খাও?

এই পুষ্করিণীর জলই তাহারা এতদিন খাইয়া আসিতেছে, জল সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তো কখন উঠে নাই। সেই জলে আজ হঠাৎ যে কি দোষ হইল বুঝিতে না পারিয়া বালকটি নীরবে পবিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পবিত্র চোখ বুজিয়া মরীয়ার মত সেই জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া

পান করিল। ছেলেটিকে পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের গাঁয়ে বড় লোক নেই ?

বালক মহাজনের নাম করিল।

পবিত্র বলিল, আমায় তার ওখানে নিয়ে চল।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া মহাজন তাড়াতাড়ি পবিত্রের পায়ের ধূলা লইল। কোন বাধা মানিল না।

তারপর পবিত্রকে বসাইয়া বলিল, তাই তো, আপনার সেবাটা—এমন অবেলায়—আঃ, পাড়ে ঠাকুর আবার তাগাদায় বের হয়েছে—সন্ধ্যের আগে কি আর ফিরবে বেটা—

পবিত্র কহিল, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার অবশ্য খাওয়ার বিশেষ তাড়া নেই। তাছাড়া ঘরে মা রয়েছেন, তাঁর দেওয়া তুটি ভাত—

মহাজন জিভ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, অমন কথা বলবেন না, আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ! আমাকেও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। তার চেয়ে যদি আপনিই একটু কষ্ট করে—আমরা সবই যোগাড় করে দেব—

পবিত্র বলিল, দেখুন, রাঁধতে আমি জানি না। আর আমার সে স্পৃহাও নেই। তবে আমার নিজের দিক থেকে আপনাদের ছোঁয়া খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।

পবিত্রকে সে বেলা চিড়া দই খাইয়া কাটাইতে হইল।



রসুলপুরের পর নিশ্চিন্তপুর, একটা গণ্ডগ্রাম। হাট-বাজার পাঠশালা, পোষ্ট-অফিস সব আছে।

পবিত্র সেখানে একটা সভা করিল। গ্রামের চৌকিদার, দফাদার এবং দুইজন কনষ্টবল আসিল।

পরাধীনতার তীব্র জ্বালা বর্ণনা করিতে গিয়া পবিত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মনে করিয়াছিল, দুই একটি কথায় গ্রামবাসীদিগকে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু বক্তৃতাটি আশানুরূপ সংক্ষিপ্ত হইল কি না এবং শ্রোতারা তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে কি না, বক্তৃতা সুরু হইবার পর আর পবিত্রেব সেদিকে খেয়াল রহিল না। জনতা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে। সেও উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিয়াছে।

সহসা জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুভ্র খাদি-পরিহিত ছয় সাতটি তরুণ জাতীয়-পতাকা হস্তে পবিত্রের দিকে অগ্রসব হইয়া আসিল। সকলেই গ্রামবাসী, সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছে মাত্র। পবিত্রকে জানাইল, তাহারা কংগ্রেস-কর্ম্মী ; আইন অমান্য করিতে ইচ্ছুক। পবিত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানেও কি কংগ্রেস অফিস আছে ?

—আজ্ঞে এর আগে ছিল না। হপ্তাখানেক হলো খোলা হয়েছে।

—সভাপতি কে ?

—এখনও ঠিক হয়নি। সব জায়গায় কংগ্রেস অফিস রয়েছে—আমাদের এখানে নেই। তাই ভাল লাগছিল না—

—বেশ করেছ তোমরা, ভলান্টিয়ার কজন হয়েছে ?

—আজ্ঞে আমরা এই সাত জন, তবে অনেকে হবে বলেছে।

পবিত্র বুঝিল, একটা ভাবধারা যখন জাতিকে পাইয়া বসে, তখন এই রকমই হয়। সে বলিল, আইন অমান্য করতে চাচ্ছ—ভেবে দেখেছ কি, এতে কত কষ্ট তোমাদের পেতে হবে? যুবকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, জেলে যেতে আমাদের একটুও ভয় করছে না। একটু চিন্তা করিয়া পবিত্র বলিল, বেশ, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে থাকবে; কখন কি করতে হবে, আমি তোমাদের বলে দেব, বুঝলে?

যুবকের দল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। গান্ধীজী কি জয়। মহাত্মাজী কি জয়।

সভা ভঙ্গ হইলেও বিশাল জনতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পবিত্র তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমাদের সকল দুঃখ-দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে পরাধীনতা। স্বাধীন না হওয়া অবধি কোন সুখ, কোন আনন্দের আশা আমরা করতে পারি না। রাত অনেক হয়েছে; বহু দূর থেকে অনেকে এসেছেন আমার বক্তৃতা শুনতে, আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কথাগুলো সব সময়ে ভাববেন, বাড়ী যেতে যেতে ভুলে যাবেন না।

সকলে চলিয়া গেলেও কয়েকজন লোক বসিয়া রহিল। পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি আমাকে কোন কথা বলিতে চান? বেশ তো, বলুন। বাইরে থেকে এসে আমরা সব সময় আমাদের কথা ঠিক মত বোঝাতে পারি না। আর এও সত্যি, আপনাদের দুঃখ-দারিদ্র্য আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমরা ভাল করে জানিও না।

জনৈক বৃদ্ধ বলিল, জমিদারের খাজনা বড্ড বেড়ে গিয়েছে। দিয়ে ওঠা যায় না। সামান্য একটা আল নিয়ে সবাই মারামারি করে—এ সব কোন কথা আপনি বললেন না?

পবিত্র অপ্রস্তুত হইল। এই সকল জটিল বিষয়ের কথা তাহার মনে হয় নাই। তাহা ছাড়া এই সব বিষয়েব মীমাংসা করাও সম্ভব নহে। একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, আপনারা গাঁয়ের সব মোড়ল রয়েছেন, আল নিয়ে মারামারি মিটিয়ে দিলেই পারেন।

বৃদ্ধ কহিল, আমাদের কথা মানবে কেন? জমির সীমানা নিয়ে গোলমাল, দু-এক দিনের ভেতরে হয় না। সে হলে তো ধমকে মিটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতো নয়, বহু পুরুষ কেটে গেলে—আর তাই বা কেন—অনেকবার হাত বদলালে তবে গোলমাল সুরু হয়। যারা সীমানার কথা জানতো তারা হয়তো আর বেঁচে নেই, চাষ করতে করতে আলের হেরফের হয়ে গেছে। এ গোলমাল মেটাবে কে? আর যারা মারামারি ঝগড়াঝাটি করছে তারাই বা মানতে চাইবে কেন? দু-দলই যে বিশ্বাস করে, সে যা বলছে সেটাই ঠিক।

পবিত্র ইহার কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

শ্লেষের স্বরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, খাজনা দেওয়াব কথা, সে কথাও কিছু বলবেন না?

পবিত্র বুঝিল, চিন্তাশীল না হইলেও বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি আছে। তাই হঠাৎ কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। সে বলিল, কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না আমি। শুধু একটা কথা মনে হচ্ছে—অবশ্য ঠিক কি না জানি না—ভাল করে চাষ-আবাদ করলে, ফসল বেশী পেলে খাজনা একটু বেশী হলেও দেওয়া বোধ হয় খুব শক্ত নয়।

পবিত্রের অজ্ঞতা দেখিয়া বৃদ্ধ হতাশ হইল। কহিল, ফসল বেশী পেলে লাভ কি? জমিদারের লোক গাঁয়েই রয়েছে। তারা জানে কে কি-রকম লোক। বেছে বেছে নিরীহ গোছের প্রজার কাছ থেকে বেশী খাজনা আদায় করে। পঞ্চাশ-যাট ঘর প্রজার ভিতব থেকে দশ

ঘর প্রজার মাথায় হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, খাজনা বাড়াতে পারলে, আরও বিশ ঘর প্রজাকে চোখ রাঙিয়ে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া যায়; তারপর যারা থাকে তাদের ওপরে জোর-জুলুম সুরু হয়ে যায়। তাতেও না দিলে, আদালত রয়েছে নালিশ রুজু হল। জমিদারের আইন রয়েছে, দশ বিশ জন প্রজাকে দিয়ে সাক্ষী দিয়েই বলালে, তারা বৃদ্ধি দিয়েছে। আর সেখানকার খাজনার হারও বিদ্রোহী প্রজারা যা দিচ্ছে তার চেয়ে বেশী। আদালত বললে, সবাই দিচ্ছে তুমি দেবে না কেন? ডিক্রী হলো, খাজনা আরও বেড়ে গেল। বাইরে থেকে এসে আপনারা সবাই বলবেন, ভাল করে চাষ-আবাদ কর না কেন? কলের লাঙল ফেলো। সবই বুঝলুম; বুঝলুম না—কি হবে আমাদের এ সব করে!

বৃদ্ধ চুপ করিল।

পবিত্র বলিল, থামলেন কেন? আপনার কথা শুনে আজ আমার অনেক জ্ঞান হলো।

বৃদ্ধ জিভ্ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি, ও কথা বলবেন না। আমি মুখ্যু লোক, নাম লিখিতেও জানি না, দেনায় সব বিকিয়ে গেছে, অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ পেয়ে এসব কথা বলেছি।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, দেনা হলো কি করে? আপনি কি নিজে দেনা করেছিলেন?

—না, দেনা আমার নিজের নয়। কর্ত্তামার শ্রাদ্ধের দরুণ বাবার কিছু ঋণ হয়েছিল সে সামান্য কটা টাকা সুদে সুদেই কেবল বেড়ে গিয়েছিল।

পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, শ্রাদ্ধ আর বিয়েতে অযচ্ছল টাকা খরচ করতে গিয়ে প্রায়ই আমরা ঋণী হয়ে পড়ি, সেটা—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া কহিল, এ আপনাদের একটা মনগড়া কথা। আমায় মাফ করবেন আপনি, আপনারা আমাদের ভেতরকার অবস্থা বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও কখন করেন না।

পবিত্র কহিল, আমরা কি এসব ব্যাপারে অযচ্ছল টাকা খরচ করি না?

—করি বইকি, খুব বেশীই করি। সমাজে পাঁচজনের ভেতরে থাকতে হলে, আপনাকে এ রকম খরচ করতেই হবে যে, নইলে চলে না। একবারটি ভেবে দেখুন তো, রোজকার রোজ আমরা কি খেয়ে থাকি। দুবেলা দু-মুঠো ভাত, তাও সবাই পেট ভরে পায় না। আত্মীয় স্বজন নিয়ে খাওয়া দাওয়া সবদিন গাঁয়ের লোক করতে পারে না। করবে কি করে? সে রকম অবস্থাই বা কজনের আছে? তাই বাড়ীতে একটা ব্যাপার হলেই গাঁয়ের দশ জন আত্মীয় স্বজনকে ডাকতে হয়। আর এই বা কজনের ভাগ্যে কবার হয়ে থাকে? এখন বাইরে থেকে এসে আপনারা যদি এসব বন্ধ করে দেন, আমরা আর কি নিয়ে বাঁচি, বলুন?

গ্রামবাসীদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবিয়া পবিত্র আব কোন কথা বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে শুনেছিলুম, কাছে পাটকল হওয়াতে, কি সব হয়ে গেছে?

বৃদ্ধ নিরাশার স্বরে বলিল, পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ কি? সবাই জানে, কি করে জমিদার প্রজাদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে সাহেব-দের জমির দখল দিয়েছে।

—কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি?

—দিয়েছে, শুধু নামে। টাকা কি আমরা চেয়েছি? কথায় বলে সাত পুরুষের ভুঁই—এ কি ছাড়া যায়? জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

—জোর করে কেড়ে নিলে কি রকম? চাষী প্রজাকে তো উচ্ছেদ করা যায় না।

আইন সেই রকমই বটে, কিন্তু মানুষ থাকবে কি করে শুনি? এখান থেকে মাইল আট নয় দূরে কল বসিয়েছে, তাতেই আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি।

কেন? এ গাঁখানাও কি নিতে চায় না কি?

না। সে মতলব সাহেবরা এখনও করেনি। গঙ্গার দুধারে পাট-কল হওয়াতে চুরি ডাকাতি বেড়ে গিয়েছে। কুলিগুলোর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, কখন কি যে করে বসে ভেবে রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় না। মেয়েরা পথেঘাটে বেরুতে পারে না। সাঁঝের বেলায় পুকুর ঘাটে গিয়ে যে জল আনবে সে দিন আর এখন নেই। গাঁয়েতে এখন যারই একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, যে একটু খাটতে পারে, সেই ছুটেছে কলকাতার দিকে। সেখানেই কি বেশীদিন থাকতে পারে? দু চার বছরের ভেতরে ঘরে ফিরে আসে একটা না একটা খারাপ অসুখ নিয়ে, এত খারাপ যে বলতে লজ্জা করে। কলকাতায় না আছে সমাজ, না আছে লোকনিন্দা; চক্ষুলজ্জা বলে কোন জিনিষ সেখানে কারুর নেই। ভাল করে চাষবাসের কথা আপনি বলছিলেন, কে করবে এসব? কলকাতা থেকে, সহর থেকে যারা ফিরে আসে, তারা হয় আপনাদের মত বাবু, নয় একেবারে অকেজো। তাদের দিয়ে আর যে কাজই হোক না কেন চাষের কাজ হতেই পারে না। যারা দেশে থাকে, তারা যেমন মুখ্যু তেমনি আল্‌সে—কোন রকমে লাঙলটা ধরে থাকে।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কয়েক দিন হইল তাহারই এক পুত্র কুৎসিত ব্যাধি লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চোখ মুছিয়া বৃদ্ধ বলিল, আপনি স্বরাজের কথা, মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছিলেন। আমরা মুখ্যু, স্বরাজ আমরা বুঝি না। শুনেছি মহাত্মা গান্ধী গরীব-দুঃখীর বাপ-মা তাই ছুটে এসেছিলাম তাঁর কথা শুনতে। তাঁকে দয়া করে বলবেন, মদ আমরা ছুঁই না, নেশা-ভাঙ আমাদের সাত পুরুষের ভেতরে কেউ কোন দিন করেনি। বিলিতী কাপড় আমরা পরতে চাই না, দিশী কাপড় কিনতে পেলে মাড়োয়ারী বাবুরা দয়া করে বিলিতী কাপড় দিশী বলে চালিয়ে দেন, সস্তা দেখে আমরাও কিনে নিয়ে আসি। বলবেন তাঁকে গাঁয়ের লোকরা বড় দুঃখী, বড় গরীব; তিনি যেন শীগগির এর একটা কিছু বিহিত করেন।

৪

পবিত্র গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে লাগিল। যেখানে যায় সেখান হইতেই তিন-চারিটি ছেলে আসিয়া তাহার দলে যোগ দেয়। তাহারা সকলেই যে কংগ্রেসের মূল নীতি বুঝিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেকেই উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু। জেলে যাইতে কাহারও ভয় নাই। মহাত্মা গান্ধীকে সকলে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে; গান্ধী নাম সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু কাজের কথা বলিলে, প্রাচীনগণ বলেন, তাঁহারা পিছনে আছেন, এবং অতি সঙ্গোপনে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের এই আত্ম-অবিশ্বাস এবং শঙ্কা যে কিসের, পবিত্র তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে নিরুৎসাহ হইল না। ছেলেদের লইয়া পূর্ণ উদ্যমে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় পবিত্র ক্লান্ত হইয়া উঠিল। ত্রিশ চল্লিশ জন লোকের আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভাভঙ্গ করিয়া ছেলেদের দল লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়। কখনও সঙ্কল্পিত স্থানে পৌছিতে অধিক রাত্রি হয়। ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় পবিত্রকে বিপন্ন করিয়া তোলে। প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে আহার জুটিয়া যায়। এক বাড়ী হইতে জোগাড় না হইলে একাধিক পরিবারের নিকট হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। প্রায় প্রতি রাত্রে তাহাদিগকে গাছের তলায় ঘুমাইতে হয়। এতগুলি লোকের থাকিবার মত গৃহ, দুই একটা গ্রাম ভিন্ন আর কোন গ্রামে নাই।

একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া পবিত্র দূরে ঢোলের আওয়াজ শুনিতে পাইল; সেই সঙ্গে একটা লোক চীৎকার করিয়া কি যেন বলিতেছে। শব্দ ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে এক পুলিস কর্ম্মচারী গ্রামের চৌকিদার ও ঢুলি সঙ্গে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া এক পরওয়ানা জারি করিল। পবিত্র নিজ নাম সহি করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে কর্ম্মচারীগণ গম্ভীর ভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নোটিস পাইয়া পবিত্র চিন্তিত হইল। মহকুমার হাকিম হুকুম দিয়াছেন, দুইমাস কেহ কোন রকম সভা অথবা শোভাযাত্রা করিতে পারিবে না। ছেলেরা আদেশ অমান্য করিবে বলিল। পবিত্র তাহাদিগকে উৎসাহ দিল না। নিরর্থক জেলে গিয়া কি হইবে? বাহিরে তাহার অনেক কাজ রহিয়াছে। পবিত্র মনে মনে ভাবিল, মীটিং

করিতে না হয় নাই দিবে ; বৈঠক করিতে তো নিষেধ নাই। গ্রামের মোড়লদের ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিবে। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে মোড়লরাই গ্রামবাসীদের সমস্ত বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাই কি ঠিক হইবে? বৈঠক তো সভার নামান্তর মাত্র।

পবিত্র স্থির করিল, সে তখনি সেই গ্রাম ত্যাগ করিবে। সম্ভব হইলে দুই মাস পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে নিজ বক্তব্য জানাইবে।

সঙ্গী যুবকেরা ক্ষুণ্ণ হইলেও কেহ কোন প্রতিবাদ না করিয়া পবিত্রের সঙ্গে সেই গ্রাম ত্যাগ করিল।

পুলিস কিন্তু পিছন ছাড়িল না। আবার পরওয়ানা জারি করিল।

পবিত্র বিরক্ত হইল, বলিল, ভাল আপদ। যেখানেই আসছি সেখানেই মীটিং করতে দিচ্ছে না। শুধু শুধু কি আর আরামবাগে মীটিং করতে গিয়ে সবাই ধরা দিচ্ছে। এ ভাবে এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে গিয়ে কোনই লাভ নেই, শুধু শুধু হয়রান হওয়া, পুলিস আমাদের পেছন ছাড়বে না। কে কে জেলে যেতে রাজি আছ?

ছেলের দল সমস্বরে জানাইল, সকলেই জেলে যাইতে প্রস্তুত, কেবল তাহার আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

পবিত্র বলিল, একটা ঢোল জোগাড় করে সবাইকে জানিয়ে এসো আজ হাটে বিকেল বেলায় সভা বসবে। সে চারি জনকে এই কার্য্যে পাঠাইল।

আধ ঘণ্টা পরে একটি ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, পুলিস ওদের ধরে আটকে রেখেছে, আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ছুটে এলে যে ? তোমায় ধরলে না ?

—ধরতে চেয়েছিল, পারেনি, আমি ছুটে পালিয়ে এলুম।

—তোমাদের ভেতরে আর কে কে আছে, যারা ধরতে এলে ছুটে পালাবে ? তাদের মীটিংএ যেতে হবে না।

বালকটি কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমি আর কক্ষণো ছুটে পালাব না।

সত্যই সে ভয়ে পলাইয়া আসে নাই। পবিত্রকে খবর দিতে আসিয়াছিল।

বিকাল হইতেই হাটে লোক জমিতে লাগিল। সকলের মনেই আশঙ্কা, কি যেন কি হয়! পবিত্র ও তাহার ছেলের দল হাটের মধ্যস্থলে বসিল। গ্রামবাসীগণ ভীত চকিত নেত্রে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিসের লোকেরা আগেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

পবিত্র বুঝিল, বেশী লোক আসিবে না। সে আর বসিয়া না থাকিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সহিত সভার কাজ আরম্ভ করিল। দুই চারিটি কথা না বলিতেই দারোগা পবিত্রকে গ্রেপ্তার করিল। তখন যুবকদল হইতে এক একটি ছেলে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। পুলিস তাহা-দিগকেও গ্রেপ্তার করিল। ছেলেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে পুলিসের অনুগমন করিল। সমবেত জনতা নিশ্চল হইয়া সে দৃশ্য দেখিল।

প্রতিক্রিয়া

১

ডায়মণ্ডহারবার সাব-জেল।

লতিকা আর জমাদারনী—জেনানা ওয়ার্ডে মাত্র দুইটি প্রাণী। গভীর রাত্রি, জমাদারনী অঘোরে ঘুমাইতেছে। লতিকার চোখে ঘুম নাই, ভয়ে তাহার গা-ছমছম করিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহারা এখানে আসিয়াছে। জীবন ও অন্যান্য ছেলেরা পাশের কুঠরীতে বন্ধ আছে। জেলার নিজে গুণিয়া বাহির হইতে ঘরে তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডের ফটক লতিকারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়াছিল।

রাত্রে জেলার আসিয়া পুনরায় গুণতি করিয়া ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছেন।

টিম টিম করিয়া মাথার উপর একটা আলো জ্বলিতেছে। গভীর অন্ধকারে সেই ক্ষীণ আলোক লতিকার মনে বিভীষিকা জাগাইতেছিল।

সহসা এক বিকট চীৎকার শোনা গেল—এ-ক—দু-ই—তি-ই-ন—চা-আ-র ······ প-ন-অ-ব-অ —ষো-ও-ল-অ ······ আ-ঠা-আ র—অ—উ-নি-ই-শ······আ-ট-তি-রি-ই-শ—উ-ন-চ-ল্লি-শ—জমা ঠিক হ্যায়।

লতিকা ভয়ে জমাদারনীকে ঠেলিতে লাগিল।

জমাদারনী ধমক দিয়া উঠিল, চুপ করকে নিদ্ যাও, কাহে দিক্ করতা?

লতিকাও তাহাই চায়। কিন্তু ঘুম যে কিছুতেই আসে না। পাশের ঘরে ছেলেরা অনেক রাত্রি অবধি গোলমাল করিয়াছে। কেহ গান গাহিয়াছে, কেহ ঝগড়া করিয়াছে।

অবিনাশের গলাই সবচেয়ে বেশী শোনা গিয়াছে। জীবনের কণ্ঠস্বর কিন্তু লতিকা একবারও শুনিতে পায় নাই। তবে কি সে মুসড়াইয়া পড়িয়াছে? না, তাহার মত শক্তিমান পুরুষ তো কখনও ভয়ে কাতর হইতে পারে না। সে হয়তো খুব গম্ভীর প্রকৃতির। তাই ছেলেদের এই গোলমালের মধ্যে নিজে যোগ দেয় নাই।

আবার সেই বিকট শব্দ—এ-ক—দু-ই—তি-ই-ন—চা-আ-র—জমা ঠিক হ্যায়।

লতিকার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতে জমাদারনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে লতিকাকে দৃঢ়মুষ্টিতে দরজার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বলিল, চুপ্ করকে শুতল রহো—ফিন্ এইস্যান্ করেগে তব ডাণ্ডা লাগায়েঙ্গে।

মারের ভয়ে লতিকা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

ভয়ানক মশার অত্যাচারে বহুক্ষণ ছটফট করিয়া শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

জমাদারনীর ধাক্কায় লতিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল।

বাহিরে দরজা খোলার শব্দে সে বিস্মিত হইল। জেলার ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে আপনার কোন অসুবিধে হয়েছে কি?

লতিকা কোন জবাব দিল না। গম্ভীরভাবে জেলার বলিলেন—এক। পর মুহূর্ত্তে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

২

পরদিন বিচার হইল মহকুমার দ্বিতীয় হাকিমের নিকট। জীবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকগুলি—বে-আইনী লবণ তৈয়ারীতে সহাযতা করা, বে-আইনী লবণ বিক্রয় করা এবং দাঙ্গা করা। তাহাকে বে-আইনী লবণ তৈরী করার অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় কি না, এ বিষযে পুলিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। এই কারণে প্রথমে তাহাকে মূল অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় নাই। গ্রামের চৌকিদার সাক্ষ্য দিল, সে ষ্টেশন হইতে বিল পর্য্যন্ত আসামীদের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ঝোপের আড়ালে থাকিয়া জীবনকে লবণ তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছে। সরকার পক্ষের আর কোনও সন্দেহ রহিল না; জীবন মূল অপবাধে অভিযুক্ত হইল।

সুরেশ ও বিপিনের বিরুদ্ধে আরও একটি অতিরিক্ত অভিযোগ আনা হইল,—তাহারা সরকারী কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বাধা দিয়াছে। অবিনাশ প্রভৃতি নূতন দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাহারা বে-আইনী জনতায় যোগ দিয়াছে এবং দাঙ্গা করিয়াছে। অন্যান্য ছেলেদের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ।

লতিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনটি—বে-আইনী জনতায় যোগ দেওয়া, দাঙ্গা করা এবং বে-আইনী লবণ বিক্রয়ে সহায়তা করা।

প্রত্যেকটি অপরাধ গুরুতর, বিশেষত সেগুলি ইচ্ছাকৃত—অপরাধ করিবার কোন কারণ ছিল না।

সতীশবাবু আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে চাহিলেন ; জীবন নিষেধ করিল।

প্রথম সাক্ষী গ্রামের চৌকিদার ; তারপর পুলিস কর্ম্মচারী, যিনি জীবনের দলকে আদালত প্রাঙ্গণে বে-আইনী লবণ বিক্রয় করিতে দেখিয়াছেন। তিনি বিলের ধারের দাঙ্গার ব্যাপারও সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। আসামীরা দুইজনের কাহাকেও জেরা করিল না। সরকার পক্ষ আর সাক্ষী দিলেন না। হাকিম আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আইন অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।

হাকিম জীবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সাক্ষ্য প্রমাণ সব শুনেছেন ; আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তাও আপনাকে শোনান হয়েছে। আপনি কোন কথা বলতে চান ?

জীবন কহিল, এ বিচারের কোন অংশ আমি গ্রহণ করতে চাই না।

—সাফাই সাক্ষী দেবেন ?

জীবন কোন উত্তর দিল না। হাকিম লিখিলেন, সাফাই সাক্ষী দিবে না। প্রশ্নোত্তর লিখিয়া হাকিম জীবনকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। পেস্কার জীবনকে সেই কাগজে নিজের নাম সহি করিতে বলিলেন। সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। হাকিম লিখিয়া রাখিলেন, আসামীকে বলা সত্ত্বেও নিজ নাম দস্তখত করিল না।

অন্যান্য আসামীরাও জানাইয়া দিল, তাহারা বিচারের অংশ গ্রহণ করিতে চাহে না। সকলের শেষে লতিকার জবাব লেখা হইল। হাকিম বলিলেন, আমার বিশ্বাস, আপনি নিজে থেকে কোন অপরাধ করেননি ;

এদের দলে ছিলেন বলেই আইনের চোখে আপনিও অপরাধী। এ কাজ আপনি আর করবেন না বলুন, আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

লতিকা শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, এরকম কোন কথা দিতে আমি পারব না। ইহার পর কতকগুলি মামুলী প্রশ্নোত্তরের পরে রায় লেখা শেষ করিয়া হাকিম গম্ভীর ভাবে হুকুম দিলেন, জীবন—এক বৎসর, সুরেশ ও বিপিন—দশ মাস, অন্যান্য ছেলেরা—প্রত্যেকে আট মাস, লতিকা গুপ্ত—ছয় মাস। লতিকা ভিন্ন আর সকলের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

যুবকদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, লতিকাও বলিল, বন্দে মাতরম্।

গোলমাল থামিলে সতীশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া আদালতকে বলিলেন, আসামীরা সকলেই শিক্ষিত, ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে, এদের ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে হুজুর একটু বিবেচনা করলে ভাল হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, আসামীরা নিজে থেকে কোন কথা বলছে না, রেকর্ড থেকেও কিছু পাচ্ছি না যাতে করে লিখতে পারি এরা ভদ্রলোক।

সতীশবাবু সহাস্যে বলিলেন, রেকর্ডে না থাকলেও হুজুর কি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারেন?

হাকিম কোন কথা না বলিয়া অর্ডার শীটে লিখিলেন, স্থানীয় প্রবীণ উকীল আসামীদের শ্রেণী বিভাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কারণ আসামীগণ ভদ্রলোক ও শিক্ষিত। সতীশবাবুর কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশেষত সরকার পক্ষ কোন আপত্তি করিতেছেন না। অতএব আসামীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরকে সুপারিশ করা হউক। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

সাহেবের হুকুম অনুযায়ী আসামীগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী সাব্যস্ত করা হইল। তারপর তিনি সহাস্যে সতীশবাবুকে বলিলেন, আপনার কথাই রাখলুম, ডিভিশন টু-তে দিলুম।

৩

বিচারের পর বিকালের ট্রেনে যুবকদলকে দমদম স্পেশাল জেলে চালান দিল। লতিকাও সেই গাড়ীতে শিয়ালদহে পৌঁছিল। সে ছিল অন্য একটি ছোট কামরায়—সঙ্গে জমাদারনী আর দুইজন পাহারা-ওয়ালা।

সকলের নিকটে বিদায় লইয়া কয়েদী-গাড়ীতে উঠিবার সময় লতিকার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

গাড়ী দ্রুত ছুটিয়াছে। চারিদিক বন্ধ। আলো ও বাতাসের অভাবে লতিকার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল ; তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গাড়ীর সঙ্কীর্ণ জালের উপর মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কলিকাতা সহর—কত লোক! তাহারা সকলে স্বাধীন! কিন্তু তাহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে ছয় মাস! এতদিন সে কি করিয়া কাটাইবে!

গাড়ী থামিলে ঘর ঘর শব্দে ফটক খুলিয়া গেল। লতিকা ও জমাদারনী জেলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অফিস ঘরের পাশেই ছোট একটা কুঠরী। লতিকা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আধঘণ্টা পরে মেট্রন আসিলে জমাদারনী লতিকার সর্ব্বাঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল।

প্রাচীর আর প্রাচীর! সম্মুখে পিছনে চারিদিকে শুধু প্রাচীর! লতিকা হাঁফাইয়া উঠিল।

ঘট্‌ ঘট্‌ করিয়া দ্বার খুলিবার সময় ভিতর হইতে জয়ধ্বনি শুনা গেল, বন্দে মাতরম্‌—বন্দে মাতরম্‌—বন্দে মাতরম্‌।

এত মেয়ে! লতিকা বিস্মিত হইল।

বন্দী মেয়েগুলি প্রশ্নের পর প্রশ্নে লতিকাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

—কোত্থেকে এলেন? ক মাস দিয়েছে?—দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আসুন। হাত মুখ ধুয়ে খাবেন চলুন।—কোথায় থাকবেন, ভাবছেন? আমার পাশে একটা সীট আছে—

লতিকা এতটা ভাবে নাই, প্রথমে সে কোন কথারই উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না।

একটি তরুণী ছোঁ মারিয়া তাহাকে ভীড় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

লতিকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা কবিল, এত কি ভাবছো ভাই? বরের কথা? আমাদেরও বর রয়েছে—বাড়ীতে নয়—জেলে।

লতিকা ম্লান হাসিল; বলিল, আপনারা বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছেন। আমার এ কদিন যে কি ভাবে কেটেছে!

—আপনি নয়, তুমি। ভাল কি আর আমাদেরই কেটেছিল? যেদিন আমাদের ধরলে, দুজনকে দু-ঘরে রেখে দিলে। পাশাপাশি কামরা হলে কি হয়—দেখবার জো নেই, চেঁচিয়ে গলা চিরে গেলেও একটা কথা শোনা যায় না—দেয়াল এমনি পুরু। তুমি ভাই, আমার পাশের সীটে থাকবে।

লতিকা তরুণীর হাত ধরিয়া তাহার ওয়ার্ডে প্রবেশ করিল।

তরুণী সুন্দরী, নাম রেবা। বৎসর খানেক হইল তাহার বিবাহ

হইয়াছে। স্বামী বৰ্দ্ধমানে ওকালতী করেন। তাহার শ্বশুর সেখানকার বড় উকীল।

মিনিট দশেক পরে প্রধান জমাদারনী লতিকাকে এক জোড়া কম্বল, একটা বালিশ, একটা মশারি, একটা বিছানার চাদর, এক জোড়া শাড়ী ও সেমিজ, একটা টুথব্রাশ, আয়না ও চিরুণী, একটা সাবান এবং খাতা ও পেন্সিল দিয়া গেল। রেবা তাড়াতাড়ি বিছানা পাতিয়া বলিল, আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তুমি চট করে হাত পা ধুয়ে ফেলো, এক্ষুনি তোমার খাবার নিয়ে আসবে।

আহার করিতে করিতে লতিকা বলিল, এখানকার খাওয়া তো মন্দ নয়? ডায়মণ্ডহারবারের কথা মনে হলে—

রেবা কহিল, একেবারে খুব খারাপ নয়; তবে বড্ড একঘেয়ে। যেদিন মাংস, সেদিন ছুবেলাই মাংস; যেদিন ডিম, সেদিন ছুবেলাই ডিম। এত সকাল করে কি ভাই ক্ষিদে পায়? উঠছ যে বড়? ভাল করে খেয়ে নাও, নইলে রাত ভোর পেট চোঁ চোঁ করবে।

লতিকা জল পান করিয়া বলিল, আর গলা দিয়ে যাচ্ছে না।

রেবা কহিল, তা ঠিক, এত বিচ্ছিরি রান্না, যে মুখে দেওয়া যায় না। শুধু জিনিষ হলেই হয় না—

—এসব রান্না কোথায় হয়? রান্নাঘর তো দেখলুম না?

—দেখ, সাতদিন থেকে মেট্রনকে বলছি, সবাই বসে আছি, নিজেরা পালা করে রাঁধি। আমাদের কথা শোনা হলো না; বললে, রুলে নেই। রুল! রুল! কেবলই ঐ কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

ঢং—ঢং—ঢং।

রেবা কহিল, এবারে ঘরে গিয়ে বসবে চল।

সার দিয়া বন্দিনীগণ ঘরে ঢুকিল। প্রথমে রাজ-বন্দিনীর দল, তারপর সাধারণ মেয়ে-কয়েদী। মেট্রন গণনা শেষ করিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

ঢং—ঢং—ঢং।

এ-ক—দু-ই—তি-ই-ন······ষা-আ-ট—জমা ঠিক হ্যায়।

চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সাধারণ মেয়ে কয়েদী; পনর-ষোল জন "স্বদেশী"—সকলেই এক ঘরে। সারারাত ঝগড়া মারামারি কাঁদাকাটি। মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার—এ-ক—দু-ই—তি-ই-ন······ষা-আ-ট—জমা ঠিক হ্যায়।

লতিকা বিরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, তোমরা ঘুমোও কি করে?

রেবাও বিরক্তিভরেই জবাব দিল, কি আর করা যাবে? বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়ে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

—আচ্ছা, এদের আর কোন ঘরে রাখা যায় না?

—যাবে না কেন? কিন্তু দিচ্ছে কে? কয়েদীদের কথা কি জেলের কর্ত্তারা কোনদিন রাখে? বলতে গেলেই ইংরেজী বকুনী সুরু করে দেয়। সামনে এগোয় কার সাধ্যি।

—এদের ভেতর কি সবাই চোর-ডাকাত?

—চোর-ডাকাত তো ভাল কথা। অর্দ্ধেকের ওপর খুনে।

লতিকা শিহরিয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, এরাও কি আমাদের মত খেতে পায়?

—ক্ষেপেছ তুমি? লাপ্‌সির নাম শুনেছ?

সে আবার কি ? আমাদেরও তাই খেতে দেবে নাকি ?

রেবা হাসিয়া উঠিল ; বলিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, কাল সকালে উঠে দেখো, লাপ্‌সি কি জিনিষ।

৪

আলিপুর হইতে রাজবন্দিনীগণকে বহরমপুরে বদলি করিল। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর স্বদেশী কয়েদী ছিল। তাহারা সকলেই ভদ্রঘরের মেয়ে, একই উদ্দেশ্যে কারাবরণ করিয়াছে। কিন্তু অপর দুই শ্রেণী হইতে সুযোগ ও সুবিধা তাহাদের কত কম ! সকালে মুড়ি ও বাতাসা খায় ; লাপ্‌সি অবশ্য তাহাদের কোনদিন খাইতে হয় না। অপর দুই শ্রেণী চায়ের সহিত রুটি-মাখন খায়।

দুই বেলা ভাত, ডাল, একটা তরকারী এবং একটু তেঁতুল-গোলা ; একদিন অন্তর মাছ—তাহাও একবেলা ; ভাত যেমন মোটা, তেমনি বিশ্রী দেখিতে ; তরকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দিনী-দিগের বরাদ্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাত অপেক্ষাকৃত সরু ও পরিষ্কার ; প্রতিদিন এক চাল নহে ; কোনদিন খুব মিহি, কোনদিন একটু মোটা। দুইটা তরকারী, ভাজা, সকালে দই ও দুইবেলা টক। যেদিন মাছ, সেদিন দুই বেলাই মাছ ; যেদিন মাংস, সেদিন দুই বেলাই মাংস এবং যেদিন ডিম, সে দিন দুই বেলাই ডিম ; ইহার যে কোন একটা প্রতিদিনই থাকে। হিন্দু বিধবাদিগের জন্য স্বপাকের ব্যবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দুই বেলা দুধ দেওয়া হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর কাপড়—যেন বিছানার চাদর—এত মোটা। সাদা কাপড়ের দুই পাশে দুই সারি সরু কাল রেখা। দুইখানি কাপড়, এক জোড়া কম্বল এবং দুইটি কোর্ত্তা। এ কোর্ত্তা পুরুষ কয়েদীরা গায়ে দেয়।

সপ্তাহে একবার সাজিমাটি দিয়া কাপড় কাচে এবং একদিন মাথায় তেল মাখে। তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দিনীদিগকে সাধারণ মেয়ে কয়েদী অপেক্ষা বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহাদিগকে সম্মান দেখানো প্রয়োজন মনে করেন না।

বহরমপুরে আসিবার তিন-চারি দিন পরে রেবা লতিকাকে বলিল, আমরা, ভাই, ওদের সঙ্গে মিশতে পারব না। লতিকা অবাক হইল; জিজ্ঞাসা করিল, কাদের কথা তুমি বলছো? রেবা আঙুল দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের দেখাইয়া দিল। লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, কেন? তোমাদের ঝগড়া হয়েছে নাকি?

মুখ বেঁকাইয়া রেবা উত্তর দিল, আমার কথা বলতেই বয়ে গেছে, তা আবার ওদের সঙ্গে কোঁদল করবো!

—তাহলে কেন একথা বললে?

—বলবো না? দেখছো না ওরা কারা?

কেন? ওরা সবাই তো আমাদেরই মত, কংগ্রেসের কাজ করে জেলে এসেছে।

রেবা বলিল, এখানে এসে সবাই ওই কথাই বলে। খেতে পায় না, তাই জেলে এসেছে; আবার গুমোর করে বলা হয়, কংগ্রেসের কাজ করে জেলে এসেছি!

লতিকা মর্ম্মাহত হইল ; বলিল, মিশতে ইচ্ছা না করলে মিশো না। আমার কিন্তু, ভাই, বড্ড লজ্জা করে ওদের সামনে বসে এসব খেতে। এক জায়গায় রয়েছি—

রেবা বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। আমাদের মত হলে ওদেরও এসব দিত।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, রাগে গর গর করিতে করিতে ঘুঁটি খেলিতে গেল।

লতিকা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; মনে মনেই বলিল, রেবা বড় ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে, স্বামী বড়লোক। কিন্তু আমি কি ? এদের সঙ্গে আমার তো কোন তফাতই নেই।

বন্দীজীবন

১

পবিত্রের ছয় মাস জেলের হুকুম হইল। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী। প্রথমে হুগলি জেলে কয়েক দিন ছিল। তারপর দমদম স্পেশাল জেলে আসিল।

হাজতবাস কালে পবিত্র তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। সে সময় তাহাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। যেদিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আনিল, তখন রাত্রি এগারটা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশক্রমে এত অধিক রাত্রে তাহাকে জেলে লওয়া হইয়াছিল। পবিত্র একাকী। তাহার সঙ্গী গ্রামবাসীদের ধরার অল্পক্ষণ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবকদল কিছুতেই পবিত্রের সঙ্গ ত্যাগ করিতে রাজি হয় নাই। পুলিস বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয়।

অন্ধকার ঘরে পবিত্র কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। দরজায় তালা দিয়া জমাদার চলিয়া গিয়াছে।

ঘরের মাঝখানে কড়ির সঙ্গে ঝুলান একটা আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে পবিত্র একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়া পড়িল। আশেপাশে কালো কালো কি সব পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের এক কোণ হইতে হারমোনিয়ামের সুরের মত একঘেয়ে একটা শব্দ উঠিতেছিল। পবিত্র ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ বিকট চীৎকারে পবিত্র চমকিয়া উঠিল; এক—দুই—তিন—

জমা ঠিক হয়। একটা লোক বিছানায় শুইয়া চীৎকার করিতেছে। আবার সেই শব্দ পাশের ঘরে। ক্রমে তাহা দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল। দশ মিনিট পরে আবার সেই বিকট চীৎকার; এবার পবিত্রের নিজের ঘরে। সারা রাত এই ভাবে চলিল; পবিত্র মোটেই ঘুমাইতে পারিল না।

হঠাৎ একটা অস্ফুট কর্কশ স্বর তাহার কানে আসিল, কে যেন বলিতেছে, বাবু, একটা বিড়ি দেবেন? তাহার ডানদিকে একটা লোক—সারা গায়ে লোম, বড বড় চুল ও দাড়ি। লোকটি বলিল, বাবু, একটা বিড়ি। পবিত্র বুঝিল, এ-ও তাহারই মত বন্দী। কহিল, বিড়ি আমি খাই না। লোকটা গুটি গুটি পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

তিনটা বাজিল। ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে পবিত্রের চমক ভাঙিল, সে এই চার ঘণ্টা একই ভাবে বসিয়া আছে। উঠিয়া মাটির ঢিবির উপর কম্বল বিছাইতেই উঃ বলিয়া পবিত্র লাফাইয়া উঠিল। কি যে কামড়াইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু দংশনের তীব্র জ্বালায় সে দিশাহারা হইয়া পড়িল।

চারিটা বাজিলে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে কথা-বার্ত্তা ও থালাবাটির ঝনঝন শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। এত লোক যে এই ঘরে ছিল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও পবিত্র তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না।

দরজা খুলিলে দুই দুই জন লোক পাশাপাশি বাহির হইতে লাগিল। পবিত্র আসিল সকলের শেষে।

পায়খানা, না নরক। যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি অনাবৃত। লজ্জা-সরম রক্ষা করিয়া চলা একেবারেই অসম্ভব। দুইখানা লম্বা পাত টিন দুই দিকে; মাঝখানে আর একটা পাত টিন সেই রকম লম্বা। দুই

পাশে ছোট দুইখানা ঢেউ তোলা টিন ; দুই হাঁটু কোন রকমে রাখা যায়। নীচে একটা টিনের টুকরি। ঘড়ি ধরিয়া কাজ সারিতে হয়। প্রথমে এক দল প্রবেশ করে। কয়েক মিনিট পরেই ওয়ার্ডার হাঁকে, শেষ হুয়া। সকলে এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসে, তখন আর এক দল প্রবেশ করে। শৌচ কার্য্য করিতে হয় বাহিরের চৌবাচ্ছায়। ভয়ানক নোংরা ইহার জল। নাকে কাপড় দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া পবিত্রের মাথা কাটিয়া গেল ; চালা এত নীচু। হাসপাতাল হইতে টিনচার আইওডিন আনিয়া মেট পবিত্রের মাথায় লাগাইয়া দিল।

সার সার তিনটা নালা জলে ভরা। দাঁতন করা শেষ হইলে সকলে একসঙ্গে মুখ ধুইতে বসিল। হুকুম হইল, এক, সকলে বাটি ভরিয়া জল লইয়া মুখ ধুইল। আবার হুকুম হইল, দুই ; সকলে একসঙ্গে উঠিয়া ওয়ার্ডারের সম্মুখে খোলা জায়গায় বসিল। তারপর আসিল লাপসি। পবিত্র মুখে দিয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল।

হাজতবাসীদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। পবিত্র বসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা। মাঝখানে আরও অনেক গুলি নীচু দেয়াল দিয়া ওয়ার্ড ভাগ করা। বাহিরের সহিত সকল রকম সম্পর্কশূন্য। সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝকে। এক দল কয়েদী সব সময় রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করিতেছে, ফিনাইল ছিটাইতেছে, কোথাও মাছিটি বসিতে পারিতেছে না। এক দল জল দিতেছে—তাহারা "জল চালি"। এক দল ঢেঁকিতে চাল কুটিতেছে—তাহারা "ঢেঁকি চালি"। এমনি অদ্ভুত সব নাম। ঘানি-ঘরে ঘানি ঘুরিতেছে, কিন্তু দূর হইতে পবিত্র সেখানকার বিশেষ কিছু দেখিতে পাইল না।

আটটা বাজিলে ঘণ্টাধ্বনি হইল। জেল অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

সাহেব আসিয়াছেন। আধঘণ্টা পরে, কড় কড় কড় করিয়া জেলের বড় ফটক খুলিয়া গেল, সাহেব জেলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পিছনে আসিলেন জেলার, ছোট জেলার ও ছয় সাত জন ওয়ার্ডার। ডাক্তারও সঙ্গে ছিলেন। সাহেব প্রথমে হাসপাতালে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে আসিলেন। তারপর একটার পর একটা ওয়ার্ড পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে 'সরকার সেলাম' শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

দূর হইতে সাহেবকে আসিতে দেখিয়া হাজতবাসীগণ একসঙ্গে সার দিয়া দাঁড়াইল। জমাদার হাঁকিল, সরকার সেলাম; সকলে দুই হাত সামনে রাখিয়া একসঙ্গে চিৎ করিয়া রাখিল। সাহেব চলিয়া গেলেন, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এগারটা বাজিল। বড় ফটকের এক পাশে একটা ছোট খিড়কি। উবু হইয়া দলে দলে কয়েদীরা জেলে প্রবেশ করিল। ইহারা বাহিরের বাগানে কাজ করিতে গিয়াছিল। রান্নাঘরের সম্মুখে গাছের তলায় জেলের সকল কয়েদী সমবেত হইল। গণনা শেষ হইলে এক এক দল স্নান করিতে নালার কাছে গেল।

স্নান নয়, কাক-স্নান। এক; সকলে একসঙ্গে বাটি ভরিয়া জল তুলিল। দুই; মাথায় জল দিল। ইহারই মধ্যে যে যতটা পারিল গা রগড়াইয়া লইল। এই ভাবে তিনবার হুকুম হইল। গা মাথা মুছিয়া আর এক বাটি জলে কাপড় ধুইল।

এর পর খাওয়ার পালা। সকলে সার দিয়া সেই গাছের তলায় আবার দাঁড়াইল। হুকুম হইল, এক; সঙ্গে সঙ্গে থালাবাটির ঝন ঝন শব্দ; দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলে যে যার থালাবাটি মাটিতে রাখিল। হুকুম হইল, দুই; একসঙ্গে সকলে বসিল।

বাক্স করিয়া ভাত আসিল। জেলের ভাষায় বাক্সগুলিকে বলে, ফ্যারা। বালতি ভরা ডাল। দুইজন কয়েদী ফ্যারা হইতে ভাত কাটিল। ভাত দেওয়া নয়, কাটা। ডাবুয়া দিয়া ডাল দিল। তাহাদের কথা শুনিয়া পবিত্র বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই সকল কথা যে কোথা হইতে আসিল, পবিত্র ভাবিয়া পাইল না। পরে পবিত্র জেলের অনেক কথাই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। পাঁচ আইন, কমবিলাসী, এমনি আরও কত।

রাত্রে যাহারা বন্দী অবস্থায় ওয়ার্ডের পায়খানায় মলত্যাগ করে, পরদিন তাহাকে পাঁচ আইনে দেওয়া হয়। শাস্তি, সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাস, বিকালে জল-সাগু। জেল-সংহিতায় রাত্রে মলত্যাগ করিলে পেটের অসুখ হইয়াছে ধরিয়া লওয়াই নীতি। কাহারও ওজন কম হইলে তাহাকে কমবিলাসী বলা হয়। ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে মাংস সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান হয়। মাংস না থাকিলে শুধু চর্ব্বি সিদ্ধ করিয়া খাওয়ানই বিধি।

ভাত মুখে দিয়া পবিত্রের কান্না পাইতে লাগিল। এমন মোটা অপরিষ্কার ভাত সে কখনও খায় নাই। খোসা-সুদ্ধ ডাল, তাহার উপর আবার এক বিশ্রী গন্ধ। নামমাত্র তরকারী, ঘাস-সিদ্ধও হয়তো তাহা অপেক্ষা উপাদেয়।

ভয়ানক রৌদ্রের জন্য সকলে ঘরে বসিয়া ছিল। খটাখট শব্দ হইতে পবিত্র চাহিয়া দেখিল, একটি লোক লোহা দিয়া গরাদগুলি পরীক্ষা করিতেছে। পবিত্রের মনে হইল, কর্ত্তৃপক্ষের চোখে হয়তো ইহা চিড়িয়াখানা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সে নিজেও হয়তো দুইদিন পরে ভুলিয়া যাইবে যে সে মানুষ।

২

জেল অফিসের কাজ যথাবিধি শেষ হইলে, পবিত্র দমদম স্পেশাল জেলের দ্বিতীয় ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত আরও অনেকগুলি বন্দী ছিল; পরিচিতগণ তাহাদের সানন্দে সম্বর্দ্ধনা করিল। পবিত্রকে কেহ চিনিত না।

তাহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এক ভদ্রলোক নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোত্থেকে আসছেন? আপনাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।

পবিত্র কহিল, হুগলি জেল থেকে এসেছি। আপনারা আমায় চিনতে পারবেন না—আমি ঠিক কংগ্রেসেব কাজ কবে জেলে আসিনি।

লোকটি ভাবিল, হয়তো কোন অফেন্সের জন্য তাহার জেল হইয়াছে। পবিত্রকে সঙ্গে লইবে কি না ভাবিতে লাগিল।

পবিত্র বলিল, কি ভাবছেন? মীটিং করতে গিয়ে আমার জেল হয়েছে।

লোকটি কহিল, তাই বলুন, তবে যে বললেন, কংগ্রেসের কাজ করেননি? আসুন, আমাদের ঘরে থাকবেন আপনি, আসুন। বলিয়া সে পবিত্রকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে লইয়া গেল।

দমদম জেল। জেল তাহাকে ঠিক বলা চলে না; গোলা-বারুদের কারখানাকে বন্দীশালায় পরিণত করিতে একটা প্রবল চেষ্টা চলিতেছিল। ঘরগুলি তখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। অনেক ঘরে জানালা দরজাও এখনও তৈয়ার হয় নাই। ভিতরে বাহিরে জঙ্গল। মাঝে মাঝে সাপ দেখা যায়। বাহিরের দেয়াল পাকা। পশ্চিম দিকে বড় ফটক; সেখানে

সর্ব্বদাই অস্ত্রধারী শান্ত্রী পাহারা দিতেছে। পূর্ব্ব দিকে পঞ্চাশ-ষাট গজ গেলে, সম্মুখেই অফিস। রাস্তার ডান দিকে জেলার ও জেলের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান।

জেল অফিসের ঠিক পিছনে হাসপাতাল, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। হাসপাতাল সংলগ্ন ছোট একটি দেয়াল; তাহার পার্শ্বে সরকারের এয়ার সার্ভে অফিস। মাঝখানে ভিতরে যাইবার দুই নম্বর ফটক। ফটক পার হইলে বন্দীশালা, বিনা হুকুমে কোন বন্দী ইহার বাহিরে আসিতে পারে না।

জেলের ভিতরে অনেকগুলি ওয়ার্ড। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কাঁটা তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। মাঝখানে থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর।

পাঁচ নম্বরের বাড়ীটা দোতালা। অধিবাসীগণ ইহাব নামকরণ করিয়াছেন, হাউস অব্ লর্ডস।

পবিত্র ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, একতালা একেবাবে ভর্ত্তি মাত্র পাঁচ ছয়টা জায়গা খালি আছে। সে তাহারই একটা বাছিয়া লইয়া সেখানে নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিল। দুই তিন দিন থাকার পর পবিত্র বুঝিতে পারিল, নানা জেলার বন্দীগণ পৃথক পৃথক দল করিয়া এক একটা স্থান অধিকাব করিয়া আছে। পবিত্রের কোন দল নাই, সে ঘরের এক কোণ অধিকার করিল।

পবিত্র শান্ত এবং গম্ভীর। সেজন্য সহজে কেহ তাহার সহিত কথা বলিতে আসিত না; মাঝে মাঝে প্রৌঢ়দের কেহ কেহ কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিত। গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত আলাপ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোন কাজ নাই, দিন মোটেই কাটিতে চাহে না। অনেক ভাবিয়া পবিত্র নিরঞ্জনকে একখানা চিঠি লিখিল।

তুই দিন পরে জেল অফিস হইতে খবর আসিল, এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা পবিত্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

পবিত্রের মুখ শুকাইল। শিবরামবাবু ও মহামায়া যদি আসিয়া থাকেন! বৃদ্ধ বয়সে শোকার্ত্ত পিতামাতাকে কত কষ্ট দিয়াছে ভাবিয়া তাহার অনুতাপ হইল।

জেল গেটে আসিয়া দেখিল, নিরঞ্জন ও মাধুরী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বন্ধুকে পবিত্র বুকে চাপিয়া ধরিল। মাধুরী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

নিরঞ্জন বলিল, তোর চিঠি পেয়ে কাল হালিসহরে গিয়েছিলুম। কাকীমার কান্না তো দেখা যায় না। কাকাবাবুরও মুখের দিকে তাকান যায় না। ছুটে এলুম তোর খবর নিতে; আবার ফিরে গিয়ে তাঁদের সব বলতে হবে। আজই বিকেলে যাব।

মাধুরী কহিল, এ ভাবে চলে আসবার কি দরকার ছিল? বলে কয়ে এলেই পারতেন। তারপর সে টিফিন কেরিয়ার হইতে নানারকম খাবার বাহির করিয়া বলিল, আগে এই খাবারগুলো খেয়ে নিন, তারপর অন্য কথা হবে।

পবিত্র কহিল, খাবার এনেছ, খাব বই কি। কিন্তু কদিন পরেই বা দেখা হল, অথচ মনে হচ্ছে যেন একটা যুগ কেটে গেছে। এতদিন তোমাদের না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

বিদায়ের পূর্ব্বে পবিত্র বলিল, একা একা বসে থাকতে পারি না। কোন কাজ নেই। তুমি গিয়ে আমাকে বই পাঠিয়ে দিও—হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স, পলিটিক্স—সব আপ-টু-ডেট। মাঝে মাঝে দু-একখানা ভাল ইংরেজি নভেলও পাঠিও।

৩

তিন মাস পরের কথা।

পবিত্র নিবিষ্ট মনে বার্টরাণ্ড রাসেলের রোড টু ফ্রীডম্ পড়িতেছিল। হীরেনবাবু তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বই পড়তে আপনার ভাল লাগে? এক মাসে এত বই আপনি কি করে পড়লেন ভেবে পাই না!

পবিত্র ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, না পড়ে কি করি বলুন, সময় কাটাই কি করে?

—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট, কোন দলের নন; অথচ আপনি যে ভাবে ধরা দিয়েছেন তাতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে—

—কি বিশ্বাস করতে আপনার ইচ্ছা হয় না?

—যে আপনি কোন দলের নন।

—হঠাৎ এ কথা মনে হবার কারণ?

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হীরেনবাবু কহিলেন, দেখুন, খাদি প্রতিষ্ঠান আর অভয় আশ্রমের সবাই মনে করে, তারা প্রত্যেকে একটা ছোট-খাট গান্ধী। দেখছেন না সতীশ দাশগুপ্তের কাণ্ডখানা?

পবিত্র ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হীরেনবাবু বলিতে লাগিলেন, পায়ে হেঁটে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবার খেয়াল আপনার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে? নিশ্চয়ই ওরা। নাম দিয়েছে আইন-অমান্য-পরিষদ্! কেন, বি. পি. সি. সি. কি মরে গেছে? সেনগুপ্তের এ কাজটা করা মোটেই ভাল হয়নি। যেমনি

আন্‌কনষ্টিটিউশনাল, তেমনি ধাপ্পাবাজি। লোক দেখিয়ে বেড়ান হচ্ছে, খুব কাজ হচ্ছে!

পবিত্র বিরক্ত হইয়া বলিল, এসব কথা আমায় বলছেন কেন?

হীরেনবাবু কহিলেন, বলবো না? নতুন লোক পেয়ে আপনাকে যে ওরা ভুল বুঝিয়ে দলে টেনে নিয়েছে, এ কথা আমরা বুঝি না?

—আমাকে দলে টেনে নিয়েছে, একথা আপনাকে কে বললে?

—তবে আপনাকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে কে বলেছিল? সুভাষবাবু এরকম ছেলেমানুষি করতে পারেন না। ওরা আবার করবে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স! লাঠি খাবার ভয়ে পেছিয়ে গেল।

পবিত্র বলিল, মহিষবাথানে যে সব কাণ্ড হলো, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

—ওই এক ধরে রেখেছে সবাই—মহিষবাথান। সেখানে যা কাজ হয়েছে, সে আর বলে কাজ নেই। পাঠিয়েছিলুম দুটো ছোঁড়াকে দেখে আসতে; নাজেহাল হয়ে তারা ফিরে এলো। না ছিল সেখানে ভাল খাবার ব্যবস্থা, না ছিল শোবার জায়গা—সবাই মিলে কেবল হৈ চৈ করলে। ভাগ্যিস, পুলিস লাঠি চালিয়েছিল, নইলে মহিষবাথানের নাম কে জানতো, বলুন। তবে হ্যাঁ, এ স্বীকার করতে হবে যে, প্রামাণিক মশায় একটা লোকের মত লোক। আপনি যেতেন একবার নীলাতে, দেখে আসতেন বি. পি. সি. সি.-র বন্দোবস্ত। সুভাষ-বাবু বাইরে ছিলেন তাই, নইলে দেখতেন আরও কি চমৎকার হোতো। পুলিসের সাধ্য কি ছিল ভেঙে দেয়!

রমেশবাবুকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া হীরেনবাবু কথা উল্টাইয়া বলিলেন, রাসেল লিখেছেন বেশ; কিন্তু বড্ড বেশী আইডীয়ালিষ্ট।

আচ্ছা, আমার একটু কাজ আছে, আর একদিন ভাল করে এ নিয়ে কথা হবে। আপনি বরং বইখানা শেষ করে ফেলুন।

হীরেনবাবু চলিয়া গেলে রমেশবাবু তাঁহার স্থান অধিকাব করিলেন।

—রাসেল পড়ছিলেন? চমৎকার বই। কিন্তু এখন ও সম্ভব হতে পারে না। লোকে কাজ করবে না, শুধু শুধু বসে খাবে।

—আমি বইখানা এখনও ভাল করে. বুঝে উঠতে পারিনি, বড্ড ষ্টিফ রাইটিং; অল্প কথায় এত বেশী করে বলতে চেয়েছেন, যে আমার মত মূর্খের বুঝে ওঠা দায়।

—ছি ছি, ওকথা কেন বলছেন? আপনার বেশ ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট আইডীয়া আছে। পায়ে হেঁটে গাঁয়ে গিয়ে মীটিং করবো, এ খেয়াল আমাদের কক্ষনো হোতো না। আচ্ছা, আপনাব অ্যারেষ্টে কি এফেক্ট হয়েছে বলুন তো?

পবিত্র লজ্জিত ভাবে বলিল, আমি আব কি করেছি বলুন? আপনারা সবাই কত বড়, দেশের জন্য কত কষ্ট করছেন! আমাব হঠাৎ খেয়াল হতে বেরিয়ে পড়েছি; ছাড়া পেলে আবার হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবো।

—না না, এ আপনি কক্ষনো করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো সেনগুপ্তকে বলে, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার মত কর্ম্মীকে কি কেউ ছেড়ে দিতে পারে? বোসাইটদের শুধু দমবাজি, কিছু করবে না; আর লিবার্টি শুধু ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে, কত কাজই না করছে! একবার ওদের মাথায় ঢুকেছে কি—আপনাদের ডেকে দুকথা বলতে? কেন? দেখুন, আপনি একজন লোকের মত লোক, আপনাকে আমরা কখনও ছাড়তে পারি না।

পবিত্র হাঁ না কিছুই বলিল না। সে ভাবিতেছিল, এ উৎপাত সে কতদিন সহ্য কবিবে ?

রমেশবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাবছেন আপনি ? কোন দলে যাবেন ?

পবিত্র বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, দেখুন, আমার কথা শুনে রাগ করবেন না আপনি। এ তিন মাস আপনাদের সঙ্গে থেকে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ? আমার মনে হচ্ছে, আপনারা দেশকে যতটা ভালবাসেন, তার চাইতে বেশী ভালবাসেন নিজের নিজের দলটিকে। আপনাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা, হয় আপনাদের দলের লোক দেশ স্বাধীন করুক, নয় দেশ পরাধীন থাক। হয় আপনাদের পলিসিতে দেশ স্বাধীন হবে, নয় দেশকে স্বাধীন করবার দরকার নেই। দেশ মরুক, দল বেঁচে থাক।

রমেশবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, পলিটিকাল পার্টি থাকবে বই কি, নইলে কাজ হবে কি করে ?

—দেখুন, আপনাদের পার্টি পলিটিক্স আমি বুঝি না। পলিটিক্স মানে যদি এই হয়, এক দল অন্য দলের কাজকে মিনিমাইজ করবে; একদল আর একদলের কোন কাজই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না; এদল ওদলের কুৎসা করে বেড়াবে; এ রকম পলিটিক্স আমার জন্য নয়। আপনারা আমাকে রেহাই দিন। আমি কারও দলে যেতে পারবো না। আমি একটা ক্ষুদ্র লোক—ঘরের এক কোণে পড়ে রয়েছি, আমাকে নিয়ে আপনাদের দুদলের এত টানাটানি কেন ? এ নিয়ে হয়তো শেষ কালটায় একটা ঝগড়াই বেধে যাবে দুদলের ভেতরে। ঝগড়া করতে তো আপনারা কেউ কম কসুর করছেন না ! এ ক মাসই দেখছি, একটা না একটা নিয়ে ঝগড়া লেগেই রয়েছে।

পবিত্র আরও অনেক কথা বলিতে চাহিতেছিল, এমন সময় প্রৌঢ় হিমাংশুবাবু হাসিতে হাসিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, ভায়া যে বড্ড গরম হয়ে উঠেছো দেখছি। হতেই হবে; কদ্দিন আর নেড়া-নেড়ীর কেত্তন গাইবে! গোড়া থেকেই তোমায় আমি চিনে রেখেছিলুম।

তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পবিত্রের মন আরও বিষাইয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু আর এক দলের জীব; সে দল বড় ভয়ানক।

—কি ভায়া, কথা বলছো না যে? আমায় দেখে একেবারে জল হয়ে গেলে যে! বলিয়া হিমাংশুবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পবিত্র বিরক্তির সহিত কহিল, আমাকে রেহাই দিন হিমাংশুদা, পলিটিক্স আর ভাল লাগছে না; কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে।

—এ আবার একটা পলিটিক্স! ছ্যাঃ! রাগ করে ঘরের মাগ কথা বন্ধ করলে—দুদিন খেলে না—পাশ ফিরে শুয়ে রইল,—ওগুলোও তাহলে পলিটিক্স, কি বল রমেশবাবু? তোমরা তো সবাই গাঁধী গাঁধী করে একেবারে ক্ষেপে উঠেছ; বল না, আমার কথা কি মিথ্যে?

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া হিমাংশুবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। রমেশবাবু কোন প্রকার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন মাত্র। পবিত্র সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা হিমাংশুবাবু, আপনার দেখছি গান্ধীজির ওপরে ভারি রাগ! কিন্তু ওঁর কথায় জেলে এসে চরকা কাটছেন যে?

—ক্ষেপেছ তুমি?—হা হা হা—আমি এসেছি গাঁধীর কথায় জেলে? হো হো হো! সত্যি কথা শুনবে? আমি এখানে এবার এসেছি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো বলে। বয়েস একটু বেশী হয়ে গেছে, নিজে থেকে আর কিছু করে উঠতে পারি না; তবুও—

বলিয়া হিমাংশুবাবু মনে মনে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বকিতে লাগিলেন।

পবিত্র মনে মনে বলিল, আমাদের দেখতে, না আমাদের কাঁচা মাথা গুলো চিবোতে? তারপর প্রকাশ্যে বলিল, গান্ধীবাদ একটু একটু বুঝতে পারি; কিন্তু আপনাদের কথা, হিমাংশুদা, একেবারেই বুঝি না। রোজ রোজ কথা কাটাকাটি না করে, খুলে বলুন তো আপনাদের ফিলজফিটা কি?

—ফিলজফি? ফিলজফি আবার কি থাকবে এতে? তোমাদের বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি!

—ফিলজফি, আইডীয়া—কিছুই নেই আপনাদের?

—আইডীয়া থাকবে না কেন? আমরা ঘোর সনাতনী। আমাদের কথা হচ্ছে—মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্। অন্য কোন ফিলজফির ধার ধারি না। এর চেয়ে বড় ফিলজফি আর হতে পারে না। আর, হলেও সে আমার জন্য নয়।

পবিত্র বলিল, কে যে মূর্খ তারই যখন ঠিক নেই, তখন একজন আর একজনের মাথায় লাঠি মারবে?

হিমাংশুবাবু বলিলেন, মারবে না? মারবে বই কি। এতে করেই তো দুনিয়া চলছে, দেশ শাসন হচ্ছে। যে যত বড় ভয়ানক তাকে তত বেশী করে লোকে মানছে, তার কথাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছে।

—একথা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলে সেটা যে সত্যি, সেটা যে শ্রেয়—এ আমি কোনদিন মেনে নিতে পারবো না। এতে করেই না দুনিয়ায় দুঃখ সব রকমে বেড়ে গেছে? শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকলে চলবে কি করে? মানুষ স্বাধীনতা পাবে কোত্থেকে?

হিমাংশুবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, এ শান্তি, এ শৃঙ্খলা কার জন্য?

জোর যার মুলুক তার; তোমার আমার মত নির্ব্বিবাদী লোক, যারা চোখ বুজে সব সহ্য করে, তাদের জন্য নয়, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

—বেশ, এ রকম যাতে না হয় সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন, লাঠি ধরে লাভ কি? লাঠি কোন দিন কি দুনিয়াতে শান্তি আনতে পেরেছে?

—তুমি কি মনে কর শান্তি কোনদিন হবে? হতে পারে না।

—কেন পারে না? সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি না হয়?

—দেখছি ভায়ার গয়লা-বুদ্ধিও নেই। বলিয়া হিমাংশুবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পবিত্র সে দিকে কর্ণপাত করিল না। সে বলিয়া চলিল, আপনারা কি মনে করেন, দুটো বোমা ফুটিয়ে, গোটা দুই পিস্তল ও রিভলবারের আওয়াজ করে, গোটা কয়েক সাহেব মেরে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে পারবেন? আপনারা বড্ড ভুল করছেন, এ কক্ষনো হতে পারে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হিমাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন হতে পারে না?

পবিত্র অধীর ভাবে বলিতে লাগিল, হবে কি করে? দেখছেন না, ইংরেজের কি দুর্জ্জয় শক্তি; একটা ছোট আইল্যাণ্ড থেকে সমস্ত পৃথিবীর উপর চোখ রাঙাচ্ছে? কটা পিস্তল আর কটা বন্দুক আছে আপনাদের? লুকিয়ে চুরিয়ে যে কটা জোগাড় করেন তা দিয়ে কি কখন সম্ভব? কক্ষনো না। সিপাই মিউটিনীর সময় বলতে গেলে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছলো;—দেশের যে সব লোক যুদ্ধ করতে জানতো, যুদ্ধ করা যাদের ব্যবসা, সারা জীবন যারা লড়াই করে এসেছিল,

ইংরেজ যে সময় এ দেশে ভাল করে খুঁটি গেড়ে বসেনি, সে সময়েই সিপাইরা কিছু করতে পারলে না, আর—

হিমাংশুবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, সিপাইদের ন্যাশনাল আইডীয়া ছিল না।

—এ আপনাদের ভুল ধারণা। ন্যাশনালিজম মানে যদি ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানো হয়—আপনাদের ন্যাশনালিজম হচ্ছে তাই—এ ন্যাশনালিজম আপনাদের কারুর চাইতে সিপাইদের কম ছিল না।

—অবশ্য সিপাই মিউটিনীর মত এত বড় একটা কিছু করে উঠতে পারবো, এ ধারণা আমার নেই।

—তাহলে এ রক্তপাত কেন?

—না করে যে উপায় নেই। দেখছো না, সাহেবরা কি রকম নার্ভাস হয়ে উঠেছে।

পবিত্র হাসিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, হাসছো যে বড়?

—না হেসে কি করি বলুন। এ-কথা শুনলে কে আর হাসি চেপে রাখতে পারে? ইংরেজকে আপনারা এখনো ভাল করে চেনেননি। তাদের ক্যারেক্টার আছে, আমাদের নেই। ক্যারেক্টার বলতে আমরা সোজাসুজি চরিত্র বুঝি, এক কথায় বলতে গেলে পরনারী সম্বন্ধে নিস্কাম মনোবৃত্তিকেই আমরা বলি চরিত্র। কিন্তু ক্যারেক্টার হচ্ছে একটা মানসিক শক্তি—সম্পূর্ণ পজিটিভ। ইংরেজের এই ক্যারেক্টারের সঙ্গে ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় হয় বাদশাহ শাজাহানের আমলে। ডক্টর গেব্রিয়েল বাউটন অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা চাইলে সম্রাট তাঁকে শাহজাদী ও বড় রকমের একটা জায়গীর দিতে কসুর করতেন না। বাউটন কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। তিনি

স্বজাতির জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করলেন। গুণমুগ্ধ সম্রাট তাঁর আর্জি মঞ্জুর করলেন। তারপর তিনশো বছর কেটে গেছে, ইংরেজের সেই ক্যারেক্‌টার তেমনি অটুট রয়েছে ;—বরং ঢের বেশী দৃঢ় হয়েছে বলতে পারেন। প্রলোভন দেখিয়ে সত্যিকার কোন ইংরেজকে বশ করতে কেউ পারে না, টাকা দিয়েও না, রূপসী তরুণী দিয়েও না। আপনারা ভয় দেখিয়ে ইংরেজকে কাবু করবেন ভেবেছেন? কক্ষনো পারবেন না। ভয় বলে কোন কথা তাদের শাস্ত্রে লেখা নেই।

হিমাংশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এর তো একটা মর্‍্যাল এফেক্ট আছে, এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর?

পবিত্র কহিল, আপনি না একটু আগে গান্ধীজির নিন্দা করছিলেন? তিনিও তো চান চেঞ্জ অব হার্ট ; দেখছি আপনাদের দুজনেরই অবজেক্ট এক, কিন্তু মেথড আলাদা। গান্ধীজির কথার তবু একটা মানে আছে, ভালবেসে হৃদয় জয় করা যায়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে মন পাওয়া যায়, এ তো কোনদিন শুনিনি। এ যেন জোর করে সতীত্ব হরণ করে নারীর হৃদয় জয় করা। সেটা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু সতীত্ব হরণ করবার শক্তিও আপনাদের নেই। এ তো আপনি একটু আগেই বলেছেন।

হিমাংশুবাবু এবার চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, যা মুখে আসছে তাই যে বলছ দেখছি!

পবিত্র কহিল, ইংরেজকে সত্যিই যদি আপনারা শত্রু মনে করেন, তাহলে শত্রুর গুণগান শুনলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক বই কি।

—তুমি কি ইংরেজকে শত্রু মনে কর না?

—শত্রু মনে করি না, বন্ধুও মনে করি না। যে সময় ইংরেজ

এ দেশে অধিকার বিস্তার করেছিল, সে সময়কার ভারতবর্ষের কথা একবার ভেবে দেখুন দেখি। ইংরেজ না অধিকার করলে ফরাসী করতো। আর সে অবস্থার তো এখনও একটু ব্যতিক্রম হয়নি। যতদিন দেশের আবহাওয়া বদলে না যাবে, ততদিন ইংরেজ এদেশ অধিকার করে থাকবেই। আমি তাকে শত্রুই মনে করি, আর মিত্রই মনে করি, এতে ইংরেজের কিছু এসে-যায় না। তা বলে যেটা সত্য তাকে অস্বীকার করবো কি করে? যেটা সত্যি নয়, যা করা কখনও উচিত নয়, যেটা কোনদিন সম্ভব হবে না তার ভেতরে আমি কোনদিন যেতে পারব না। এতদিন আপনাদের কথা আমি শুনে এসেছি, নিজে থেকে কিছু বলিনি, আজ আর আমার সহ্য হল না। আমায় আপনারা রেহাই দিন। হুজুগে পড়ে কত ছোট ছোট ছেলে জেলে এসেছে, দুনিয়ার কোন খবর যারা রাখে না, ভাল করে ভাবতে পর্য্যন্ত যারা এখনও শেখেনি, তাদের কাছে গিয়ে আপনাদের কথা বলুন, তাদের কাঁচা মাথায় ঐ সব আইডীয়া ঢুকিয়ে দিন, আপনাদের দল তাতে ভারী হয়ে উঠবে। আমাকে কেবল রেহাই দিন! আমি এক পাশে পড়ে আছি, আপনাদের কোন কথায়ও থাকতে চাই না। আমাকে নিয়ে এত কেন? এই বই কখানা নেড়েচেড়েই কটা দিন আমার বেশ কেটে যাবে।

হিমাংশুবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে, মুখখানাকে অতি কুৎসিৎ করিয়া পবিত্রকে কহিলেন, তোমায় চিনতে আর আমার বাকী নেই! বই পড়া হচ্ছে, না, আমাদের মাথা খাওয়া হচ্ছে? স্পাই কোথাকার!

স্পাই, স্পাই, স্পাই—শুনিয়া পবিত্র মর্ম্মাহত হইলেও, বিচলিত হয় নাই। ইহাতে বরং তাহার সুবিধাই হইল। দূর হইতে সকলে কটাক্ষ করিত, কিন্তু কাছে আসিত না। পবিত্র নির্ব্বিবাদে একটার পর একটা বই শেষ করিয়া ফেলিল। সে শুধু পড়িত না, মূল্যবান কথাগুলি সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিত। অবকাশকালে সে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা বসিয়া বসিয়া ভাবিত। জগতের আর্থিক সমস্যাগুলি পবিত্র ঠিক বুঝিতে পারিত না। একবার, দুইবার, তিনবার—বিষয় আয়ত্ত না হওয়া অবধি সে বইগুলি পড়িত। এমনিভাবে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

স্পাই, স্পাই, বলিয়া বলিয়া ওয়ার্ডের বন্দীগণ অবশেষে হয়রান হইয়া পড়িল। পবিত্র তাহাদের কথায় কান দেয় না। নিজের ওয়ার্ড ছাড়িয়া সে বড় একটা অন্য কোন ওয়ার্ডে যায় না। স্পাই রব উঠিবার প্রথম দুই-তিন দিন অন্যান্য ওয়ার্ডের লোকেরা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে আসিয়া দূর হইতে পবিত্রকে উঁকি দিয়া দেখিয়া যাইত। তাহারাও ক্রমে সে ওয়ার্ডে আসা ছাড়িয়া দিল; তাহা ছাড়া এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ ঔৎসুক্যও আর বেশী দিন রহিল না।

স্পেশাল জেলে আসিয়া মাসখানেক পবিত্র অন্যান্য ওয়ার্ডের সকল বন্দীর সহিত এক ঘরে খাইত। সে সময়ে হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, আমিষাশী, নিরামিষাশী সকলের আহার্য্যই

একসঙ্গে রান্না হইত, পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। কিছুদিন পরে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা স্বপাক আহার করিবার অনুমতির জন্য জেলের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের নিকট আবেদন করেন। জেলের বাহিরে আইন অমান্য করা এবং জেলে আসিয়া আইন মানিয়া চলাই কংগ্রেসের মূল নীতি। সাহেব আবেদনকারীকে স্বপাক আহারের অনুমতি দেন। ক্রমে আরও অনেক কংগ্রেস-কর্ম্মী প্রার্থী হন, তাঁহারা সকলেই নিরামিষাশী। সংখ্যা বেশী হওয়াতে নিরামিষাশীদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হইল। প্রার্থীগণ স্বপাক ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল করিয়া লইলেন; পালা করিয়া তাঁহারা প্রতিদিন রন্ধন করিতেন, অন্যান্য প্রার্থীগণ সেই স্বপাচ্য নিরামিষান্ন পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। ইহা দেখিয়া মুসলমান বন্দীগণ জানাইলেন, তাঁহারা হিন্দুর আহার্য্য-দ্রব্য তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা হইল। এবং এই কারণেই মাড়োয়ারী বন্দীদিগের পৃথক ভোজনাগার এবং রন্ধনশালা হইল। সাধারণ পাকশালা ও ভোজনাগারের আর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য পৃথক আমিষ রন্ধনশালার ব্যবস্থা করিলেন। এক স্থানে বহু লোকের রন্ধন ও আহারের ব্যবস্থা থাকায় ইতিপূর্ব্বে সমস্ত রাত্রি ওয়ার্ডগুলি খোলা রাখা হইত। ইহাতে রাজ-বন্দীগণের এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডে গিয়া গল্প-গুজব করিবার সুবিধা হইত। এখন কর্ত্তৃপক্ষ সে সুবিধা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রি দশটার পর প্রত্যেক ওয়ার্ডের বাহিরে কাঁটা তারের বেড়া সংলগ্ন দরজাগুলি তালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। রন্ধনশালা এবং ভোজনাগার পৃথকীকরণের বিবর্ত্তন দেখিয়া পবিত্র দুঃখিত হইল। যাঁহারা বাহিরে থাকিতে ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে একটা নেশনে পরিণত করিতে

চাহিয়াছেন, জেলে আসিয়া তাঁহারা সংবদ্ধভাবে নেশন গড়িতে পারিলেন না। সর্ব্বত্যাগী কংগ্রেস-কর্ম্মীগণ নিজেদের পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। হাজাব বৎসরেব পবাধীনতাব সংস্কার হইতে ভাবতবাসী কি কবিয়া মুক্ত হইবে !

ভোজনাগার পৃথক হওয়াতে ব্যক্তিগত ভাবে পবিত্রেব বিশেষ সুবিধা হইল, সহস্র-চক্ষুর শ্লেষব্যঞ্জক কটাক্ষের সম্মুখে তথাকথিত গুপ্তচব সাজিয়া তাহাকে আর আহার করিতে হইল না। পবিত্র বাঁচিয়া গেল।

বই পড়িতে পড়িতে সে মাঝে মাঝে অবসন্ন হইয়া পড়িত। দেহ-মনে এমন জড়তা বোধ কবিত যে চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার আর থাকিত না। কিছুক্ষণ নিঝুমের মত বসিয়া থাকিয়া পবিত্র ওয়ার্ডের দক্ষিণের খোলা ময়দানে পায়চারি কবিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছেলের দল সেখানে কুচ-কাওযাজ শিখিত। রাত্রি একটু বেশী হইলে মাঠে আর লোকজন থাকিত না। পবিত্র সেই অবসবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিযা দেহ-মনের অবসাদ দূর কবিত।

সাধারণ কাজের জন্য আলিপুব হইতে কয়েকজন সাধাবণ কয়েদী আনা হইয়াছিল। সকলে তাহাদিগকে ফালতু আখ্যা দিয়াছিল। পবিত্র তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে আলাপ করে, তাহাদেব সুখ-দুঃখেব কথা শোনে। ফালতুরা পবিত্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কোন রাজনৈতিক বন্দীকে অসম্মান কবিতে কোন ফালতুকে সে দেখে নাই।

কয়েক সপ্তাহ পরে আর একদল বন্দী আসিল। তাহাবা সাধারণ কয়েদী নয়, কংগ্রেসের সহিতও তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কলকারখানাব মজুবগণ ধর্ম্মঘট করিয়া দাঙ্গা

করিয়াছে। তাহাদের নেতারা সকলেই ভদ্রলোক; তাঁহারা কলওয়ালা-দিগের অধীনে চাকুরী করিতেন না। নূতন বন্দীগণ সকলেই শ্রমিক-নেতা।

গীতা ক্লাস, হিন্দি ক্লাস—পবিত্র দমদমে আসিয়াই দেখিয়াছে, পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডেই এই ক্লাসগুলি বসে। বিনয় প্রধান শ্রমিক-নেতা। সে অবিলম্বে ধোপাখানাটি অধিকার করিয়া সেখানে কমিউনিজ্‌ম্‌ ক্লাস খুলিল।

বিনয় খুব চতুর এবং উৎসাহী। সে পবিত্রকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। পবিত্রকে একভাবে বই পড়িতে দেখিয়া সে তাহার কাছে গিয়া বসিল। আলাপ জমিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অনেক দিন পর একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতে পারিয়া পবিত্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইল। বিনয় পবিত্রকে সমভাবাপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সেদিন কমিউনিজ্‌ম্‌ ক্লাসে তুমুল তর্ক উঠিল। বিনয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ধোপাখানার এক কোণে পবিত্র চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

একদল প্রজার পক্ষ লইয়াছে, আর একদল জমিদারের পক্ষ। ওয়ার ছাড়া কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহাই ছিল সেদিনকার বিতর্কের বিষয়। স্বাধীন মত প্রকাশের প্রকৃষ্ট স্থান—বন্দীশালা। হয়রান হইয়া শেষে উভয় পক্ষ তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য পবিত্রকে অনুরোধ করিল।

ইহাতে সে একটু অস্বস্তি বোধ করিল; তাড়াতাড়ি বলিল, আমায় আবার এর ভেতরে টেনে আনছেন কেন? বেশ তো শুনছিলুম আপনাদের কথা।

—সেই জন্যেই তো আমরা সবাই আপনার কথা শুনতে চাইছি। এখানে এসে কাউকে চুপ করে বসে থাকতে আমরা দেব না।

—তাহলে বরং কাল থেকে আর আসবো না।

—এ কি একটা কথা হল! আপনি শুধু পড়েই যাবেন, কোন কথা বলবেন না? এ ভারি অন্যায় আপনার;

—এখনো যে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

—আপনার কোন কথা আমরা শুনছি না। বলতেই হবে আপনাকে—আপনার মত।

পবিত্র বলিল, দেখুন, বাঙলাদেশে কে রাজা আর কে প্রজা বলা খুবই শক্ত। এত বেশী রকমের সাবইন্‌ফিউডেশন হয়েছে বাঙলায়; একই লোক এক অবস্থায় জমিদার, হয়তো আর এক অবস্থায় সাধারণ চাষী-প্রজার চাইতে কোন বড় রকমের অধিকার তার নেই।

জীবন প্রজার পক্ষে; বাধা দিয়া সে বলিয়া উঠিল, আপনার কথা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না; আর একটু খুলে বলুন।

—বাঙলার মাটিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করে ফেলা যায়, সরকারী খাস আর জমিদারী। সরকারী খাস খুব কম। জমিদার একজন নয়, অনেক। ছোট বড় প্রায় বিশ হাজারের ওপর জমিদার বাঙলা দেশে রয়েছেন। সব জমিদারের শুধু যে জমিদারী রয়েছে তা নয়, এঁদের ভেতরে অনেকে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, মধ্য-স্বত্ব-ভোগী, মোকরারীদার। আবার অনেক জমিদার রয়েছেন, যাঁরা অন্য কোন জমিদার বা পত্তনিদারের অধীনে সাধারণ রায়ত ভাবে অনেক জমি রাখেন। একই লোকের পক্ষে জমিদার ও সাধারণ রায়ত প্রজা হতে বাধা নেই; বাঙলাদেশে এরকম লোক অনেক রয়েছে।

—আপনার কথা বুঝতে পেরেছি ; এবারে বলুন আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন।

—যেমন জমিদার তেমনি আর সবাই এক অবস্থায় রাজা আর এক অবস্থায় প্রজা ; সাধারণ রায়তকেও এ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। রায়তের অধীনে আণ্ডার-রায়ত রয়েছে ; রায়ত সেখানে রাজা, আণ্ডার-রায়ত প্রজা। আবার আণ্ডার-রায়তের অধীনেও হয়তো আধিয়ার, বরগাদার রয়েছে ; বরগাদার প্রজা, আণ্ডার-রায়ত রাজা। আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় যে তীব্র শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখছি, বাঙ্গলাদেশে সেরকম নেই। অন্যান্য প্রভিন্সের কথা আমি জানি না।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলে জয়েণ্ট ষ্টক কম্পানি থেকে ট্রাষ্ট ও কারটেলের অভ্যুদয় হওয়াতে ইউরোপ ও আমেরিকায় দুই শ্রেণীর লোক স্থষ্টি হয়েছে—ধনী আর মজুর। এদের ভেতরে যেরকম তীব্র ক্লাস-ডিস্‌টিংশন রয়েছে, ভারতবর্ষের সে রকম অবস্থা এখনও হয়নি। রাশিয়ার সার্ফ ও বাঙলার চাষী-প্রজা এক নয়। সেজন্য মনে হয়, ক্লাস-ওয়ারের কথা বাঙলা দেশে উঠতেই পারে না। অন্যান্য প্রভিন্সেও চলবে কিনা সন্দেহ। ক্লাস-ডিস্‌টিংশন বাঙলায় সমাজের খুব নীচের স্তরে রয়েছে—রায়ত ও আধিয়ারের ভেতরে। রায়তের জমি রয়েছে, আধিয়ারের নেই। কমিউনিষ্ট যে ক্লাস-ডিস্‌টিংশনের কথা ভাবছে বাঙলায় তা দেখা যায় না। জমিদার ও আধিয়ারের কোন মনোমালিন্য হতেই পারে না, যদিও জমিদার সব জমির মালিক আর আধিয়ারের কিছুই নেই। রায়ত ও আধিয়ারের মনেও কোন গোল নেই। দুজনেই সমান ভাগ পায় ; একজন পায় জমির মালিক বলে, আর একজন পায় খাটুনির জন্য। কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলতে চান আমাদের দেশে ক্লাস-ওয়ার হতেই পারে না ?

—আমি তো সে কথা বলিনি। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, ক্লাস-ওয়ার হবার মত অবস্থা আমাদের দেশের এখনও হয়নি। ইন্‌টেন্স ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌ হলে, ট্রাষ্ট ও কারটেল গড়ে উঠলে এদেশেও ক্লাস-ওয়ার হবে বই কি।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, ট্রাষ্ট আর কারটেল এ দুটো কি ?

পবিত্র কহিল, এ দুটো বড় ভয়ানক, সমস্ত ব্যবসা, সমস্ত কল-কারখানা গ্রাস করে। সব জিনিষের মালিক হয়ে বসে—কোন কিছু থাকতে দেয় না। যে দুচার জন লোক, যারা এদের অংশীদার বা মালিক তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী হয়ে ওঠে। আর আর সব লোক হয় মজুর অথবা বেকার। ছোট ছোট দোকান খুলে, ছোট ছোট কল চালিয়ে বা ছোটখাটো জমি চাষ করে যে কেউ স্বাধীনভাবে রোজগার করবে এ অবস্থা আর থাকতে পারে না। হয় ট্রাষ্ট বা কারটেলের অধীনে থেকে চাকরী বা মজুরী করে দিন গুজরান কর, না হয় বেকার বসে থাকো। এ রকম অবস্থা কি এখন আমাদের দেশে হয়েছে ? এ রকম যতদিন না হচ্ছে, ততদিন এ দেশের ধনী ও মজুরদের ভেতরে তীব্র মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না।

জীবন অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তাহলে আমাদের দেশে ষ্ট্রাইক হচ্ছে কেন ?

—এর জন্য দায়ী গভর্ণমেণ্টের বোকামী আর কলওয়ালাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি। ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন্‌ প্রব্‌লেম্‌ নিয়ে গভর্ণমেণ্ট সব সময়েই বিব্রত হয়ে উঠেছে। সাউথ আফ্রিকা, কেনিয়া, ফিজিতে সব সময়েই একটা না একটা গোল লেগেই রয়েছে। একবারও ভেবে

দেখছে না, দেশ ছেড়ে লোক ওসব দেশে গিয়ে ঘর-বাড়ী করে চাষ-বাস করছে কেন? এদিকে কলওয়ালারা দিনরাত গজ গজ করছে, লেবার পাওয়া যায় না, ইণ্ডিয়ান লেবারের রেস্পন্সিবিলিটি জ্ঞান নেই, কাজ শেষ না হতেই ঘরমুখো ছোটে। এ জ্ঞান থাকবে কেমন করে, ইণ্ডিয়ান লেবার ফ্যাক্টরী টাউনে একথা একবারও কেউ ভাবে না। ভারতবর্ষের লোক এখনও ইউরোপ আমেরিকানদের মত হয়নি। তারা পরিবারের ভেতরে থাকতে চায়; পরিবার মানে শুধু স্ত্রী নয়, বাপ-মা, ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে মিলে মিশে এক আত্মীয়-সমাজের ভেতরে এক জায়গায় থাকবে এই না হচ্ছে ভারতবর্ষের আদর্শ। গভর্ণমেণ্ট আর কলওয়ালারা কি এদিকে কোনদিন নজর দিয়েছে? দেশে থেকে রোজগারের সুবিধা হচ্ছে না, দলে দলে চাষী দেশ থেকে চলে গিয়ে সাউথ আফ্রিকা, কেনিয়ায় জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করছে। তারা অল্প খরচায় সংসার চালাতে পারে, বাবুগিরি এখনও শেখেনি, তাই বেশী করে লাভ করছে। এতে সে সব দেশের সাদা-চামড়াওয়ালাদের চোখ টাটাচ্ছে। খোলাখুলি বলতে না পেরে এক ধুয়ো উঠিয়েছে তারা, ইণ্ডিয়ানরা অতি অসভ্য, অত্যন্ত নোংরা; কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। তবে যাতে তারা সভ্য হয়, নোংরা স্বভাব আর না থাকে তার ব্যবস্থা করো। তা নয়, তাদের দেশে পাঠিয়ে দেবার জন্যে চারদিক থেকে সব সময়ে একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র চলছে। কোনো জিনিষ ভাল করে তলিয়ে দেখবে, এ দেশের গভর্ণমেণ্টের কুষ্ঠিতে তা লেখা নেই। দেশের লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, এতে ষ্ট্রাইক হবে কেন?

পবিত্র কহিল, কেন হবে না? মজুররা তো ভারতবর্ষ ছাড়া নয়।

তাদের কি পরিবার নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না? তারা চায় ভাল থাকবার জায়গা, বড় বাড়ী যেখানে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতে পারে। একটা ছোট্ট কুঠরী তাদের দেওয়া হয়, যেমন ছোট, তেমনি নোংরা; একেবারে অন্ধকার, ভেতরে কখনো আলো-বাতাস প্রবেশ করে না। এই ঘরে বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে কি থাকা চলে? তারা চায় গাঁয়ের মত খোলা জায়গা, মুক্ত আলো ও বাতাস। গাঁয়ে তাদের অনেক জিনিষ কিনে খেতে হয় না। শাক সবজি তাদের ঘরেই হয়; তাই কম টাকাতেই চলে। কলওয়ালারা ভাবে, চাষ করে কি এত টাকা পেতো? পায় না সত্যি, কিন্তু সব জিনিষ তো তাকে গাঁয়ে বসে কিনে খেতে হয় না। তা ছাড়া গাঁয়ে এত অসুখ-বিসুখ নেই। এত ক্লান্তি, এত অবসাদ, কিছুই সেখানে নেই। এই সব বলে বলে মজুরের দল হয়রান হয়ে গিয়ে তারপরেই না ধর্ম্মঘট করে?

একটু চুপ করিয়া পবিত্র আবার বলিতে লাগিল, এর আর একটা দিকও আছে। আপনাদের মত যাঁরা শ্রমিক নন, তাঁরা মাঝে মাঝে মজুরদের ক্ষেপিয়ে তোলেন। অনেকে ক্ষেপান তাদের অবস্থা ভাল করবার জন্য, আবার আর একটা দল আছে, যাঁরা ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন নিছক একটা আইডীয়ার তাগিদে, যাঁদের গভর্ণমেণ্ট ও কলওয়ালারা বলছেন কমিউনিষ্ট।

পবিত্রের কথা শুনিয়া বিনয় বিরক্তির সহিত বলিল, কমিউনিষ্টদের এতে দোষ কি?

পবিত্র কহিল, দোষ-গুণের কথা আমি বলছি না। মজুরকে মজুরের সুখ-সুবিধার জন্য ক্ষেপালে এক ফল, আর নিছক আইডীয়ার দিক থেকে ক্ষেপিয়ে তুললে অন্য ফল পাবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শেষেরটা

করলে কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠা তো হবেই না, বরং ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে এগিয়ে আনা হবে।

বিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ আপনি কি বলছেন? জানেন, আমরা ফ্যাসিজ্‌মের ঘোর বিরোধী?

—জানি বলেই তো বলছি, নইলে এ কথা তোলবার আমার কোন দরকার ছিল না। ভুললে চলবে কেন, মজুররা শুধু মজুরই নয়, তারাও চাষী? পাঁচ ভাইয়ের ভেতরে দু ভাই এসেছে কলে চাকরী করতে, আর তিন ভাই গাঁয়ে থেকে চাষ-আবাদ করছে। যে সময় চাষ-আবাদের দরকার হয় না, সেই সময়েই না দু'ভাই কলে চাকরী করতে আসে? কলের কাজ করতে করতে চাষের সময়ে হয়তো কোন কোন বছর দু ভাই দেশে ফিরে যেতে পারে না, সে সময়ে আর তিন ভাইকে জন মজুর খাটিয়ে চাষ করতে হয়। কমিউনিজ্‌মের আইডীয়া দেশে ছড়িয়ে পড়লে একই লোকের দুই বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘাত হবে। যে মজুর হয়ে কলওয়ালার সঙ্গে লড়াই বাধাবে, সেই আবার চাষী মালিক হয়ে নিজের জন-মজুরের সঙ্গে ঝগড়া আর মারামারি করবে। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে হয়ে পড়বে হয়রান, চাইবে এরকম একটা ব্যবস্থা বা সমাজ যা আমরা ইতালিতে দেখিতে পাচ্ছি।

৫

কিছুক্ষণ পরে জীবন জিজ্ঞাসা করিল, বাঙলার চাষীদের অবস্থার জন্য জমিদাররা দায়ী নন?

পবিত্র উত্তর করিল, কোন কোন জমিদার ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হলেও তাঁদের সকলকে সাধারণ ভাবে দায়ী করা চলে না।

—তাহলে দায়ী কে?

—আমি ঠিক জানি না। তাই এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল।

—আপনি কি কোনদিন এ বিষয় নিয়ে ভাবেননি? কোন ধারণা নেই আপনার?

—তা থাকবে না কেন? কিন্তু আছে বলেই যে সেটা সত্য, তা—

—সত্য মিথ্যা আমি বুঝি না, আপনি যা জানেন তাই বলুন। আমি তো কিছুই জানি না; আপনার মত এত ভাবতেও পারি না, পড়াশুনা করতেও ভাল লাগে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পবিত্র বলিল, দেখুন, শুধু বাঙলার চাষীদের কথা ভাবলেই চলবে না' আমাদের দেখতে হবে, কি করে বাঙালী দিন দিন গরীব হয়ে যাচ্ছে, অথচ আর আর সবাই বাঙলায় এসে টাকা রোজগার করে পেট মোটা করে বাড়ী ফিরছে; সাহেব, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, শিখ, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, কাউকে আমি এ থেকে বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু এসব বলতে গেলে ঢের সময় লাগবে, প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে।

জীবন কহিল, লাগে লাগবে। আজ আমি আপনাকে ছাড়ছি না। আমরা তো আর কাউকে ধরে রাখছি না, ইচ্ছা হয় শুনবে, না হয় চলে যাবে।

পবিত্র তখন বলিতে লাগিল, ইংরেজ এ দেশে আসবার আগে বাঙলার অবস্থা এরকম ছিল না। পৃথিবীর সব দেশে সে সময়ে যেমন ছোট ছোট কুটীর-শিল্প ছিল, বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়েও তেমনি ছিল,

শুধু চাষ-বাস করেই বাঙালীকে দিন গুজরান করতে হতো না। অনেকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিতে বাঙালী তখন পৃথিবীর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে—

জীবন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, ঢাকার মসলিনের কাছে—

—শুধু মসলিন কেন? সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রিতে বাঙালী এমন নাম করেছিল যে, বছরে লাখ লাখ টাকার সিল্ক সাহেবরা এদেশ থেকে কিনে নিয়ে যেতো।

প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা, সে সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই ইণ্টারনাল ট্রেড ডিউটি ছিল—দেশের ভেতরে এক জায়গা থেকে মাল অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হলে প্রত্যেক সওদাগরকে শুল্ক দিতে হতো। সম্রাট শাজাহানের মেয়েকে ভাল করে ডক্টর বাউটন পেলেন বাদশাহের কাছ থেকে এক ফরমান, যাতে করে ইংরেজ পেলে বাঙলায় আবাধ বাণিজ্যের অধিকার। এ অধিকারের মানে জানেন?

—না।

—এতে ইংরেজকে আর ইণ্টারনাল ট্রেড ডিউটি দিতে হলো না।—যা আর সবাইকেই দিতে হতো। আজকাল আমরা সব সময়ে চেঁচিয়ে থাকি, সাহেবরা ব্যবসা করতে অনেক সুবিধা পায়। কিন্তু যে অধিকার ইংরেজ শাজাহানের আমলে পেয়েছিল, আজকালকার সুবিধা তার কাছে কিছুই নয়। আইন করে ইংরেজকে এখন আর কোন সুবিধাই দেওয়া হয়নি। ভেবে দেখুন একবার, ইংরেজ তখন এদেশের রাজা হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, অথচ দেশের যিনি সম্রাট, নিজের ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য কি সর্ব্বনাশ তিনি করলেন তাঁর প্রজাদের! কিন্তু এতেও বাঙলার বিশেষ ক্ষতি হতো না। অবাধ বাণিজ্যের এ অধিকার দেওয়া হয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিকে।

কম্পানি সব জিনিষের কারবার করতো না, বাঙালী ব্যবসায়ীকে মাত্র দুটো চারটে জিনিষ একটু কম লাভে বিক্রয় করতে হতো। কিন্তু অধিকার পেলে কম্পানি, আর সে অধিকারের দোহাই দিয়ে বিনা শুল্কে জোর করে ব্যবসা চালাতে স্থরু করলে কম্পানির আমলারা স্বনামে ও বেনামীতে, পলাশী যুদ্ধের পর থেকে। এতে দেশে যে কি অশান্তি, কি অরাজকতা স্থরু হয়েছিল তা তো সকলেই জানেন। সবচেয়ে লোকশান হলো বাঙালী সওদাগরদের, তারা প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে হটে যেতে লাগলো। এটা বেশী দিন চললো না, বিলেতে জানতে পেরে সাহেব আমলাদের এদেশের ব্যবসা তুলে দেওয়ার হুকুম হলো। এরও কয়েক বছর পর—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে—পার্লামেণ্ট কম্পানিকে আর এদেশে ব্যবসা করতে দিলে না। এর পরে এলো দুটো বিপ্লব—একটা পৃথিবী-জোড়া, আর একটা শুধু বাঙলায়—যাতে করে বাঙলার সমস্ত আবহাওয়া বদলে গেল, শিল্প-বাণিজ্য বাঙালীর হাত থেকে খসে পড়লো; বাঙালী রইল মাটি কামড়ে—মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে বলে। তবে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা আমি না বলে পারছি না; হয়তো আপনারা সবাই সেটা জানেন। কম্পানির আমলাদের স্বনামে ও বেনামীতে অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে বাঙালী ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখে নবাব মিরকাশিম প্রজার পক্ষ নিয়ে কলকাতার কাউন্সিল্‌কে জানালেন, কম্পানিই শুধু বিনা শুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার পেয়েছেন, তার আমলাদের এ অধিকার দেওয়া হয়নি। ভ্যান্‌সিটার্ট ও ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ নবাবের পক্ষ নিলেন; কিন্তু কোন ফল হলো না, ভোটে তাঁরা দুজনে হেরে গেলেন। রাগে ও দুঃখে নবাব মিরকাশিম তখন যে কাজ করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজাই প্রজার স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ অবধি নিজের এরূপ ক্ষতি স্বীকার করেননি। নবাব দেশ

থেকে সব ইণ্টারনাল ট্রেড ডিউটি তুলে দিলেন। কম্পানি চটে গিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ; সে লড়াইয়ে মিরকাশিমের কি হলো আজ অবধি কেউ জানে না।

—তারপর কি হলো ?

—নূতন করে ডিউটি বসলো, সে শুল্ক সাহেবদের দিতে হলো না। এসব যখন হলো তখনও ইংরেজ এদেশে পাকা হয়ে বসেনি, মুসলমানেরা এদেশ শাসন করছে। বাদশাহ্ শাজাহানের আমল থেকে প্রায় একশো বছরের ওপর বাঙালী সওদাগরদের যে ভয়ানক রকম লোকশান দিতে হয়েছে তাতেই তারা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, যেটাই ধরছে সেটাতেই দিচ্ছে লোকশান। এমনি সময়ে এলো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পবিত্র আবার বলিতে লাগিল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা আপনারা সকলেই জানেন,—বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার অভ্যুদয়। নতুন নতুন কলের আবিষ্কার আগেও হয়েছে। দু হাজার বছর আগে আলেকজেণ্ড্রিয়াতে ষ্টীম-এঞ্জিন বের হয়েছিল। কেউ সেটাকে কাজে লাগাতে পারেনি কেন, জানেন ?

—না।

—কারণ, তা চালাবার মত ক্যাপিটাল তাদের ছিল না। হার-গ্রিভস্ আর্করাইট, ক্রম্পটন ও জেমস্ ওয়াট নতুন নতুন কল আবিষ্কার করে খুবই উপকার করেছেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এরাও তেমনি অচল হয়ে যেতো, যদি না সে সময়ে উপযুক্ত ক্যাপিটালের যোগাড় থাকতো।

—এ মূলধন তাঁরা পেলেন কোত্থেকে ?

—বাঙলা থেকে। একশো বছর বাঙলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পেয়ে সাহেবরা যে টাকা লাভ করেছিল সেইটাই হলো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল' রেভলিউশনের গোড়াকার মূলধন। এছাড়া নানা ভাবে

সে সময়ে বাঙলার টাকা বিলেতে গিয়েছিল। তারপর হু হু করে নতুন কলে তৈরী মাল বাঙলার বাজার ছেয়ে ফেললো। কুটীর-শিল্প আর কতদিন টিকে থাকতে পারে? হটে যেতে লাগলো। গোড়াতে নতুন কল ও মূলধন পেয়েও সাহেবরা খুব সুবিধা করতে পারেনি। বাঙালী শিল্পী তার পুরানো চরকা ও পিতৃপুরুষের সংস্কার নিয়ে এমন সূক্ষ্ম কাজ করতে লাগলো, যে বাঙলার সিল্কে বিলেতের বাজার ছেয়ে গেল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন এমনি হাই প্রটেক্‌টিভ ডিউটি বসালে যে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বিলেতের বাজার বাঙালীর হাত-ছাড়া হয়ে গেল। এতেই এর শেষ হলো না, কম্পানির আমলারা বাঙালী শিল্পীদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কারখানায় তাদের দিয়ে র সিল্ক তৈরী করাতে লাগলো। তাতে বাঙালী শিল্পী ফাইন সিল্ক তৈরী করে আর বিলেতের কলওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার সুযোগ পেলে না। কিছুদিন থেকে সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রি রিভাইভ করবার জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অবশ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেক রাত হয়েছে, আজ থাক।

—না না। আজই সব বলতে হবে।

পবিত্র আবার বলিতে আরম্ভ করিল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুধু বিলেতেই হয়নি, কম বেশী করে সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল, এখনও চলছে এর কাজ। আমাদের দেশে এ রেভলিউশন খুব এফেক্টিভ হয়েছে বম্বেতে; বাঙলায় যে একেবারে হয়নি তা নয়, তবে বাঙালী তাতে ভাল করে যোগ দেয়নি।

—কেন যোগ দেয়নি, বাঙালীর অবস্থা ভাল নয় বলে?

—তা ঠিক নয়, সাধারণ বাঙালীর অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চাইতে অনেকটা ভাল।

—তাহলে কেন যোগ দেয়নি ?

—সেইটেই আমি এখনও ঠিক ভেবে পাইনি। বিলেতের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন বাঙলার কোন ক্ষতি করতে পারতো না; বাঙালী শিল্পী ও সওদাগর গোড়াতে হটে গেলেও ঘা খেয়ে খেয়ে ঘর সামলাতে পারতো। আর বাঙলাতেও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন সুরু হতো, যেমন হয়েছিল বম্বেতে বা আর সব দেশে।

—বাঙলায় কেন হলো না ?

পবিত্র কহিল, রেভলিউশন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে খানিকটা সময় লাগে; কিন্তু এরই মধ্যে বাঙলায় আর একটা রেভলিউশন হয়ে গেল, যার এফেক্ট এখনও রয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সিপাই মিউটিনির কথা বলছেন ? সে তো অনেক পরের কথা। আর সে তো শুধু বাঙলায় হয়নি, সারা ভারত জুড়ে—

পবিত্র বলিল, আমি মিউটিনির কথা বলছি না, বলছি পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের কথা।

—পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট ! সে তো একটা আইন !

—বিপ্লব কি সব সময়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর রক্তপাত করেই করতে হয় ? দল না বাঁধলে কি রেভলিউশন হয় না ? যে কাজটা খুব আস্তে আস্তে হতে পারতো, তাড়া দিয়ে সেটা শেষ করে সব জিনিষের চেহারা বদলে দেওয়াই না বিপ্লব ? শুধু একটা আইন করেও রেভলিউশন আনা চলে। দেখছেন না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার চেহারা কি ভাবে বদলে গেছে ?

মিনিট কয়েক পরে জীবন বলিল, আপনার কথা ধরতে পারলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পবিত্র কহিল, পরে বুঝতে পারবেন, আগে শুনে যান। মিরকাশিম ও শা আলমকে হারিয়ে কম্পানি পেলে দেওয়ানী, সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়েও কম্পানি বাঙলার রাজা হয়ে বসেনি। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন দিল্লীর বাদশাহের অধীনে বাঙলার সুবেদার। শা আলমকে পরাস্ত করে কম্পানি হলো বাঙলার রাজা। রাজত্ব পেয়ে তারা মহা ফাঁপরে পড়ল। কম্পানি এসেছিলো ব্যবসা করতে, ব্যবসাই তারা বুঝতো, যারা রাজত্ব করতে জানে তারা থাকতো সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। তাই হঠাৎ এত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়াতে একেবারে হকচকিয়ে গেল, ভেবে পেলে না, এত বড় দেশটাকে নিয়ে তারা কি করবে।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, ভেবে পেলে না মানে ?

পবিত্র বলিল, মানে আর কি ? কম্পানির আমলারা কি তখন জানতো, হিন্দু আর মুসলমান আমলে "জমি কার ? যে চাষ করে তার।" নিজের দেশের ল্যাণ্ড-লজগুলোই তারা জানতো, এদেশের খবর রাখতো না। এ সব তারা জানতো না যে, বাঙলায় চাষীই হচ্ছে জমির মালিক। জমিদার শুধু আদায় তহশীল করে নবাবের খাজাঞ্চী-খানায় ওয়াপোষ দেবে। আদায়ের কড়াকড়ি ছিল না, ঠিক সময়ে ওয়াপোষ দিতে না পারলে জমিদারকে কয়েদ রাখবে, জমিদারী কেড়ে নিয়ে তারি কোন আত্মীয় স্বজনের ওপরে আদায় তহশীলের ভার দেবে। বয়স্থলতানী নিয়মে বেচে ফেলবে না। এক-একজন জমিদারের কত ক্ষমতা ছিল ! বিষ্ণুপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর—এঁরা সৈন্য রাখতেন, দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করতেন, লোককে সাজা দিতেন। এ সব থেকেও তাঁরা জমির মালিক কোনদিন ছিলেন না। কম্পানিব আমলারা এর কোন খবরই রাখত না।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, দেওয়ানী পেয়ে সাহেবরা তাহ্‌লে কি করলেন ?

পবিত্র কহিল, কি আর করবে ? তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল খুব টনটনে ! সব জমিদারী তারা নীলামে তুললে। তারপর যা হবার তাই হলো। জমিদারদের হাতে কোনদিনই বেশী টাকা থাকে না, সে সময়েও ছিল না, এখনও নেই। ব্যবসায়ীদের ভেতরে সব দেশেই দুটো দল থাকে। এক দল সত্যিকার ব্যবসায়ী, তারা জিনিষ কেনে আর বেচে ; আর এক দল কোনও মাল কেনা-বেচা করে না, তারা ফটকাবাজী করে মাঝখান থেকে দুপয়সা লাভ করে, মাঝে মাঝে লোকশানও দেয়। শেষের দল জমিদারী নিয়ে ফটকাবাজী স্বরু করলে। তাদের সঙ্গে সত্যিকার জমিদার পেরে উঠবে কেন ? অনেকের জমিদারীই হাতছাড়া হয়ে গেল। আজ যে ছিল রাজা, কাল সে হয়ে গেল একেবারে ফকির। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা ভয়ানক ওলটপালট হতে লাগলো।

একটু দম লইয়া পবিত্র আবার বলিতে আরম্ভ করিল, বাঙলার শুভ মুহূর্ত্তে এ দেশে এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস বড় লাট হয়ে। তাঁর আগে সত্যিকার সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসেননি। তিনি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, একটা দেশ শাসন করবার পক্ষে ছিলেন উপযুক্ত লোক।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আগে আর কোন বড় ঘরেব ছেলে এ দেশে আসেননি ?

—না। যারা এসেছিল, তারা পেটের দায়েই এসেছিল। বাঙলার নিদারুণ দুর্দ্দশা দেখে তিনি দশ-সালা বন্দোবস্ত করলেন। পরে সেটাই হলো আজকালকার পার্মানেন্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট। লর্ড কর্ণওয়ালিসের

কো-ওয়ার্কার ছিলেন স্যর জন শোর। তিনিও তাঁরই মত বিদ্বান ও মহানুভব।

—শোর সাহেব কি করেছিলেন?

—পার্মানেন্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের আইডীয়া তাঁরই মাথা থেকে বেরু হয়েছিল। দশ-সালা বন্দোবস্তের সময় অনেকেরই জমিদারী হাতছাড়া হয়ে গেল। জমা ধরা হয়েছিল খুব বেশী করে; কিন্তু প্রজার কাছ থেকে সব সময় আদায় হতো না। হবে কি করে? যে হট্টগোলের ভেতরে সবাই ছিল! অনেক জমিদার রেভিনিউ দিতে পারলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। নাটোর, দিনাজপুর—এঁদের অনেক পরগণা হাতছাড়া হয়ে গেল। সে সব কিনে নিলে মহাজন, সওদাগর আর রাজারাজড়াদের আমলা গোমস্তারা। এখন যে সব জমিদার আমরা দেখছি তাদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এঁরাই। সে যাই হোক, এর পর বাঙলায় আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এলো, অনেক পোড়ো জমি আবাদ হতে লাগলো।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এতে করে প্রজাদের খুব সুবিধা হয়েছে?

পবিত্র কহিল, একেবারে যে অসুবিধা হয়েছে, এই বা বলি কি করে? তবে হয়তো আরো সুবিধা হতে পারতো।

—কি করে হতো?

—যারা নতুন জমিদার হলো, তাদের অনেকেরই গোড়া থেকে এই চেষ্টাই ছিল, কি করে আরও বড়লোক হবে, কি করে আরও দুপয়সা আয় বাড়বে। তারা বংশানুক্রমিক জমিদার নয়, মনের উদারতা তাদের ছিল না। তারা শুধু জানতো শাসন ও শোষণ, প্রজার সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির কোনরূপ চেষ্টা তারা করলে না। লর্ড কর্ণওয়ালিস

ভেবেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার প্রজার উন্নতি কামনা করবে। কারণ, প্রজার স্বার্থ ও উন্নতির সঙ্গে জমিদারের স্বার্থ ও সমৃদ্ধি একেবারে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু হলো ঠিক তার উল্টো। প্রজার রক্ত শোষণ করে জমিদার নিজে ফুলতে লাগলো। তারপর সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে তারা চলে এলো সহরে। সেখানে জুটলো মোসাহেব, জুটলো সুরা আর নারী। কেউ কেউ হয়ে গেল সর্ব্বস্বান্ত। তখন আর জমিদারী চালাতে না পেরে দেনার দায়ে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হাতে জমিদারী ছেড়ে দিলে। কেউ কেউ সহরে এসে আইন-সভায় যোগ দিলে। কেউ কেউ হলো একজিকিউটিভ কাউন্সিলার অথবা মিনিষ্টার। নায়েব-গোমস্তারাই হলো এদের জমিদারীর হর্ত্তা-কর্ত্তা। এরা কি কখনও প্রজার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেয়? চারদিক থেকে হতে লাগলো অত্যাচার, প্রজারা শেষে মরীয়া হয়ে উঠে পাবনায় এমন একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বসলো, যে গভর্ণমেণ্ট আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলে না, বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট পাস করলে।

—এতে কি প্রজার স্বার্থ রক্ষা হয়েছে?

—না হয়নি, হতে পারে না। এর পেছনে কোন প্রিন্সিপল নেই। এটা একটা কম্প্রোমাইজ ষ্ট্যাটিউট, যাতে করে দু-দলের স্বার্থকে কোন রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। এতে কারো অবস্থা ভালো হতে পারে না।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, কেন পারে না?

পবিত্র কহিল, হবে কি করে? শুধু স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য যে আইন, সে কি কোনদিন ইম্‌পেটাস্ দিতে পারে? পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌-মেণ্ট জমিদারের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রেখেছে; অথচ বড় বড়

রাজা-রাজড়াদের চুল অবধি দারভাঙ্গা আর ভাগ্যকুলের কাছে বাঁধা। চুণো-পুটিরা তো মাথা তুলতেই পারে না।

জীবন ঠিক তাহার কথা ধরিতে পারিতেছে না দেখিয়া পবিত্র বলিল, দেখুন, সাধারণ বাঙালী অত্যন্ত চালাক। শাজাহানের আমল থেকে ঘা খেয়ে খেয়ে তারা বুঝলে, ব্যবসা করে আর লাভ নেই, শুধু শুধু ঠকতে হবে। গোড়াতে এরা অবশ্য জমিদারী নিয়ে ফাটকাবাজী করেনি, কিন্তু পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট হওয়াতে তারা বুঝতে পারলে টাকা খাটাবার মস্ত বড একটা সুবিধাও হয়েছে, লোকশানের কোন ভয় নেই। তারা তখন নিলেমে জমিদারী কিনতে লাগলো। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে যখন তারা একটা অবলম্বনেব জন্য হাতড়াচ্ছিল, পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট তখন তাদের সম্মুখে খুঁটির মত এসে দাঁড়ালো। কিন্তু সবার কপালে জমিদারী জুটলো না, নিলেম হতে হতেও অনেক পুরনো ঘর তাল সামলে নিলে। যারা জমিদারী পেলে না, তারা শেষটায় হলো পত্তনীদার।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, পত্তনী-স্বত্ব কি করে এলো?

—বর্দ্ধমান জমিদারী রাখতে পারবে না দেখে এক ফন্দি আঁটলে, জমিদারী পত্তনী দিয়ে দিলে। পত্তনীদারের অবস্থা ঠিক জমিদারের মত, খাজনা কোন দিন বাড়বে না, কেউ কেড়েও নিতে পারবে না। যে সব সওদাগর জমিদার হতে পারলে না, তারা শেষটায় হল পত্তনীদার, এর নীচে দর-পত্তনীদার, ইস্তমুরারদার, আরও কত যে স্বত্ব জন্মাল—একই মাটির উপরে—তা বলে শেষ করা যায় না। তারপর এলো মাড়োয়ারী, একটা লোটা নিয়ে, আর কিছু নয়, শুধু একটা ছোট লোটা। পাটের কাজ ছিল বাঙালীর একচেটে, কলকাতায় মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই। বাঙালী চাষীর হাত থেকে পাট চাষ কেউ কেড়ে

নিতে পারেনি, হয়তো এও যাবে দুদিন পরে। বাঙালী এখন নিজের হাতে পাট নিড়ায় না, কাটে না, হিন্দুস্থানীরা এসে এসব করে। ব্রেজিল আর রাশিয়াতেও পাট-চাষ হচ্ছে। যাক সে সব কথা, হাটখোলায় বাঙালী সওদাগরদের বড় বড় গুদাম ছিল, বিজনেস্ অনেষ্টি তাদের ছিল খুব বেশী; বিলেতে বসে সাহেবরা মার্কা শুনে পাট কিনতো, জিনিষ দেখতে চাইতো না। এই সব সওদাগরেরাও জমিদার হবার লোভ সামলাতে পারলে না। মাড়োয়ারী দেখলে এই তো সুযোগ, মোটা সেলামী দিয়ে দু-তিন বছরের জন্য ইজারা নিলে মার্কাগুলো বাঙালী সওদাগরদের কাছ থেকে। তারপর ডাণ্ডিতে চললো পাট বাঙালীর নামে, সাপ্লাই করলে মাড়োয়ারীই। দু-একটা শিপমেণ্ট ভালই দিলে, তারপর সব বাজে মাল। হঠাৎ ধরা পড়ে গেল শেষের দিকে। বাঙালী সওদাগরের সুনাম নষ্ট হয়ে গেল। দু-তিন বছর পর মার্কা যখন তার নিজের ঘরে ফিরে এলো, তখন দেখলে, মাড়োয়ারী মার্কার ইজ্জত একেবারে মেরে বসেছে, সাহেবদের কাছে এর আর কোন মূল্য নেই। বাঙালী সওদাগর যেন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাকে আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। কোটি টাকা তার হাতে, বড় রকমের মহাজনী সুরু করে দিলে। সুরা আর নারীতে মত্ত জমিদাররা টাকা টাকা করে যখন চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, মহাজন বললে, টাকা আমি দিচ্ছি। জমিদারী বাঁধা পড়ে গেল। জমিদার দেনা শুধতে পারলে না, সওদাগর তখন গদী ছেড়ে বসলো গিয়ে জমিদারের মসনদে। ব্যবসা গেল, শিল্প গেল, বাঙালী মাটি কামড়ে পড়ে রইল। পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টে এই যে এত পরিবর্ত্তন, এই তো হলো রেভ-লিউশন।

পবিত্র পুনরায় কহিল, এতেও বাঙালীর দুর্দ্দশার শেষ হয়নি। যখন

কম্পানির কাগজ বের হলো, কলকাতার যত বড়লোক সেদিকে ঝুঁকলে, হু হু করে সব কাগজ বিক্রী হয়ে গেল। যাদের ব্যবসা তখনও কোন রকমে টিপ টিপ করে চলছিলো, তারা কারবার গুটিয়ে নিয়ে কাগজ কিনলে। বাঙালী সব সময়ই চায় সেফেষ্ট ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট, যাতে করে কোন ঝক্কি তাকে পোয়াতে হবে না। পেলেও তারা তাই। কম্পানির কাগজগুলো তাদের বড় একটা হাত বদলালো না, দর চড়া-মন্দার ধার তারা ধারে না। অবশ্য এ কথা ঠিক, লড়াইয়ের সময় কেউ কেউ কাগজ বদলে বণ্ড কিনেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পবিত্র কহিল, বাঙালী কেমন যেন ভড়কে গেছে, কিছুতেই আর তার আস্থা নেই। ইংরেজ আমলের গোড়াতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন স্বরু হওয়াতে পরপর ঘা খেয়ে খেয়ে বাঙালী একেবারে শিল্প-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়েছিল; এর মানে খানিকটা বোঝা যায়। কিন্তু সে সব লোক তো কবে মরে গেছে, অথচ তাদের বংশধব —আমরা—এখনও সেই ভড়কানো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি; পূর্ব্ব সংস্কার আমাদের রক্তের কণায় কণায় জড়িয়ে আছে। মাটি তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এ দিকে ভূঁইয়ের উপরে যে কত রকম-বেরকমের অধিকার জন্মেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়! বাঙালীর দৃঢ় বিশ্বাস এ গভর্ণমেণ্ট থাকবেই, যদি নাও থাকে, আর যারা আসবে তারা নিশ্চয়ই দেনা শুধবে। তাই যার যা কিছু পুঁজি-পাটা আছে, হয় ল্যাণ্ড, নয় গভর্ণমেণ্ট পেপার, নয় ওয়ার বণ্ড, এও না জোটাতে পারলে পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটে ইন্‌ভেষ্ট করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এর পর যে দু-দশ টাকা থাকে তা দিয়ে গয়না গড়িয়ে গৃহিণীর মনোরঞ্জন করে, এতে কি করেই বা শিল্প-বাণিজ্য হবে, আর কি করেই বা দেশ ধনী হবে।

পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পবিত্র কহিল, দেখুন, যার জন্যে বাঙালী এরকম জড়ভরত হয়ে গেছে, সেই পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টকে তুলে দিতে হবে। বাঙালীকে আর মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেওয়া হবে না।

জীবন বলিল, কিন্তু পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট তুলে দেবেন কি করে? এটা যে একটা সেক্রেড কণ্ট্রাক্ট?

পবিত্র কহিল, সবাই এ কথা বলে বটে, কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। কোনো পার্লামেণ্ট কি পরের পার্লামেণ্টের হাত বেঁধে দিতে পারে? একবার আইন হলে কি সে আর কখনও রদ হয় না? সকলের সুবিধার জন্যই আইন। মনুসংহিতাও তো বদলে গেছে টীকা-টীপ্পনী দিয়ে; পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট আর বদলানো যাবে না? কণ্ট্রাক্ট তো হয়েছিল দশসালা বন্দোবস্তের সময়। অবশ্য এতে একটা ষ্টিপুলেশন ছিল, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স অ্যাপ্রুভ করলে সেটাকে পার্মানেণ্ট করা হবে। পার্মানেণ্ট করা না করা গভর্ণমেণ্টের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো একটা আইন—রেগুলেশন—এ তো কণ্ট্রাক্ট নয়। তুলে দেওয়া যাবে না কে বললে? গভর্ণমেণ্ট কি কোনোদিন বলেছে বদলানো চলবে না? শুধু বলছে বদলান হবে না;—দুটো কথায় ঢের তফাৎ।

জীবন প্রশ্ন করিল, পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট না থাকলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ধাক্কা সামলে নিয়ে বাঙালী আবার শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারতো, এ ধারণা আপনার কি করে হলো?

—এরও কারণ রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু বাঙলায় নয়, বেহার-উড়িষ্যা, আসামের খানিকটা জায়গা, মাদ্রাজের কতকগুলো জেলা, বেনারস আর আউধেও রয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার

আর কোনো জায়গায় পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট নেই। বম্বেতে নেই, সেখানে সব কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতীয়দের হাতে; পাঞ্জাবে নেই, সেখানে বড় রকমের কলকারখানা না থাকলেও এখনও প্রত্যেক গাঁয়ে তাঁত চলে, অনেক জায়গায় গরম পশমী কাপড়ের কল রয়েছে। সোনা-রূপোর ভাল ভাল কাজ হয়, সিল্কের তাঁত এখনও চলছে, হাতীর দাঁতের খেলনা, মাটির জিনিষ তৈরী হচ্ছে। তারপর ধরুন, ইউ পি—এখানে আলিগড়ের তালা, মির্জ্জাপুরের কার্পেট, চুনারের পাথরের জিনিষ, মোরাদাবাদের পিতলের কাজ, গাজিপুরের পারফিউমারি, বেরেলির সুন্দর সুন্দর আসবাব; এ সমস্তই এখনও তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া সব জায়গায় এখনও তাঁত চলে। মাদ্রাজে বারশোর উপর কুটীর-শিল্পের কারখানা আছে। আসামে যে সব জেলায় পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট নেই, সেখানে মেয়েরা প্রত্যেকে তাঁতে সিল্ক এবং তুলার কাপড় বোনে। বাঙলায় আর বম্বেতে বড় বড় কলকারখানা গড়ে তোলবার যে সুবিধা আছে অন্যান্য প্রভিন্সে তা নেই; থাকলে হয়তো বম্বে-ওয়ালাদের মত সে সব জায়গার লোকেরাও বড় বড় কারখানা বসাতো। আর তারা না বসালেও সাহেবরা নিশ্চয়ই গিয়ে ফ্যাক্টরি খুলতো, গঙ্গার দুধারে যেমন পাটকল তৈরী হয়েছে।

—আচ্ছা, যে সব জায়গায় পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট রয়েছে সে সব জায়গার লোকেরাও কি আমাদের মত মাটি কামড়ে পড়ে আছে?

—নেই? নিশ্চয়ই আছে। বেহারে দেখুন, কলকারখানা তো নেইই, সামান্য কুটীর-শিল্পটি পর্য্যন্ত উঠে গেছে। উড়িষ্যাতেও তেমনি। যেখানেই পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট আছে সেখানেই ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানীয় লোকদের হাত থেকে চলে গেছে। বাঙলায় কলকারখানা হলো, কিন্তু বাঙালী তাতে যোগ দিলে না, শেয়ার হয়তো কেউ কেউ কিনেছে।

খনি থেকে কয়লা তুলে বিক্রী সুরু হলো, এতেও বাঙালী গেল অনেক দেরীতে। চা বাগান অবশ্য বাঙালী করেছে অনেক, এটাই হচ্ছে বাঙালীর একমাত্র গৌরব। কিন্তু এও শুধু জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জায়গায়, যেখানে পার্মানেণ্টলি সেট্‌ল্‌ড জমি খুব কম আছে। নাহলে হয়তো এখানেও বাঙালী হাত গুটিয়ে বসে থাকতো। আর আপনি বলছিলেন, প্রজার দুর্দ্দশার জন্য জমিদার দায়ী? এক চাষীর দিকেই, দেখুন, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাঙলার পাঁচ কোটী লোক। তার দু পয়সা হলে জমিদার খাজানা পাবে, মহাজন সুদ পাবে, উকীল ফিস পাবে, ডাক্তার ভিজিট পাবে, কেরানী মাইনে পাবে, সওদাগর লাভ করবে, কলওয়ালা ডিভিডেণ্ড পাবে, গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্স পাবে। অথচ চাষীর যে কত কষ্ট, কেউ তা ভেবেও দেখে না। সে নিজে না খেয়ে পরের অন্নের সংস্থান করছে, নিজে অনাবৃত থেকে অপরের কাপড় যোগাচ্ছে। তার মাথা রাখবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত নেই, ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে, এর জন্য কি দায়ী শুধু জমিদার? সবাই ভাবছে বেশ তো আছি, কিন্তু এই ভাবে কি বেশী দিন চলবে? পাটের ব্যবসাটাই হয়তো কয়েক বছর পরে গিয়ে পড়বে সাউথ আমেরিকার ব্রেজিলিয়ানদের হাতে আর সোভিয়েট রাশিয়ায়।

৬

কমিউনিজম্‌ ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার পর হইতে সকলেই পবিত্রকে সমীহ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিশ্লেষণ-শক্তি ও প্রগাঢ় বুদ্ধি সকলকে মুগ্ধ করিল। তাহাদের নিকট পবিত্র স্পাই হইতে একেবারে

দেশ-প্রেমিক হইয়া উঠিল। মত বদলাইতে তাহাদের এতটুকু বিলম্ব হইল না।

পবিত্র ইহাতে দুঃখিতই হইল। এত হালকা স্বভাব তাহাদের! উত্তেজনার পিছনে আত্মপ্রত্যয় নাই, শুধু নিছক ভাবুকতা! শ্লেষ বা কটূক্তিও যেমন পবিত্রকে বিচলিত করিতে পারে না, উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়ও সে চঞ্চল হইল না।

সে আবার ঘরের কোণ লইল, তখনও সব বই পড়িয়া উঠিতে পারে নাই; নিরঞ্জন অনেক বই পাঠাইয়াছিল। একদিন শিবরামবাবু ও মহামায়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিশেষ কোন কথা হয় নাই, শুধু কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর সাশ্রুনেত্রে পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কাশীবাসী হইবেন। নিরঞ্জন ও মাধুরী আরও অনেকবার দেখা করিতে আসিয়াছিল।

তাহার গাম্ভীর্য্য ভেদ করিতে কেহ বড় একটা চেষ্টা করিত না। কখন কখনও দুই-একজন তরুণ টেবিলের বইগুলি নাড়াচাড়া করিত, মামুলী দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইত; গল্প জমিয়া উঠিত না, আসর জমাইবার শক্তি পবিত্রের ছিল না। দলচর জীবগুলি বড়-একটা তাহার কাছে ঘেঁসিত না; দূরে দাঁড়াইয়া কটূক্তি করিতে অবশ্য কেহ কসুর করিত না। সব সময় সব কথা পবিত্রের কানে আসিত না, আসিলেও সে কোন জবাব দিত না। জীবন মাঝে মাঝে আসিয়া গোল বাধাইত; তর্ক করিত, ঝগড়া করিত, মুখ গোঁ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে হঠাৎ চলিয়া যাইত। পবিত্রের কথা শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগিত।

বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইবার-তখনও তিনদিন বাকী।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় উঠবেন? পবিত্র কহিল, এখনও কিছু ঠিক করিনি; আগে তো বেরোই, তারপর ভাবা যাবে।

—জেল থেকে বেরিয়ে আপনি আর ঘরে ফিরে যাবেন না নিশ্চয়ই?

পবিত্র অবাক হইল, কহিল, ঘরে ফিরে যাব না কি রকম? একবার কাশী যেতে হবে না, মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে?

জীবন বলিল, আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম, আপনি তো দেশের কাজ করবেন।

পবিত্র কহিল, দেখুন, পলিটিক্স আমার ভাল লাগছে না। সব সময়েই মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে আমাদের দেশের নাড়ীর যোগ নাই।

জীবন বলিল, এত লোক জেলে এসেছে, বাইরেও কি রকম হট্ট-গোল বেধে গেছে, এ কি শুধু শুধু? দেশ সাড়া না দিলে হতো এরকম?

—দেখুন, ওপর ওপর দেখলে ঐ রকম একটা ভয়ানক কিছু মনে হয় বটে, কিন্তু—

—কিন্তু যে এর ভেতর কি আছে বুঝি না।

—দেশ কি শুধু একটা আইডীয়া? এর কি কোন রিয়্যালিটি নেই? নিছক কল্পনা আর ভাবপ্রবণতাই কি দেশের সব? বাস্তবকে বাদ দিলে চলবে কেন? সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা—কেবল এই বলে দেশ-মাতৃকার বন্দনা করলেই কি দেশকে চেনা যায়?

—দেশকে তাহলে কি করে চিনতে হবে?

—দেশকে চিনতে হলে, জানতে হবে দেশের লোককে, দেশের আবহাওয়াকে দেশের ভিতরের সত্যকার শক্তিকে। এব আগে দেশকে

স্বাধীন করবার চেষ্টা ছেয়েমেয়েদের পুতুল খেলার মত। সত্যিকার কোন কাজ এতে হবে না। বাইরে থেকে পার্লামেণ্ট দেশের ঘাড়ে একটা শাসন-যন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেসও বাইরে থেকেই সেটাকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে। সত্যিকার স্বাধীনতা কি এভাবে আসবে ?

—তাহলে আপনি কি করতে বলেন ? গান্ধীবাদ কি আপনি পছন্দ করেন না ?

—না না, আমি সে কথা বলছি না। সত্যকার স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের দেশের পক্ষে হয়তো গান্ধীবাদই একমাত্র উপায়। যেটা সত্যি বলে জানবো, বিশ্বাস করবো, সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সব রকম দুঃখ-দৈন্য নিজে বরণ করে নেবো, আর কারও গায়ে আঁচড়টি অবধি লাগতে দেব না, এর চেয়ে বড কথা আর কি হতে পারে ? এতে করে হয়তো সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ স্বাধীন হবে, পৃথিবীতে শান্তি আসবে ; কিন্তু এতেই কি দেশ স্বাধীন হবে ?

—কেন হবে না ?

—কি করে হবে ? ভারতবর্ষে কি এখনও একটা নেশন গড়ে উঠেছে ? গড়ে ওঠবার কোন সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি না। একবার ভারতবর্ষের লোকদের কথা ভাবুন। রেসেস্ অব্ ইণ্ডিয়া নিয়ে এক-একজন এথনলজিষ্ট এক-একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন, যতগুলি এক্সপার্ট, ততগুলি মত বললেও মিথ্যা বলা হবে না। সেই সব বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করলে মনে হয়, সবার আগে অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম মানুষ এসেছিল ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য। এই অষ্ট্রালয়েড্‌দের ভেতরে নেগ্রিটোও ছিল। তারপর মেডিটেরেনিয়ানরা এসে সে সব জায়গায় ঘর-বাড়ী বেঁধে

থাকতে লাগলো। এতে করে দক্ষিণ ভারত ও মাদ্রাজ উপকূলে এই তিন জাতের রক্তের ক্রমিক সংমিশ্রণ হলো। এক্সপার্টরা বলেন, নেগ্রিটোরা ভারতবর্ষে এসেছে উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়ে, এখনও আসামের অনেক জায়গায় এদের বংশধরদের দেখতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রালয়েড আর মেডিটেরেনিয়ানরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে বললে ভুল হবে না। এর পর অনেকদিন কেটে গেল, একশো বছরও হতে পারে, হাজার বছরও হতে পারে, মুণ্ডা জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে। সম্ভবত এরা পূব দিক থেকে এসেছিল; এই নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। এরও হয়তো হাজার বছর পরে এলো আলপাইন দল মধ্য এসিয়া থেকে; ভারত-বর্ষে ঢুকলো উত্তর-পশ্চিম-দিক দিয়ে। আলপাইনেরা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সমুদ্র-উপকূল অবধি ছড়িয়ে পড়লো, তারপর দাক্ষিণাত্য পার হয়ে এসে পৌছল বাঙলায়। এক্সপার্টদেব ভেতরে কেউ কেউ মনে করেন, সম্ভবত এবা প্রথমে গঙ্গাব দুধারে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, পরে ক্রমে বাঙলায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। আলপাইনেরা আর্য্য; এরা বৈদিক আর্য্যদের আগে ভারতবর্ষে এসেছিল কিনা এ নিয়ে দুদলের ভেতরে এখনও কথা-কাটাকাটি চলছে। এক্সপার্টদের অধিকাংশেব মত, বৈদিক আর্য্যরা এদেশে আসবার আগে ভারতবর্ষ সভ্যতার অনেক উচ্চস্তরে উঠেছিল। মহেঞ্জদাড়োতে এমন অনেক জিনিষ পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে হয় সেগুলো মেডিটেরেনিয়ান, আলপিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও প্রোটো-অষ্ট্রেলিয়ানদের কীর্ত্তি। যে রেসই আগে আসুক না কেন, একথা মেনে নিতেই হবে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীগণ ঐ সকল বিভিন্ন ঔপনিবেশক ও আক্রমণকারীদের বংশধর।

জীবন উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বৈদিক আর্য্যদের পর আর কোন নতুন রেস ভারতবর্ষে এসেছে কি ?

—আসেনি ! আলেকজাণ্ডারের দিক্‌বিজয়ের পর গ্রীকরা অনেকদিন এমুখো হয়নি, সেলুকাস এসে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেছলেন ; ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীকরা প্রায় আড়াইশো বছর পাঞ্জাব অধিকার করে ছিল। তারপর এলো শকেরা—এরা হচ্ছে একটা নোমেডিক ট্রাইব—সব সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এদেশে প্রায় তিনশো বছর রাজত্ব করেছিল। শকেদের পর এলো পারথিয়ানরা ; এদের আদি বাসভূমি হচ্ছে কাস্পিয়ান-সীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কূল। কুশনরাও হচ্ছে যাযাবর ; তারা এলো চায়না থেকে। এতেও এর শেষ হলো না, এলো হুনেরা মধ্য এসিয়া থেকে। কয়েকশো বছর পার হয়ে গেল, আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে অধিকার করলে। গজনির সুলতানের কথা আপনাব মনে আছে ! পাঠানের পর মোগল। ইউরোপ থেকে পর্তুগীজরা এলো ; তারপর এলো ইংরেজ আর ফরাসী।

মিনিটখানেক পর একটা চাপা নিশ্বাস লইয়া পবিত্র অস্ফুটকণ্ঠে বলিল এতে করেই নেশন ফর্‌ম আজও হলো না। জীবন সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, নেশম ফর্‌ম হলো না মানে ? আপনি কি বলতে চান আমরা এখনও নেশন হইনি ?

ধীরে অথচ গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র জবাব দিল, যে কোন স্বাধীন দেশের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবেন সে দেশের লোকেরা কোন একটা পিওর রেসিয়াল টাইপের নয়। ইংরেজরা—অ্যাংলো স্যাক্‌সন ;—নরমান আক্রমণের পর স্যাক্‌সনরা নিজেদের পরাধীন জাত মনে করতো। এ ভাব কিন্তু বেশীদিন টিকে রইল না ;—নরম্যান আর স্যাক্‌সনে বিয়ে হতে লাগলো—ইংলিশ নেসন্ গড়ে উঠলো ;—

ইংলণ্ড হলো স্বাধীন। এরকম রক্তের সংমিশ্রণ ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে হলো না। রাজা-রাজড়ারা বিজিত জাতির মেয়ে হয় তো জোর করে বিয়ে করলে। সমাজ সেটাকে বড় একটা আমল দিলে না। একটা নতুন রেস্ হুড়মুড় করে এসে পড়াতে হট্টগোলের ভিতর কোন কোন জায়গায় কম বেশী করে বিজিত নারীর সতীত্ব হরণ করা হয়েছিল। তাদেব ছেলে-মেয়েরা একটা বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঐ অবধি, সমাজে তা চললো না; পাশাপাশি দুটো জাত বাস করতে লাগল, কোন দিন এক হতে পারলে না।

তারপর পবিত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এসব ভেবে মন এত খারাপ হয়, মনে হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস চির দিন পরাধীনতার ইতিহাসই থাকবে; এ দেশ কোন দিন স্বাধীন হতে পারবে না।

জীবনের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে তীব্র কণ্ঠে বলিল, এ কথা বলছেন কেন? এ আপনার—

—কেন বলব না? যে জাত বাইরে থেকে এসেছে, সে শুধু দেশ জয় করেনি, বিজিত জাতকে দাবিয়ে রেখেছে। বিজিত আর বিজেতা যদি এক হয়ে যেত তাহলে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বার বার করে এভাবে পরাধীন হতো না। ইংলণ্ড ততদিনই পবাধীন ছিল যতদিন না নর্ম্মান আর স্যাক্সন এক হয়ে গিয়েছিল।

জীবন ক্ষুব্ধভাবে বলিলা উঠিল, এ জন্যে কাস্ট্ সিষ্টেম দায়ী।

পবিত্র উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল, আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না—বেদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর এখনকার কাস্ট্ এক নয়। বর্ণ কি করে কাস্ট্ হলো, এখনও কেউ ভেবে ঠিক করতে পারেনি। সে যাই হউক, বর্ণ-সংস্কার যে বিভিন্ন জাতের রক্ত সংমিশ্রণ করে ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে এক করে একটা নেশন্ গড়তে

হয়নি এ কথা খুবই সত্যি। কিন্তু এজন্য বৈদিক আর্য্যদের দায়ী করা ঠিক হবে না; মাদ্রাজী সনাতনীদের গোড়ামী দেখে মনে হয়, বৈদিক আর্য্যগণ বর্ণাশ্রমের আদি প্রতিষ্ঠাতা নন, তাঁরা বরং এর কঠোরতাকে শিথিল করতে চেয়েছিলেন; পেরে উঠলেন না দেখে আর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করলেন যেটা পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি! কিন্তু হলে কি হবে, তাতে করে নেশন গড়ে ওঠে না।

—কি এক্সপেরিমেণ্ট তাঁরা করেছিলেন? জীবন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

[illegible] ও গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র বলিতে আরম্ভ করিল, বৈদিক আর্য্যগণ বি[illegible] আয়োজন করে প্রকাশ্য ভাবে জোর করে কোন লোক বা কোন জাতিকে নিজেদের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে কোনদিন বাধ্য করেননি। আমার মনে হয়, তাঁরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করা দরকার মনে করতেন না। খুব সম্ভব পূর্ব্বতন অধিবাসীদেব আচার ব্যবহার ধর্ম্ম সংস্কার দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজকালকার হিন্দুদের অনেক ধর্ম্ম সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি বেদে দেখতে পাওয়া যায় না। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও অনেক পুরান পুঁথি ঘেটে দেখিয়েছেন, বেদে শাক্ত অথবা বৈষ্ণববাদের কোন উল্লেখ নেই। আবার এও সত্যি, অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দু হয়ে গিয়েছে। তাদের বাহ্যিক আচার ব্যবহার অনেকটা বদলে গিয়ে বৈদিক আকার ধাবণ করেছে; তাদের বিশ্বাসও যে একেবারে বদলে যায়নি তা নয়, এই দুই বিভিন্ন পরোক্ষ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। একে নেশন্ বলে ভুল করলে আমাদের চলবে না। এর নানা শাখা প্রশাখা অসংলগ্ন থেকে নিজ নিজ গণ্ডীর ভেতরে বিবর্দ্ধিত হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি, চলছে। হয়তো কোনদিন শেষ হবে না।

পৈতে নিয়ে সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উঠবার যে একটা প্রবল চেষ্টা এখনও সব জাতের ভিতরে দেখছি এটা এই প্রতিক্রিয়ার একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। যে সত্যিকার শক্তির কথা গোড়াতে আপনাকে আমি বলছিলাম, এও তাই। একে উপেক্ষা করলে চলবে না। এ শক্তিকে উপেক্ষা করা মানে হচ্ছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা, হিন্দু সমাজকে উপেক্ষা করা।

পবিত্র হাসিয়া উঠিল, বলিল, আর কেন? এবারে অন্য কথা পাড়া যাক্। শুধু শুধু এ সব নিয়ে মাথা গরম করে কি হবে?

—তাও কি হয়! আপনি পরশু চলে যাবেন আর হয় তো কোনদিন দুজনের দেখা হবে না।

—না হবার কি আছে, কলকাতা গেলেই—

—বাজে কথা রাখুন। আচ্ছা মুসলমানরা বোধ হয় আমাদের আগে নেশন গড়ে তুলতে পারবে,—বেশ ইউনিটি রয়েছে।

—একতা রয়েছে বৈ কি,—কিন্তু যাক সে কথা—

—অ্যাভয়েড্ করছেন যে বড্ড—

—না ঠিক অ্যাভয়েড্ করছি না! ওদের আমরা এখনও ভাল করে জানিনে—দুদল পাশাপাশি রয়েছি—এদ্দিন কেউ কাউকে বুঝতে চেষ্টা করিনি। কথাটা যখন উঠেছে, না হয় দেখা যাক আইডীয়াটা ঠিক ক্লিয়ার হবে কি না। বলিয়া পবিত্র একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

জীবন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, বেশ তো বলুন না, আপনার কথা শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত পবিত্র কহিল, শুনবেন? শেষটায় রাগ করবেন না যেন। জীবন অভিমানের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কথা শুনে কোনদিন কি রাগ করেছি?

ইহার পর আর কোন ওজর আপত্তি চলে না। পবিত্র ধীর ভাবে

বলিতে লাগিল, ইসলাম কোন বাধা সহ্য করতে পারে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম ধ্বংস করে সকল লোককে মুসলমান করাই হচ্ছে ইসলামের প্রধানতম লক্ষ্য। এ দেশে এসে মুসলমানরা শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের বাইরেকার ভেদ-চিহ্নগুলো ধুয়ে মুছে দিয়ে একটা অখণ্ড মুসলমান সমাজ গড়ে তুললে। কিন্তু নেশন গড়তে পারলে না। হয়তো নেশন গড়ে তোলা ইসলামের মূল নীতি বিরুদ্ধ। মুসলমানেরা মহম্মদের জন্মস্থানকে নিজেদের দেশ বলে এখনও মনে করে। আজ কাল ইংরেজরা এদেশে বেশীদিন থাকে না। রিটায়ার করে বিলেতে ফিরে যায়, মুসলমান আমলে হয়তো তাদের সে ইচ্ছে ছিল—সুবিধে পায়নি ফিরে যাবার—চিরকাল এদেশে থেকেও মক্কা মদিনার স্বপ্ন দেখতো। আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে—হয়তো এরিষ্টো-ক্রেটিক আইডীয়া থেকে এটা হয়েছে—সেই সব মুসলমানের ভেতরে যারা আগে ছিল হিন্দু পরে হয়েছে মুসলমান—

জীবন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি করে হবে?

পবিত্র গম্ভীরভাবে জবাব দিল, বৈদিক আর্য্যগণ ভারত অধিকার করলে আদিম অধিবাসীরা বিজেতাদের অনুকরণ করে হয়ে গেল হিন্দু। নতুন ধর্ম্ম গ্রহণ করে এদেশের লোকেরা মুসলমান হলো বটে কিন্তু নিজেদের পরাধীনতা অস্বীকার করতে পারলে না। যারা রাজা তারা যে বিদেশী এখানকার মুসলমানরা তা ভুলতে পারেনি। ইসলামের বিশেষত্ব হচ্ছে, কোন মুসলমান তার জাতভাইকে নিকৃষ্ট ভাবতে পারে না। এ দেশের যে সব লোক মুসলমান হলো তারা নিজেদের মক্কাবাসী বলে মনে করতে লাগলো; দুদল মুসলমানের ভেতরে আর কোন তফাত থাকলো না। এরি ফলে ভারতবর্ষে জন্মেও মুসলমানেরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হয়ে রইল।

জীবন মৃদুস্বরে বলিল, আমার মনে হয়, এর আরও একটা বড় কারণ রয়েছে। পবিত্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলুন না সেটা কি? আমিই কি রোজ রোজ এক তরফা গেয়ে যাব?

জীবন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, মুসলমানদের মত আরও একদল লোক রয়েছে—ইহুদী; এদের দেশ বলে কিছু নেই!—সব দেশেই এরা পরবাসী—কিন্তু মজা এই সব ইহুদী এক, কোন তফাত নেই। যেমন ইহুদী নেশন নয়, মুসলমানও তেমনি;—এটা যেন সেমেটিক কালচারের দুর্ভাগ্য!

পবিত্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, ঠিক বলেছেন, এটা তাদের দুর্ভাগ্যই বটে! মুসলমানরা যদি এদেশকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে শেখে, নেশন হতে তাদের দুদিনও দেরী হবে না। রক্তের অবাধ সংমিশ্রণের ফলে মুসলমান সমাজের লোকদের ভেতরে বুদ্ধিবৃত্তি ও দৈহিক শক্তির বিশেষ তারতম্য নেই;—এডুকেশনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ এক হয়ে জেগে উঠবে, একসঙ্গে পা ফেলে হিন্দুর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জীবন সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ বিশ্বাস আপনার হলো?

—কেন হবে না? দেখুন্ না, একবার বাঙ্গালী হিন্দুদের দিকে তাকিয়ে; উঁচু জাতের লোকের বুদ্ধির সঙ্গে নীচু জাতের লোকেরা পেরে উঠছে না, আবার নীচু জাতের লোকের গায়ের জোরের সঙ্গে উঁচু জাতের দৈহিক শক্তির তুলনা হতে পারে না—নীচু জাতের লোকেরা গায়ে খাটতে পারে ঢের বেশী, সহ্য-শক্তিও ঢের। মুসলমানদের ভেতরে এরকম পাবেন না;—তাদের সকলের গায়েই জোর আছে, বুদ্ধিও কম বেশী করে প্রায় সকলেরই সমান। সেজন্যে

তারা বিশ্বাস করে,—লেখাপড়া শিখলেই উন্নতি করবে—হচ্ছেও তাই!' বাঙ্গালী হিন্দুকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়; একদলের মাথা আছে ধড় নেই, আর একদলের ধড় আছে মাথা নেই! একটু আগেই বলেছি নেগ্রিটোরা উত্তর-পূব দিক থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল—আর উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে এসেছিল অষ্ট্রালয়েড আর মুণ্ডারা। এদের সবার পর এসেছিল সেণ্ট্রাল এশিয়া থেকে আলপাইন্ এরিয়ান্স্। এক্সপার্টরা মনে করেন এরাই হচ্ছে আজকালকার বাঙ্গালী হিন্দুদের ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য উঁচু জাতের হিন্দু—সবশাখ নিয়ে সবাই আলপাইন আর্য্য, এটাই হচ্ছে আজকালকার মত। ডক্টর ভাণ্ডারকর বলছেন, এরা সবাই গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদের মত আলপাইন এরিয়ানদের বংশধর।

জীবন উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তাই বলুন! আমি ভেবেই পাইনে কেন গুজরাটীদের সঙ্গে আমাদের চেহারার এত মিল রয়েছে! গুজরাটী মেয়েরা—ঠিক বাঙ্গালী মেয়েদের মত দেখতে,—একই ধরণে কাপড় পড়ে, ঘোম্টা দেয়—কপালে সিন্দুর না দিয়ে চন্দনের টিপ পরে, আল্তা দেয় না, মেহেদী দিয়ে রং করে!—যেমন মেয়ে তেমনি বেটাছেলে!

পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, শুধু কি এতেই শেষ হলো? বাঙ্গালী জীবহিংসা করতে চায় না, গুজরাটীরাও বৈষ্ণব! গুজরাটীদের মিলিটারী প্রাওয়েস্এর কথা কোনদিন শুনিনি, বাঙ্গালী উঁচু জাতের লোকদের গায়ের জোরও তেমনি!

জীবন সন্দিগ্ধভাবে কহিল, গুজরাটীদের কিন্তু খুব টন্‌টনে ব্যবসা-বুদ্ধি রয়েছে!—কি রকম বড়লোক তারা, কত বড় বড় কারবার করছে—আমেদাবাদে কতগুলো বড় বড় কাপড়ের কল খুলেছে।

তাহার কথা শেষ না হইতেই পবিত্র বলিয়া উঠিল, তিলি আর সোনার বেনেদের ব্যবসাবুদ্ধি বড় কম নয়! তারাও ঢের বড় বড় কারবার করেছে; এখন অবিশ্যি হাত গুটিয়ে বসে জমিদারী করছে—সেদিন বলিছি। যাক্ এ সব কথা; যা বলছিলাম—বাঙ্গালী হিন্দুদের এক দলের মাথা রয়েছে আর এক দলের নেই; একদলের ধড় নেই আর একদলের রয়েছে! শুধু বাঙ্গালা কেন অন্যান্য প্রভিন্সের হিন্দুদেরও এই একই অবস্থা।

তারপর সে উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, কংগ্রেস কি এসব কথা ভেবে দেখেছে? একটা দল—যারা নেশন হতে পারতো, এদেশকে নিজেদের দেশ না মনে করে তারা নেশন গড়তে পারলে না, আর একটা দলকে নেশন হতে গেলে হাজার বছর কেটে যাবে! নেশন নেই—ন্যাশনালিজম্—সোনার পাথর বাটি! এরকম ন্যাশনালিজম্এর কোন কোহিসিভ্ ফোরস্ থাকতে পারে না,—থাকবে কোত্থেকে! আপনাদের পলিটিকস্এর সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ নেই। যদ্দিন ইংরেজদের যা খুশী বলে গাল দিতে পারবে তদ্দিনই এই ফল্স্ ন্যাশনালিজম্ টিকে থাকবে। আইন দিয়ে টুঁটি চেপে ধরলে এর আর কোন শক্তি থাকবে না। এ যে আমাদের ধারকরা ন্যাশনালিজম্, বিলেত থেকে খাস আমদানী! যেখানে নেশন নেই সে দেশে সত্যিকার ন্যাশনালিজম্ থাকতে পারে না।

জীবন ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে সত্যিকার ভারতবর্ষের স্বরূপ—

—সত্যিকার ভারতবর্ষের স্বরূপ—শুনুন তাহলে। সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুগে যুগে নতুন নতুন ভাবধারার অভ্যুদয় হয়েছে; মধ্যযুগে পুরোহিতের আভিজাত্য লুপ্ত হয়ে ধর্ম্মবিচ্যুত

রাজনীতি অবাধ গতিতে সেদেশে নিজের অধিকার বিস্তার করতে সুরু করেছে ; ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়ে দেশাত্মবোধের সূত্রপাত হয়েছে ; বিগত মহাসমরেব অবসানে রুশিয়া সর্ব্বহারাদের সার্ব্বজনীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবার জন্যে বিরাট আয়োজন করছে ; ভারতবর্ষ বারবার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মুসলমান আক্রমণ প্রীতির চক্ষে না দেখলেও বিশেষ বিচলিত হয়নি, নতুন ধর্ম্ম বলে বলীয়ান মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের চেষ্টা করেছিল মাত্র,—অর্থ ও সমাজনীতির দিক দিয়ে ভারতের কোটী কোটী নরনারীর অবাধ শান্তি নষ্ট করতে পারেনি ; ইউরোপীয় নাবিক জলপথে পণ্যদ্রব্যের সহিত নতুন নতুন ভাবধারা ভারতে নিয়ে এলো, অর্থের বিনিময়ে সে দ্রব্যসম্ভার কিনে ভারতবাসী নতুন সাজে সজ্জিত হলো,—সিভিলিজেশনের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভারতবর্ষ বিরাজ করতে লাগলো !

—থামলেন যে, আপনার কথা শেষ করুন—

—খৃষ্টধর্ম্মের আক্রমণে ইসলাম বিচলিত হলো না,—প্যালেষ্টাইনের উন্মুক্ত প্রান্তরে উভয় পক্ষে বল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিলো ; হিন্দু সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো—চারিদিক থেকে প্রতিক্রিয়া সুরু হলো—ভারতের পূর্ব্ব-উত্তর সীমান্তে রাজা রামমোহন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অভ্যুদয় হলো ; ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের সূচনা হলো—আসমুদ্র হিমাচল ও আব্রহ্ম সিন্ধু প্রকম্পিত করতে পারলে না—বিরাট ভারতবর্ষ অতি বৃদ্ধের মত স্তিমিতনেত্রে চিরাচরিত পথে .ধীর ও মন্থর গতিতে চলতে লাগলো, যেন কোথাও কিছু হয়নি !

—তার পর—

—ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম ও সমাজ চর্চ্চায় সন্তুষ্ট থাকতে

পারলে না, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতরে গভীর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলো, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো—

জীবন বাধা দিয়া বলিল, সিপাই মিউটিনীর কথা বললেন না—

—মিউটিনী যত বড় বিরাট ব্যাপারই হোক না কেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা একটা সাময়িক ঘটনামাত্র; ইংরেজদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করলেও দেশের লোকের মনে কোন দাগ দিতে পারেনি।

তারপর সে আবার বলিতে লাগিল, মুসলমান সমাজ ভাল করে কংগ্রেসে যোগ দিলে না; এব কারণ মুসলমান রাজত্বের অবসান হলেও ইউরোপীয় সভ্যতা মুসলমান সমাজকে বিশেষ করে আক্রমণ করেনি; হিন্দু মারাঠা মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, মুসলমান সমাজ তখনও সে ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। দেশের আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে সমাজ ও গোষ্ঠীর আর্থিক দুর্গতির ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে; মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দুর আথিক উন্নতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দেখে মুসলমান সমাজ জেগে উঠলো,—তাদের আক্রোশ হলো হিন্দুসমাজের উপরে—যেন হিন্দুই মুসলমানদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে! ভারতের যে সব নরনারী দেশ, জাতি, ধর্ম্ম ও লিঙ্গ নির্ব্বিশেষে জগতের সকল নরনারীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার কামনা করে তারা রুশিয়ার বর্ত্তমান প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবার জন্যে উন্মুখ হলো; হাজার বছরে ইউরোপ যে সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছে, নতুন ভারত অল্প কয়েকদিনের ভেতরে ইউরোপের নতুন নতুন ভাবধারা গ্রহণ করে নতুন সাজে সজ্জিত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

বিক্ষোভ পর্ব্ব

যোগাযোগ

১

৬ই এপ্রিল ১৯৩১—

বিলটা কি তৈয়েরী হয়েছে ?

সুমিষ্ট নারী-কণ্ঠস্বর !

মুখ উঁচু করিয়া পবিত্র অবাক হইল !

—আপনি ! বসুন—

—আপনার কি—না হয় আমি একটু ঘুরে আসচি—

—না না ; এক্ষুনি করে দিচ্ছি—দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? বসুন না চেয়ারটাতে—এবার বলুন কি জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন। পবিত্র সলজ্জ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তরুণী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বিলটা—আমার বিলটা পাস হয়েছে কি ?

পবিত্র অপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিল, বিল !—সে তো কালেক্শন ডিপার্টমেণ্টে—দুটো ঘর পেরিয়ে ডান দিকে ! এর জন্যে আপনি আফিসে এলেন যে—বাড়ীতে বসেই পেতেন—রুলও বোধ হয়—

তরুণী মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, এ সে বিল নয়—এ আফিসেরই হাউস্ এলাওন্সের বিল !

পবিত্র তাড়াতাড়ি ফাইল ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল, কি যেন সে মনে করিতে চেষ্টা করিল। একটু পরে বিল বাহির করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, আপনিই মিস্ গুপ্ত ! আমি মনে করেছিলুম আর কেউ !

তরুণী কোন কথা বলিল না, বিক্ষুব্ধ চিত্তে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

বিলখানা ভাল করিয়া পড়িয়া, এ খাতা ও বই নাড়াচাড়া করিয়া পবিত্র তাহাকে জানাইল, এডুকেশন্ অফিসারের দস্তখত হয় নাই, তাঁহার আফিসে আসিবার বিলম্ব আছে—সেদিন চেক্ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

তরুণী চেয়ার হইতে উঠিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কালকে একবার—

পবিত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আজ্ঞে হাঁ। কাইগুলি কাল একবার আসবেন, না এলেও আপনার এড্রেসটা—আমি না হয় ডাকে পাঠিয়ে দেব এখন—

তরুণী এবার আর হাসি চাপিতে পারিল না, কহিল, বিলখানা যে আমায় সই করে নিতে হবে—

পবিত্র অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া ফেলিল, সবে হপ্তাখানেক হল জয়েন করেছি—এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি—

তরুণী মনে মনে একটু হাসিল, এক পা দু পা আগাইয়া একটু থামিল, পবিত্রের দিকে মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু স্বরে বলিল, আমারও সবে মাসখানেক হলো—আফিস ঘরে ঢুকবো কি ঢুকবো না ভাবছিলুম—আপনাকে দেখে একটু সাহস হলো; নমস্কার—

সহসা তরুণী ঘুরিয়া তাহাকে অভিবাদন করাতে পবিত্র হতভম্বের ন্যায় দুই হাত মাথায় ঠেকাইল, তাহার পর সে সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলতে পারেন—অমল ফিরে এসেছে কি? ডক্টর মৌলিকের ওখানে এর ভেতরে একবার—

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, আমি তো সেখানেই উঠেছি—

হাউস এলাওন্সের টাকা কটা পেলে অন্য কোথাও উঠে যাব—অমলদার কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন ?—এখনও ফেরেননি, কবে ফিরবেন ঠিক নেই। বলিতে বলিতে সে এক পা দু পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাব অনেকটা—পবিত্রের কথার অপেক্ষা করিতেছে।

—ডক্টর আর মিসেস্ মৌলিক ভাল আছেন? তাঁদের আমার নমস্কার জানাবেন; অমলের ছোট বোন—

—চিত্রা! ভাল আছে—

—সেবার মিস মৌলিককে দেখলুম না—তাঁর কি বিয়ে হয়েছে? লতিকার, দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল; তীব্রস্বরে বলিল, বিয়ে? কী করে বিয়ে হবে—আপনার বন্ধুটি, নামটা মনে হচ্ছে না—তিনিই করলেন না—বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে—সে পুরুলিয়া ইস্কুলে মাষ্টারী কচ্ছে।

থতমত ভাবে পবিত্র বলিয়া উঠিল, নিরঞ্জনের এতে কোন দোষ নেই।

নির্ম্মম ভাবে লতিকা উত্তর দিল, কোন দোষ নেই! বেটা ছেলের সাত খুন মাপ!

—নিরঞ্জন কোন দিন ভালবাসেনি; মিস্ মৌলিক বড্ড একটা ভুল করেছিলেন—আপনি—

—কোন ভুল করিনি আমি, শিশির বিয়ে করেছে—

লতিকা হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পবিত্র আসিয়া চেয়ারে বসিল। সে বুঝিতে পারিল না, লতিকা কেন মেয়ে ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়াছে।

২

পনর দিন পর।

—পবিত্রবাবু যে! নমস্কার! ভিতরে এসে বসুন; বলিয়া নিরুপমা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। লতিকা সেখানে ছিল; সেও বারান্দায় আসিয়া পবিত্রকে নমস্কার করিল।

—লতিকার কাছ থেকে শুনেছি—আপনি হচ্ছেন ওঁর ওপরওয়ালা, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডুকেশন অফিসার।

চেয়ারে উপবেশন করিয়া পবিত্র সলজ্জ ভাবে জবাব দিল, সবাই বলে বটে—ওরকম কোন পোষ্ট করপোরেশনে নেই—

—না থাকলে কি হোলো—কথাটাতো আর মিথ্যে নয়; খুব খুসী হয়েছি, শুনে। সেদিন হঠাৎ যে কাণ্ডটা হয়ে গেল! ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে! আপনাকে কত করে বল্লুম, এখানে থাকতে আপনি শুনলেন না—তক্ষুনি চলে গেলেন! উনি তো একেবারে মুসড়ে গিয়েছিলেন। ও কথা বলবার ওর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, আপনিও ছাড়বেন না শেষটায় বলতে হলো! বিকেলে নিরঞ্জনবাবুকে ফোন করে জানলুম—আপনি বাড়ী গেছেন!

লতিকা কোন কথা বুঝিতে পারিল না, বার বার দুই জনের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। এমন সময় অবিনাশবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পবিত্র তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সসব্যস্তে বলিলেন, ভাল ছিলে? আমায় একটু বের হতে হচ্ছে—ঘণ্টাখানেকের ভেতরে ফিরে আসবো, তুমি একটু বসো—ইহা বলিয়া অবিনাশবাবু ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বয়কে চা আনিতে আদেশ দিয়া নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, এদ্দিন দেখিনি যে? চাকরী তো সে দিন পেয়েছেন শুনলুম;—বাড়ী ছিলেন? বাবা মা ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আপনাকে যেন একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে?

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, ওটা আপনার চোখের ভুল; আমি বরাবর ভাল আছি—কোন অসুখ আমার শিগগির হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

লতিকা উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া নিরুপমা বলিল, তুমি আবার উঠে যাচ্ছ যে? চা খেয়ে যেও;—পবিত্রবাবু তোমার সুপিরিয়র অফিসর—ওঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নাও—কখন কি হয় বলা যায় না। করপোরেশনের যে সব ব্যাপার ট্যাপার শুনছি, নতুন চাকরীতে ঢুকেছে—

—ওঁর চাইতে আমি আরও নতুন—

—কমাস হোলো?

—মাস নয়—দিন! এখনও মাস পুরোয় নি—পঁচিশ দিন!

—এতদিন কী কচ্ছিলেন? কোথা ছিলেন?

—শুনে আপনার কাজ নেই—

—না; আপনাকে বলতেই হবে—

—দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, জেলে গিয়েছিলুম!

নিরুপমা ও লতিকা অবাক হইল; হতভম্বের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পবিত্র মাথা নীচু করিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল।

চা আসিল।

ট্রে হইতে পেয়ালা আগাইয়া দিয়া নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, জেলে গিয়ে কেমন ছিলেন? খুব কষ্ট হয়েছিল?—না?

—না, কষ্ট মোটেই হয় নি—ভালই ছিলুম, বাইরে আসবার সময় কান্না পাচ্ছিল—এসে কি করবো ভেবে—

—লতির কিন্তু খুবই কষ্ট হয়েছিল।

—ওঁরও জেল হয়েছিল নাকি?—এ কথাতো উনি আমায় বলেন নি।

লতিকার মুখে কে যেন আবীর মাখাইয়া দিল। সেখানে তাহার আর বসিয়া থাকা অসম্ভব; কি জন্য পবিত্রের জেল হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু স্বস্তি বোধ করিল না।

বিরক্তির সহিত নিরুপমা বলিয়া উঠিল, বলবার কি আর মুখ রেখেছে! শিশিরবাবু বিয়ে করলেন না—বাপ মা তাকে আর একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন! তিন দিন উনি মন গুমরে এখানে পড়ে রইলেন! ঠাকুরজী একটা চাকরি ঠিক করে চিঠি লিখলে; ভোর বেলা উঠে দেখি ওর পাত্তা নেই। খোঁজ! খোঁজ! পুলিশে খবর দেওয়া হোলো—কোথাও আর পাওয়া গেল না! এ কদিন যে আমাদের কী ভাবে কেটেছে—ভগবানই জানেন! কদিন পর খবরের কাগজে বের হলো—ওঁর জেল হয়েছে—ডায়মণ্ডহারবারে! কোথায় কলকাতা আর কোথায় ডায়মণ্ডহারবার! জন্মে সেখানে যায় নি! কদিন হলো জেল থেকে বের হয়েছে।

পবিত্র স্তম্ভিত হইল।

নিরুপমা বলিতে লাগিল, আজকালকার মেয়েদের বুঝে ওঠা দায় হয়েছে। কখন যে কী করে বসে ঠিক নেই। যখন যা মনে আসবে

তক্ষুনি হুট করে করে বসবে ; এ চাকরিই যে ও কদ্দিন করবে তারই বা ঠিক কি !

লজ্জায় ক্ষোভে লতিকার মুখ কালো হইয়া উঠিল, নিরুপমা লক্ষ্য করিল না। তার পর সে শান্ত কণ্ঠে পবিত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কেন জেল হলো—কি করেছিলেন আপনি ?

এক এক করিয়া পবিত্র সমস্ত কথা জানাইল। লতিকা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ফের জেলে যাবেন ? আবার তো মুভমেণ্ট সুরু হয়েছে। পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, কি করে বলবো—

নিরুপমা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ খেয়াল আর তোমরা করো না ; ঢের হয়েছে ! দেখুন, আর কেন ? চিরকাল কারও এক ভাবে যায় না ; চাকরি কচ্ছেন—শদেড়েক টাকা মাইনে পাচ্ছেন—আবার বে-থা করুন।

—বিয়ে করে কি হবে ?

—বিয়ে করলে, এ সব খেয়াল আর আপনার থাকবে না। দেখেছেন নিরঞ্জনবাবুকে ! থার্ড ইয়ারে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে করে ছেলে মেয়ে হয়েছে, এ সব খেয়াল আর নেই। এত বড় একটা মুভ-মেণ্ট হচ্ছে—চাকরি ছেড়ে দিয়ে জেলে যেতে পেরেছেন কি ? ইচ্ছে থাকলেও পারা যায় না।

পবিত্র মৃদুস্বরে কহিল, আপনার কথা সত্যি, নিরঞ্জনের খুবই ইচ্ছে হয়েছিল জেলে যাবার। এরকম ইচ্ছে অনেকেরই হয়ে থাকে—কিন্তু পেরে ওঠে না। তাবলে বিয়ে আমি করতে পারব না।

তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, কেন পারবেন না ? জেলে যাবার সখ কি এখনও মেটেনি ?

পবিত্র গম্ভীরভাবে জবাব দিল, এ রকম সখ আমার কোনদিন ছিল না; এখনও নেই।

—তাহলে বিয়ে করবেন না কেন?

—সে কথা শুনে আপনার লাভ কি?

—লোকসানও নেই, শুনতে ইচ্ছে কচ্ছে—তাই জিজ্ঞেস কর্চ্ছিলুম—

—ভালবাসতে আমি আর পারব না!

—ওঃ! এই কথা!—শ্লেষের সহিত নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সমাজে কি কেউ ভালবেসে বিয়ে করে? নিরঞ্জনবাবু করেছিলেন?

—না, তা নয়; বিয়ে করে সবাই ভালবাসতে চেষ্টা করে—চেষ্টা ঠিক একে বলা চলে না—অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সবার কপাল সমান নয়—সুখ হয় না—দুজনের মনের মিল হয়—সেজন্যে বলতে হচ্ছে—চেষ্টা করে ভালবাসতে—

—আর যারা স্ত্রী মরে গেলে ফের বিয়ে করে?

—তাদেরও ঐ একই অবস্থা!

—তাহলে আপনি আবার বিয়ে করবেন না কেন? একবার তো এ রিস্ক নিয়েছিলেন—না হয় ফের নিলেন! জেলে যাওয়াও তো একটা রিস্ক নেওয়া—মানুষ সব সময় সব কাজে রিস্ক নিচ্ছে—চুপ করে কেউ আর বসে নেই!

পবিত্র গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, নিচ্ছে বই কি;—কিন্তু এ রিস্ক আমার জন্যে নয়;—আমি জানি—আমি জানি—আমি আর কোন মেয়েকে কোনদিন ভালবাসতে পারব না;—যে আমায় বিয়ে করবে—সেই বা এ রিস্ক নেবে কেন? চাইলেও এ রিস্ক নিতে আমি তাকে

দিতে পারি না! আমি যে প্রাণহীন পাষাণ—এ কথাতো সে জানবে না! জানলে কি আমায় বিয়ে করতে চাইবে?

তাহার অর্থহীন প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া নিরুপমা ও লতিকা তাহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

একটা চাপা নিশ্বাস লইয়া পবিত্র আবার বলিল, বিয়ে একটা বন্ধন! এ বন্ধনেও মুক্তির আনন্দ রয়েছে যদি ভালবাসতে পারে! ভালবাসতে পারব না—ভালবাসার অভিনয় করবো—এ একেবারে অসহ্য!

তাহার কথা শুনিয়া উভয়ে স্তম্ভিত হইল!

নিরুপমা সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েদের কি আপনার আর ভাল লাগে না?

পবিত্র একটু ম্লান হাসিল; জবাব দিল, মেয়েদের আমার ভাল লাগে—সব মেয়েকেই ভাল লাগে;—ভালবাসা আর ভাল লাগা কি এক?

নিরুপমা আবেগের সহিত বলিল, আপনাব কি ইচ্ছে করে না—কোন মেয়ে এসে আপনার ঘর গুছিয়ে দিক—খিদে পেলে সামনে বসে আপনাকে খাওয়াক—রবিবাবুর দু একখানা গান গেয়ে আপনাকে শোনাক—আপনার পাশে বসে গল্প করুক—এমন সব গল্প যার কোন মানে হয় না—শুধু কথা বলে যাবে—আর আর—এরকম আরও অনেক কিছু—

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, আপনার জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা কচ্ছে? লজ্জা করবার এতে কিছু নেই—মনে করুন আমরা দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা কর্চ্ছি—ব্যক্তিগত কোন কথা বলছি না। তারপর সে গম্ভীরভাবে বলিল, এ সবই আমার ভাল লাগে—পেতে ইচ্ছে করে! শুধু একটুকু পেয়েও আমি খুসী হতে পারব না; আমার ইচ্ছে করে—

সে আমায় (আদর করবে, চুমো খাবে—আমায় একেবারে পাগল করে দেবে—সবই আমার পেতে ইচ্ছে করে !) এ সবই আমি তাকে দেব—অটুট স্বাস্থ্য, সবল দেহ—সব দেব—সে শক্তি আর ক্ষমতা আমার রয়েছে ! মনও হয়তো তাকে দেব ;—কিন্তু এতে করেই কি সব দেওয়া সব পাওয়া হয়ে গেল ? দেবার আমার সবচেয়ে বড় জিনিষটাই প্রতিমা লুটেপুটে নিয়েচে—আর কারও জন্যে রেখে যায়নি ! এ মেয়ে আমার কাছ থেকে আর যা চাইবে সব পাবে—পাবে না আমার প্রাণ—যার সংস্পর্শে তার চোখে মুখে আলো ঠিকরে বের হতো—হাসি ঝরে পড়তো—এসব তো আমি তাকে দিতে পারবো না ! শুধু দেহ নিয়ে সে খুসী হতে পারবে না, শেষটায় একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে যে—মরিয়া হয়ে যাবে—ক্ষ্যাপার মত আমার বুকে মাথা ঠুকে মরলেও তা থেকে এক ফোঁটা রস বের হবে না ! এতে করে দুজনার যে কী সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, ভেবে আমি শিউরে উঠি !

অস্ফুট কণ্ঠে নিরুপমা বলিল, তাহলে ভারি মুস্কিল দেখছি ! পবিত্র একটু ম্লান হাসিল ; কহিল, মুস্কিল এতে কিছুই নেই ;—এসব জেনে শুনে কোন মেয়ে আমার ঘর করতে এলে, আমি তাকে মানা করবো না !—তাই বলে বিয়ে আমি তাকে করতে পারবো না—

নিরুপমা আহত হইল ; ক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে করবেন না কেন ?

অধীরভাবে পবিত্র উত্তর দিল, বিয়ে আমি তাকে কি করে করবো ? খেয়ালের মাথায় যে আমার ঘর করতে আসবে, দুদিন বাদে সে যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে ! সে ছুটে যেতে চাইলে, আমি তাকে বাধা দেব না ! কিন্তু সমাজ ? আইন ? এরাতো তাকে ছেড়ে দেবে না ;

বলবে, বিয়ে করেছিলে কেন—যতদিন বাঁচবে এ সাজা তোমায় ভোগ করতেই হবে!

—না হয় হিন্দু মতে বিয়ে নাই করলেন; সিভিল ম্যারেজ তো রয়েছে?

—এ পিঠ আর ও পিঠ—তুইই এক! দুজনের মনের মিল হয়নি—কেউ কাউকে ভালবাসতে পাচ্ছে না—এতে করে ডিভোর্স—এক রাশিয়াতে আছে!

গভীর সহানুভূতির সহিত নিরুপমা কহিল, আপনার খুবই কষ্ট দেখছি! পবিত্র একটু ম্লান হাসিল; জবাব দিল, কষ্ট! কিছু না;—আর হলেই বা কি কচ্ছি বলুন? ভাল না বেসে বিয়ে করা চলে—হয়তো কোনদিন ভালবাসা গজিয়ে উঠবে! বিয়ে না করে—ভাল না বেসে—কোন মেয়ে কি বেটাছেলের ঘর করতে পারে? পারে না। সেজন্যে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছি—শুধু পড়ছি আব ভাবছি।

সে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল;—ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র! নিরুপমা শিহরিয়া উঠিল; লতিকার মনেব গভীরতম দেশে কি যেন একটা মৃদু আলোড়ন;—সুখের কি দুঃখের—সে বুঝিতে পারিল না!

৩

আরও দশদিন পর।

সকালে চা খাওয়ার পর লতিকা তাহার সাড়ী ও জামা কখানা সুটকেসে গুছাইয়া রাখিতেছিল। নিরুপমা নিঃশব্দে পা টিপিয়া সেই

ঘরে প্রবেশ করিল। লতিকা ঘাড় ফিরাইতেই দুইজনের চোখোচোখি হইলে নিরুপমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—আজ ধরে ফেলেছি! এত সকালে স্যুট্‌কেস গুছিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

লতিকা একটু থতমত খাইল; ঠোঁটের কোণে হাসি টানিয়া আনিয়া অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, কোথায় আর যাচ্ছি!—বাইরে ছিল গুছিয়ে রেখে দিলুম।

নিরুপমার চোখে মুখে অবিশ্বাসের হাসি! বলিল, তাহলে আমায় না বলে এত চুপি চুপি ঘরে ঢুকলে যে? কোথায় যাচ্ছ;—বহরমপুর?

লতিকা অবাক হইল; চোখ বড় করিয়া কহিল, বহরমপুর! —সেখানে যাব কেন? তারপর সে মনে মনে বলিল, সেখানে ফিরে যাবার কি আর মুখ রেখেছি!

নিরুপমা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে চাচ্ছ আমায় বলবে না? লতিকা বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, কাজে বের হতে হবে না আজ? ফিরতে দেরী হয়ে যাবে যে, আগে থেকে গুছিয়ে রাখছি।

নিরুপমার গভীর সন্দেহ হইল, হয়তো লতিকা তাহার নিকট সকল কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; লতিকার খাটের উপর গম্ভীরভাবে বসিল। ইহা দেখিয়া লতিকা নিরুপায় হইয়া ভাবিল, সে আর তাহার চোখ এড়াইতে পারিবে না। গোছান শেষ হইলে সে তাহার পাশে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সত্যি বৌদি আজ আমি চলে যাচ্ছি, এখান থেকে।

নিরুপমা কঠিন স্বরে বলিল, তোমায় সে কথা আর বলতে হবে না; কোথায় যাচ্ছ—আমায় জানাবার দরকারও মনে করনি!

লতিকা আহত হইয়া জবাব দিল, তোমায় বলবো না বৌদি! তা হলে আর কাকে বলবো? তারপর সে আদরের স্বরে বলিল, বল্লে যে তুমি আমায় যেতে দেবে না;—তোমায় ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে কচ্ছে না—এখানেও আর থাকা চলে না।

বলিতে বলিতে লতিকার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল।

ক্ষুব্ধভাবে নিরুপমা কহিল, তাহলে যেতে চাইছ কেন? এখানে কি তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে?

—অসুবিধে! মর্ম্মাহতের ন্যায় লতিকা বলিয়া উঠিল, এরকম বুকে করে কে আর আমায় রেখেছে! আমায় তুমি মানা করো না বৌদি—রাখতে পারবে না! যেতে না পারলে আমার খুব কষ্ট হবে;—মনকে কত করে বোঝাচ্ছি—যাওয়া আমার ঠিক হবে না—কিছুতেই বাগ মানাতে পাচ্ছিনে! বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

কয়েক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া নিরুপমা শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, ইচ্ছে না থাকলে তোমায় ধরে রাখতে আমি চাইনে; সে অধিকারও আমার নেই, থাকলেও আমি তোমায় মানা করতুম না! যাচ্ছ কোথায়? বোর্ডিংএ? তোমাদেরও কি বোর্ডিং রয়েছে?

লতিকার মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিল; অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিল, না।

—তাহলে কোথায় গিয়ে উঠবে?

—পার্ক সার্কাসে ছোট্ট একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়েছি; এখান থেকে—

—আর কে কে থাকবেন,—তারা কি সব—

—কে কে নয়;—আমি আর একজন—

—কে তিনি;—কি নাম? এর আগে কোথায় থাকতেন? ঘাড় হেঁট করিয়া লতিকা ক্ষীণ স্বরে জানাইল, তাহার সহবাসী, পবিত্র।

নিরুপমা বজ্রাহত হইল ; চোখে তার অপলক দৃষ্টি ! মিনিটখানেক পর সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, পবিত্রবাবু ! পেটে পেটে তার এই বিদ্যে ! তুমিও তাতে সায় দিয়েচ !

আহত হইয়া লতিকা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, কেন তুমি তাঁকে দুষছো বৌদি ? তাঁর এতে কোন হাত নেই ;—আমিই গিয়ে তাঁকে বলে কয়ে রাজী করিয়েছি !

তাহার কথা বিশ্বাস করিতে নিরুপমার ইচ্ছা হইল না। সে শ্লেষের সহিত বলিয়া ফেলিল, এরই ভেতরে এতটা !—দোষ ঢাকতে চাইলে চলবে কেন ? আমি তার কথা শুনিনি ? এখন বুঝতে পাচ্ছি এত কথা কেন বললে সেদিন ! ওদের দুজনকে এ বাড়ীর দরজা পেবতে দেওয়া ভারি অন্যায় হয়েছে ! আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করচে ;—ঠাকুরপো কেন ওদের দুজনকে আনলে !

বলিতে বলিতে নিরুপমা উত্তেজনায় কাঁদিয়া ফেলিল।

ধীর অথচ শান্ত কণ্ঠে লতিকা বলিল, তুমি কেন এত উতলা হচ্ছ বৌদি ! ওদের দুজনার কোন দোষ নেই ; নিরঞ্জনবাবুকে আমরা ভুল বুঝেছিলুম—চিত্রাকে কোন দিন তিনি ভালবাসেননি—চিত্রা জানে ! পবিত্রবাবুও আমায় ভালবাসেন না ; কোনদিন বাসবেন কিনা জানি না। ওপন্ অফার তিনি সব মেয়েকে দিয়েছেন, আমিই স্ুধু একসেপ্ট্ করেছি। এতে করে তাঁর ইন্‌সিন্‌সিয়ারিটি তুমি কি দেখলে ?

বলিতে বলিতে লতিকা আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে হতভম্বের মত চাহিয়া থাকিয়া নিরুপমা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিতে লাগিল, ওপন্ অফার ! একসেপ্ট্ ! ইন্-সিন্‌সিয়ারিটি !—

লতিকা উত্তেজিত ভাবে তীব্র স্বরে বলিল, মনে নেই তোমার ?

পবিত্রবাবু বলেছিলেন—মেয়েদের সব দিতে পারেন—দেবার শক্তি তাঁর রয়েছে! সব পাবে—পাবে না শুধু তাঁর হৃদয়—তাঁর প্রাণ!

নিরুপমা যন্ত্রচালিতের ন্যায় বলিল, মনে আছে তিনি বলেছিলেন, নেবার মত মেয়ে নেই বাঙলায়—

লতিকা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, এ চ্যালেঞ্জ আমি একসেপ্‌ট্‌ করেছি!

নিরুপমার বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল; সে মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করিল, কেন একসেপ্‌ট্‌ করলে তুমি?

তীব্রকণ্ঠে লতিকা জবাব দিল, কেন করবো না বৌদি! আমারও তো ওঁর মত প্রাণ নেই—দেহ রয়েছে—ওঁরই মত আর সব পেতে ইচ্ছে করে!

জবাব শুনিয়া নিরুপমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল; কোন প্রকারে নিজকে সামলাইয়া লইয়া, সে সশঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এতে কত বড় রিস্‌ক্‌—

লতিকা বাধা দিয়া কহিল, মেয়েছেলের এর চেয়ে বড় রিস্‌ক্‌—সর্ব্বনাশ—আর নেই, আমি জানি! অনেক চেষ্টা করেছি বৌদি, মনকে আমি কিছুতেই বাগ মানাতে পাচ্ছি না; আমাকে আজ যেতেই হবে! রিস্‌ক্‌ একে বলবো কি করে; এটা হচ্ছে সার্টেনটি! জানি আমি কত দুঃখ কত লাঞ্ছনা আমায় সহ্য করতে হবে। কলেজে পড়বার সময় চোখ বুজে রিস্‌ক্‌ নিয়েছিলুম—একটুও তো বাধেনি; এবারে পা বাড়িয়েছি একেবারে চোখ খুলে! আমায় তুমি ধরে রেখ না বৌদি—তোমার কথা রাখতে পারবো না—সে যে কত—

নিরুপমা মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তোমাদের দুজনের বিয়ে হবে না?

লতিকা সগর্ব্বে উত্তর করিল, না! বিয়ে একেবারে অসম্ভব।

সঙ্কট

১

পৃথিবী-ব্যাপী ধন-সঙ্কট ; হঠাৎ কোথা হইতে কি হইল, কেহ বুঝিতে পারিল না।

যুদ্ধের সময় জগতের লোকেব কষ্ট হইলেও এবকম দারিদ্র্য ছিল না। পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই অনুপাতে সকলের আয়ও বাড়িয়াছিল। মহা সমরের অবসানে মনুষ্য-সমাজ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। চারিদিকে আশার সঞ্চাব হইল ;—মানুষ ভাবিল, শুভ দিন আবার আসিয়াছে। সকল প্রকাব জিনিষেব চাহিদা বাড়িল, মূল্য বৃদ্ধি পাইল, নূতন কলকাবখানা সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। যে সকল কারখানায় মারণ-যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল, যুদ্ধের অবসানে সেগুলি নব সাজে সজ্জিত হইয়া জগতে কোটি কোটি নবনাবীব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অবারিত ধারায় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত কবিয়া পৃথিবীব বাজার ছাইয়া ফেলিল।

বৎসর না ঘুরিতে সামাল সামাল রব উঠিল। স্তূপীকৃত মাল পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। অভাব তখনও মানুষের পূর্ণ হয় নাই। জিনিষও প্রচুর, কিনিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সকল দেশে সকল লোকের ভিতরে ভয়ানক দারিদ্র্য দেখা দিল। মানুষ বুঝিতে পারিল না কোথা হইতে কি হইল। এই ভাবে আরও পাঁচ বৎসর কাটিল।

দারিদ্র্য-রাক্ষসীর সহিত পাঁচ বৎসর লড়াই করিয়া পৃথিবীর কুবেররা বুঝিতে পারিলেন, গলদ কোথায়। পুরাতন জরাজীর্ণ পদ্ধতির যথাবিধি সংস্কার হইল ; বিশ্ব-রাষ্ট্রের চেষ্টায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

সুবিধার জন্য সকল দেশের মুদ্রা স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে র‍্যাশানালিজেশন্‌এর সূত্রপাত হইল; চারিদিকে আবার নব আশার সঞ্চার হইল; শিল্প-বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। সকল দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। মানুষ ভাবিল, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবী যেমন ছিল, আবার তেমনি হইয়াছে।

ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্ম্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা হইয়াছে। পরাজিত বিধ্বস্ত জার্ম্মানি বিনা তর্কে দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছে। কেহ চিন্তা করিয়া দেখে নাই, এ গুরুভার জার্ম্মানি কি করিয়া বহন করিবে। সে ফ্রান্সের পরম শত্রু; ফ্রান্স ক্ষতিপূরণের এক কপর্দ্দকও হ্রাস করিতে সম্মত নয়। নিরুপায় হইয়া জার্ম্মানি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী জনপদ—রুর উপত্যকাতে ফ্রান্সকে দখল দিল। এই সকল ঘটনা আর্থিক দুর্গতির পাঁচ বৎসরের ভিতরে সংঘটিত হইয়াছিল।

রুর দখল করিয়াও ক্ষতিপূরণ আদায় এবং সমর-ঋণ পরিশোধের কোন সম্ভাবনা নাই। বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ মাড়ওয়ারী-পদ্ধতি অনুসরণ করিল—ডস্‌ স্কিম অনুসারে জার্ম্মানিকে বহু কোটি টাকার স্বর্ণ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল—জার্ম্মানিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—তাহা না হইলে জয়ী রাষ্ট্রদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা কে দিবে? প্রচুর ঋণ করিয়া জার্ম্মানি দিন দিন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পসার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এবং ক্ষতিপূরণের কতকাংশ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইল। ভাগ-বাটওয়ারা লইয়া বিজেতাদিগের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়াতে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইয়ং প্ল্যান অনুসারে ব্যাঙ্ক অব্‌ ইন্‌টারন্যাশনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল।

র‍্যাশানালিজেশনের দ্রুত গতিতে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল; ধর্ম্মঘটের ভয়ে কারখানার মালিকরা নূতন নূতন ফুলপ্রুফ যন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন; ইহাতে বহু মজুর বেকার হইল। একত্রে পুঞ্জীভূত মাল ক্রয় ও বিক্রয় হওয়াতে, ছোট ছোট বহু দোকান উঠিয়া গেল। কুটীর-শিল্পগুলিও ক্রমশঃ লোপ পাইল; কৃষি-শিল্পে অবাধ গতিতে যন্ত্রের ব্যবহার হওয়াতে, কারখানার মজুরদের মত অনেক কৃষকও বেকার হইল। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায় সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট সকল বেকারকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি হইল; ধনিকেরাও ক্রমশ নিঃস্ব হইতে লাগিল।

মহাসমরের অবসানে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও শক্তিশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইল। আমেরিকার ধনিক, ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর বিজেতা ও বিজিতদিগকে বহুল পরিমাণে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সমর-ঋণ আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার ফলে বহু সোনা যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইতে লাগিল। বিজেতাদিগের ভিতরে স্বর্ণ মজুত বিষয়ে ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করিল, সমর-ঋণ এক কপর্দ্দকও পরিশোধ করিল না। ফ্র্যাঙ্কের মূল্যের অত্যধিক পতনের জন্য দেশের ভিতরে আর্থিক বিশৃঙ্খল হওয়াতে ফরাসীরা অনেকে বহু টাকা ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত রাখিয়া দিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেনের যে অবস্থা ছিল, পরে আর সে রকম রহিল না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার পূর্ব্ব অবস্থা না থাকিলেও আন্তর্জাতিক অর্থরাজ্যে লণ্ডন পদচ্যুত হয় নাই। সকল দেশের

ব্যাঙ্ক ও ধনিকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে বহু টাকা আমানত রাখিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহার জন্য ইংলণ্ডকে সব সময় সশঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে হইত; কারণ একসঙ্গে টাকা চাহিলে অথবা ষ্টার্লিংএর বিনিময়-হার কমিতে আরম্ভ করিলে, তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা সে সময় ইংলণ্ডের ছিল না, যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা এমনই শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও এক কারণ ছিল। যুদ্ধের পর বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুরোধে যখন সকল দেশে পুনরায় স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইল, ষ্টার্লিংকেও সোনার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। অন্যান্য দেশ তাহাদের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস করিল। ইংলণ্ড কিন্তু তাহার পূর্ব্বমূল্যই স্থির রাখিল। অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের অনুপাতে ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে নাই। যুদ্ধের অবসানে তাহাকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হয় নাই।

নব আশার সঞ্চার হওয়াতে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা বাহ্যিকভাবে ক্রমশ ভাল হইতে লাগিল; প্রত্যেক দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইল;—তিন বৎসর বেশ ভালই চলিল। ইতিমধ্যে ওয়াল্ ষ্ট্রীটে ভয়ানক ফটকাবাজী সুরু হইল;—আমেরিকার বাজারের শেয়ারের দাম ক্রমশই চড়িতে লাগিল। অন্যান্য দেশের লোকেরা ভাবিল, আমেরিকায় কি না কি কাণ্ড ঘটিতেছে;—কতই না কলকারখানা হইতেছে, কত জিনিষই না প্রস্তুত হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র আরও না কত অধিক ধনী হইছে। সেখানে অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই; জিনিষপত্রও তৈয়ারী হইতেছিল প্রচুর। কিন্তু ফটকার বাজারে সেয়ারের দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

ইহার সহিত সেখানকার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না; এই সংবাদ পৃথিবীর জুয়াড়ীরা রাখিত না, রাখিলেও সেদিকে বিশেষ নজর দেয় নাই;—কি করিয়া এই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইবে, ইহাই পৃথিবীর জুয়াড়ীগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল;—তাহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। ইহা দেখিয়া, সাধারণ লোক—যাহারা জুয়াড়ী নহে—তাহারও অন্যান্য দেশে গচ্ছিত টাকা আনিয়া আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত রাখিল, এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল;—ব্যাঙ্কগুলিও তাহাদিগকে টাকা ধার দিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাসের ঘর হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল;—শেয়ারের মূল্য অতি দ্রুতগতি হ্রাস হইতে লাগিল। সকলে সামাল্ সামাল্, হায় হায় করিতে আরম্ভ করিল;—প্রত্যেকে নিজ নিজ শেয়ার বিক্রয় করিতে চাহিল—কিন্তু কিনিবার লোক আর নাই;—সকলেই বেচিতে চাহিতেছে—শেয়ারের দর আরও কমিতে লাগিল, আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি টাকা আদায় করিতে সক্ষম হইল না; ফেল হইবার উপক্রম হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাহারা যে সব টাকা ইতিপূর্ব্বে লগ্নী করিয়াছিল, সে সকল দেশ হইতে টাকা আমদানী করিতে লাগিল।

এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমেরিকার পর, প্রথম ধাক্কা খাইল জার্ম্মানি। পূর্ব্ব হইতেই তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিতেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ফটকাবাজী সুরু হইলে আমেরিকানরা তাহাদের মজুত টাকা দিয়া শেয়ার কেনা-বেচা করিতে লাগিল;—ব্যাঙ্কগুলিও স্বদেশে লগ্নীর সুবিধা পাইয়া অন্যান্য দেশে টাকা লাগান স্থগিত রাখিল। জার্ম্মানি মহা ফাঁপরে পড়িল;—তাহার সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের সাময়িক উন্নতি এবং বিস্তৃতির মূলে ছিল, ডস্ স্কিম অনুসারে আমেরিকার ঋণ। তাহার

আশা ছিল এ কোন দিন বন্ধ হইবার নয় ;—ওয়াল্ ষ্ট্রীটের ফটকা-বাজীর সূচনাতে এই ঋণস্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। অনন্যোপায় হইয়া জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের নিকট হইতে সাময়িকভাবে টাকা ধার করিয়া তাহার শিল্প-বাণিজ্য কোনরকমে টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। এই সকল দেশেরও নিজেদের যথেষ্ট অর্থ ছিল না ;—যে টাকা তাহারা জার্ম্মানিকে ধার দিয়াছিল, ইহার অধিকাংশই তাহারাও সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছিল। ওয়াল্‌ষ্ট্রীট কোলাপ্‌সের ফলে, আমেরিকার জার্ম্মানিকে নূতন ঋণ দান করিবার সামর্থ্য রহিল না, অধিকন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশকে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া সেই সমস্ত দেশও জার্ম্মানিকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিল :—জার্ম্মানিতে শিল্প-বাণিজ্যে সঙ্কট সূচিত হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে অক্ষম—কাতর প্রার্থনা জানাইয়াও কোন প্রতিকার পাইল না—প্রথম বৎসরের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিতে তাহাকে বাধ্য করা হইল। ক্রমশ জার্ম্মানির অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইল যে, হুভার মোরাটোরিয়াম্ এবং বার্লিন্ ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল্ না হইলে জার্ম্মানিকে বাঁচাইয়া রাখা একেবারে অসম্ভব হইত ;—হুভার মোরাটোরিয়ামে জার্ম্মানির রাষ্ট্রিক দেনা পরিশোধ এবং বার্লিন্ ষ্ট্যাণ্ডষ্টিলে ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক দেনা পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইল। অর্থসঙ্কটের সূচনা হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ;—পৃথিবীব্যাপী ধনসঙ্কটের সূত্রপাত হইল জার্ম্মানিতে। সেই দেশ হইতে ঢেউ ইংলণ্ডের বুকে আসিয়া লাগিল ; সঙ্গে সঙ্গে ধনসঙ্কট অষ্ট্রিয়া ও মধ্য য়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইল।

লণ্ডন জগতের আর্থিক কেন্দ্র ; পৃথিবীর সকল ধনী, সকল রাষ্ট্র এবং বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি সেখানে টাকা আমানত রাখে। পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে, মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য ক্রমশ মন্দীভূত হইতেছিল; ইংরেজ ধনিকগণ বিদেশের শিল্প-বাণিজ্যে যে টাকা খাটাইয়াছিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সে টাকার মুনাফা পাইতেছিলেন না; এদিকে বিদেশ হইতে তাঁহারা যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ জার্ম্মানিকে ঋণ দিয়াছিলেন; জার্ম্মানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম; জিনিষপত্রের দর ক্রমশ কমিতে আরম্ভ করিল; সেইজন্য যে সকল দেশে ইংরেজদের টাকা লগ্নী ছিল, তাহারাও সেই সকল সাময়িক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না, যাঁহারা লণ্ডনে টাকা আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহাদের দেশে সঙ্কট আবির্ভূত হওয়াতে, তাঁহারা লণ্ডন হইতে আমানতী টাকা তুলিয়া লইয়া দেশে আনিতে লাগিলেন; যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলি বিপদগ্রস্ত হওয়াতে লণ্ডনে আমানতী টাকায় টান্ পড়িল; ফ্রাঙ্কের পতনের সময় যে সকল ফরাসী নিজের অবস্থা সচ্ছল এবং দৃঢ় রাখিবার জন্য লণ্ডনে টাকা আমানত রাখিয়াছিল, তাহারও বিলাত হইতে নিজেদের দেশে টাকা চালান দিতে আরম্ভ করিল; যতদিন ইংলণ্ডে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, লণ্ডনে টাকা আমানত রাখা এবং ঘরে সোনা মজুত রাখা একই কথা—পৃথিবীর চারিদিক হইতে টাকা তুলিবার হিড়িকের জন্য ষ্টার্লিংএর বিনিময়-হার স্থির রাখা দুঃসাধ্য হইল,—বিলাতের স্বর্ণমান ভাঙিবার উপক্রম হইল, ইতিমধ্যে মে কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে ইংলণ্ডের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া সকলেই বিচলিত হইল; বিদেশীরা যত শীঘ্র পরিল লণ্ডনের আর্থিক বাজার হইতে নিজের টাকা দেশে চালান দিতে লাগিল, অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি লণ্ডনে আমানতী টাকা দিয়া স্বর্ণ ক্রয় করিয়া দেশে আমদানী করিতে লাগিল।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের পক্ষে একসঙ্গে এতটাকা পরিশোধ করা

অসম্ভব ; ব্যাঙ্কের পুঞ্জীকৃত সমস্ত মজুত স্বর্ণের বিনিময়েও ইহার সামান্য অংশ পরিশোধিত হইত কিনা সন্দেহ ;—সেজন্য তাহাকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের নিকট হইতে বহু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে টাকা নিঃশেষ হইল ; অনন্যোপায় হইয়া ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নিজের দুর্গতির কথা জানাইয়া কেবল মাত্র দুইটি উপায়ের কথা উল্লেখ করিল ;—হয় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হইবে অথবা আরও টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে—ঋণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে জামিন হইতে হইবে। লেবার গভর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে স্বীকার করিলেন। নিউইয়র্ক এবং প্যারিসে নূতন ঋণের কথা উত্থাপন করিলে, তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করিল না। সেখানকার ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ্ গভর্ণমেণ্টের জামিনে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডকে ঋণ দান করিতে স্বীকৃত হইল না ;—তাহারা আরও এমন কতগুলি সর্ত্ত আরোপ করিতে চাহিল যাহা পালন করিয়া জামিন হওয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিরুপায় হইয়া লেবার গভর্ণমেণ্ট দেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিলেন।

ভারতবর্ষ ও বিলাতের ভিতরে একটা অখণ্ড যোগসূত্র রহিয়াছে ; ইহা কেবল রাষ্ট্রে নহে—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও। ইংলণ্ডে সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় অবিলম্বে ইহা ভারতবর্ষে পৌছিল। কেবল ভারত কেন, বিলাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বহির্বাণিজ্য সূত্রে যে সকল দেশ আবদ্ধ, প্রত্যেকটি দেশেই সঙ্কট দেখা দিল ;—ক্রমে উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

বিলাতে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশ সেই পথ

অবলম্বন করিল;—করিল না কেবল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, ইটালি, হল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ড। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করাতে সাময়িক ভাবে বিলাতের বিশেষ সুবিধা হইল;—জগতের আর্থিক বাজারের কেন্দ্র লণ্ডন, ইংলণ্ডে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় রপ্তানীর বাজার—ইহার চারিদিকে বিশেষ কোন সুউচ্চ শুল্ক প্রাচীর নাই—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ষ্টার্লিংএর ইজ্জৎ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল।

স্বর্ণমান পরিত্যাগের বিশেষ সুবিধা—যে সকল দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই সকল দেশে মাল বিক্রয় করিবার সময় স্বর্ণমান পরিত্যাগকারী দেশগুলি, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মাল চালান দিতে সক্ষম হয়, অথচ নিজের দেশে মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় স্থির থাকে—রপ্তানী ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং মুদ্রার বিনিময়ের সুবিধার জন্য দেশে অধিক পরিমাণে টাকার আমদানী হয়; অথচ সেই সঙ্গে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত দেশগুলিতে মালের মূল্য স্বর্ণমান পরিত্যাগকারী দেশগুলির রপ্তানির হ্রাস হয়। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যে সুবিধা ভোগ করিতে চাহিয়াছিল, বেশী দিন তাহাকে ইহা ভোগ করিতে হয় নাই, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও অনেক দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল।

স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া সাময়িকভাবে ইংলণ্ড সামান্য রকম সুবিধা ভোগ করিলেও জগতের ধন-সঙ্কটের উপশম হইল না। ভারতবর্ষ হইতে কোটী কোটী টাকার সোনা বিদেশে রপ্তানি হইতে লাগিল; ভারতবাসী, যার যৎসামান্য সোনা-রূপা ছিল, হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া সকলে নিঃস্ব হইতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্বর্ণের উপর মুদ্রানীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল, ইংলণ্ড ইহা পরিত্যাগ করাতে, ষ্টার্লিং-এর অনুপাতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যসম্ভারের মূল্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদেশে

রপ্তানির বিশেষ অসুবিধা হইল, ইহার ফলে আমেরিকার ধন-সঙ্কট আরও ব্যাপক, গভীর এবং তীব্রতর হইল।

২

সাধারণ পাঁচজন বাঙালী ভদ্রলোকের ন্যায় দেবেন্দ্রবাবুও, খবরের কাগজে এই সকল ঘটনার কথা পড়িয়াছিলেন। ধন-বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি না থাকাতে এবং একটার সহিত অপরটার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। বাল্যজীবন অনেক দুঃখকষ্টে কাটিলেও, বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর তিনি যেরকম রোজগার করিয়াছেন, তাহাতে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

স্বদেশী যুগের সময় এবং পরে বাঙলার মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক নামধারী অনেক লোন অফিস গজাইয়া উঠিয়াছে; সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। এগুলি বাঙলার আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে জন্মিয়াছে, উন্নতি করিয়াছে, এখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হওয়াতে কোন রকমে টিকিয়া আছে; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশের গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক নাই; তাঁহারা কেবল সমবায়-সমিতিগুলির লালন-পালন ভার লইয়াছেন।

দেবেন্দ্রবাবু টাঙ্গাইল লোন অফিসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার। তাঁহার নামের সহিত যুক্ত থাকাতে ইহার দিন দিন

শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল; এমন দিনও ইহার গিয়াছে টাকা লগ্নী করিতে পারিবেন না আশঙ্কায় দেবেন্দ্রবাবু হাজার হাজার টাকার আমানত ফিরাইয়া দিয়াছেন। বন্ধুদের উপরোধ অনুরোধও গ্রাহ্য করেন নাই।

"সব জেলায় ব্যাঙ্ক হয়েছে, আমাদেরও একটা খুলতে হবে" এই মনোবৃত্তি লইয়া দেবেন্দ্রবাবু ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সহায় হইবে মনে করিয়া ইহাকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যে কোন উৎসাহী যুবক উপযুক্ত জামিন দিলে তাহাকে তিনি বিমুখ করিতেন না। এরকম যুবক তিনি খুব কমই দেখিয়াছেন। টাঙ্গাইলে বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশ মহাজন, তাহারা সময়ে অসময়ে সাহায্য চাহিলে টাকা পাইত। আর এক দল বাঙালী ব্যবসায়ী—চরিত্রহীন; দেবেন্দ্রবাবু তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

এত টাকা কি করিয়া খাটাইবেন? আমানতকারীদিগকে স্থদ দিতে হইবে। ব্যাঙ্ক বিষয়ক বইগুলি পড়িবার সময় দেবেন্দ্রবাবুর নাই; নানা কাজে সর্ব্বদা তিনি লিপ্ত থাকেন। অন্যান্য ডিরেক্টার-দিগের বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহার অপেক্ষা বেশী নয়; কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর—কি ভাবে স্থদ ও মুনাফা বেশী হইবে সর্ব্বদা সেই দিকে লক্ষ্য, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে টাকা খাটান যাইত; দেবেন্দ্রবাবু আমানতি টাকা দিয়া একটা চটকল করিবেন মনে করিয়াছিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া সে সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, এক সঙ্গে আমনতকারীরা টাকা চাহিলে পরিশোধ করা সম্ভব হইবে না।

লোন অফিসে ক্রমশ টাকা জমিতে লাগিল, আগাম স্থদে চাষীদের পাটের দাদন দিয়াও সব টাকা খাটান যায় না। সাধারণ ভদ্র-লোকদের অবস্থা সচ্ছল নয়—বাড়ী-ঘর বাঁধা রাখিয়া অনেকে লোন

অফিস হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের নিকট হইতে স্বদ ও আসল আদায় করিতে দেবেন্দ্রবাবুকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক রোজগারের স্থবিধার জন্য দেনা করে না। করে বিবাহাদি ব্যাপারে অথবা চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কোনো উপায় নাই—মোকদ্দমা করিতেই হইবে—নিলামে বাড়ী কিনিয়াও স্বস্তি নাই। সাত পুরুষের ভিটা-ছাড়া করিতে দেবেন্দ্রবাবুর বুকে বাজিত। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময়ে তাঁহাকে নির্ম্মম হইতে হইয়াছে। ঘরে বাহিরে সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী; এমনই তাঁহার অদৃষ্ট।

পৃথিবী-ব্যাপী ধন-সঙ্কটের পূর্ব্বে কৃষকেরা জমি বাঁধা রাখিয়া লোন অফিস হইতে এবং জামিন দিয়া স্থানীয় সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করিত। এ দেনা পরিশোধ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে বাঙালী কৃষকের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। তাহার উপরে শারদা আইন পাশ হইলে মূর্খ পুরোহিত এবং মোল্লার প্ররোচনায় নূতন ঋণ করিতে বাধ্য হওয়াতে পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে বাঙালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী হইয়াছে। প্রতি বাঙালী পরিবাবে গড়পড়তায় পাঁচ জন ব্যক্তি ধরিলে, প্রতি বাঙালী পরিবারের বর্ত্তমান সময় একশত একাশী টাকা এবং কৃষক পরিবারে একশ ছেষট্টি টাকা গড়পড়তা ঋণ হয়। পাটের বাজার চড়া হইলে চাষী জমিদারের খাজনা দিয়া লোন অফিস ও সমবায় সমিতির স্বদ রীতিমত পরিশোধ করিত, আসল পরিশোধের কেহ বড় চেষ্টা করিত না। এই সব দেওয়ার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা দিয়া ঢেউ-তোলা টিন কিনিত, ছাতা কিনিত এবং শহরে আসিলে নূতন ডীজ লণ্ঠন কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত;

ইলেক্‌ট্রিক টর্চ দেখা দিলে কেহ কেহ তাহাও কিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাটের দাম বেশী হইলে, সচ্ছল অবস্থার জন্য বাঙালী চাষী ভাল আহার অথবা ভাল পোষাক করে না ; মাঝে মাঝে কাহাকেও কাহাকেও জমকাল রংএর পিরাণ কিনিতে দেখা যায়। তাহাও বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য।

সচ্ছল অবস্থায় রীতিমত সুদ পাইলে মফঃস্বলের লোন অফিস আসলের জন্য বড় একটা তাগিদ দেয় না ; আসল আদায় হইলে মহা মুস্কিল। আবার টাকা লগ্নী করিবার ভাবনা ভাবিতে হইত। সব সময় টাকা আমানত হইতেছে—আমানতকারীরাও নিশ্চিন্ত ছিল—সুদ পাইলেই তাহারাও খুসী ; সব সময় আবার সুদ নিত না—আসলে জমা দিত। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও টাঙ্গাইল লোন অফিসের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। আমানতকারীরা রীতিমত সুদ পাইতেছিল, অংশীদারদের মুনাফার হার প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতেছিল, রিজার্ভ ফাণ্ডও কম ছিল না। প্রথম অবস্থায় অফিসটির জন্য দেবেন্দ্র-বাবুকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ইহার কোন কার্য্য তাহার দৃষ্টির বাহিরে হয় নাই ; তথাপি ঘোর তমিস্রা ইহার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল।

ওয়াল্‌ ষ্ট্রীটের ঢেউ দেশ-দেশান্তর পার হইয়া ভারতের বুকে আঘাত করিল। সেই আঘাত প্রথমে অতি মৃদু ; আসিতে আসিতে তাহার তীব্রতা হ্রাস হইয়াছিল।

সাধারণ বাঙালী অব্যবসায়ী ; এ কম্পন প্রথমে তাহারা অনুভব করিল না। কলিকাতা ও বোম্বাইএর ব্যবসাকেন্দ্র তোলপাড় করিল, দৈনিক কাগজে নিয়মিত সংবাদ বাহির হইল, সাধারণ বাঙালী এই

চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে পারিল না। ক্রমশঃ জিনিষের দর পড়িতে আরম্ভ করিল। বাঙালী ভাবিল, হয়তো কোথাও ভাল ফসল জন্মিয়াছে; কাপড়ের দর কমিল—বাঙালী ভাবিল—ভালই হইয়াছে, এবার দুই একখানা বেশী কাপড় কিনিবে। পাটের দর দ্রুতগতিতে হ্রাস হইতে লাগিল, বাঙালী ভাবিল, সাহেবরা হয়তো একজোট হইয়া কেনা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়াছে, তাহারা মাসে মাসে এইরকম করিয়া থাকে—অথবা চাহিদা অপেক্ষা পাট চাষ বেশী হইয়াছে—কৃষকেরা কাহারও বুদ্ধি লয় না, এইবার মজা বুঝিবে! বাঙালী একেবারে নিশ্চিন্ত,—এদিকে পৃথিবীর সকল লোকের টনক্ নড়িল।

দেবেন্দ্রবাবু দেখিলেন, সেই বৎসর খাতকের নিকট হইতে সুদ আদায় ভাল হইল না—আসল আদায় একেবারেই হয় নাই; টাকা আমানত রাখিতেও কেহ বড় আসিল না। মনে মনে ভাবিলেন, ভালই হইয়াছে—যে সুদ আদায় হইয়াছে, তাহা হইতে কর্ম্মচারীর মাহিনা এবং আমানতকারীদিগকে সুদ দিয়াও, অংশীদারদের যৎকিঞ্চিৎ মুনাফা দিতে সক্ষম হইবেন; প্রতি বৎসর রিজার্ভ টাকা উদ্বৃত্ত রাখা হয়—সে বৎসর সম্ভব হইবে না;—না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। বহু টাকা জমিয়াছে। কিছুদিন পর দুই একজন আমানতকারী আসল টাকা তুলিয়া লইতে আসিল; ব্যাঙ্কে তখন অযচ্ছল টাকা মজুত ছিল—টাকা ধার করিতে আসিলে, দেশের অবস্থা দেখিয়া ঋণদান কদাচিৎ করিতেন—দেবেন্দ্রবাবু আমানতকারীদের আসল পরিশোধ করিতে লাগিলেন। পর পর আরও আমানতকারী আসিল; তাহাদিগকেও তিনি বিমুখ করিলেন না—তিনি ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার শত্রুরা ব্যাঙ্কের নামে কুৎসা রটাইতেছে—এরূপক্ষেত্রে কাহাকেও বিমুখ করা

সঙ্গত নয়! টাঙ্গাইল সহরে আরও দুই তিনটা ছোট ছোট লোন অফিস আছে;—তাহারা আমানত পরিশোধ করিতে সক্ষম হইল না, টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল—ডিরেক্টারগণ গোপনে নিজেদের এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের টাকা তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল। দেবেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস, টাকা দিতে থাকিলে তাহার এখানে আর রান্ হইবে না,—শত্রুরা যাহাই রটাক না কেন। রান্ না হইলেও আমানতী টাকা তুলিয়া লওয়ার হিড়িক থামিল না, অধিকন্তু কেহ আর আমানত রাখিতে আসিল না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অফিসের কর্ম্মচারীদিগকে সুদ ও আসল আদায় করিবার জন্য তিনি খাতকগণের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন; তাহারা রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ব্যাঙ্কের তহবিলে মাত্র দুই এক হাজার কাঁচা টাকা ছিল; যে কয়েকখানা কম্পানির কাগজ ও বণ্ড ছিল, তাহা রেহান্ রাখিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইলে, দুই একদিনের মধ্যে তাহাও নিঃশেষ হইল। খাতক ও কর্ম্মচারীদিগকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়াও কোন ফল হইল না।

সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাবু আর লোন আফিসে যান না; আমানত-কারীরা বাড়ীতে হানা দিতে সুরু করিল। যাহার যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইল। কেহ কেহ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, কেহ কাঁদ কাঁদ হইয়া কাতর প্রার্থনা জানাইল, কেহ বা অভিশাপ দিল, যথেচ্ছা কটূক্তি করিল, কেহ আবার শাসাইয়া গেল—হাইকোর্টে আবেদন করিয়া ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া করিবে। বাড়ীর ভিতরেও শান্তি নাই; সেখানে মেয়েদের ভীড়। কেহ একেবারে অনাথা বিধবা—চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—ব্যাঙ্কের সুদই একমাত্র সম্বল। কাহারও ছেলের নিউমোনিয়া হইয়াছে—ডাক্তার দেখাইবার সামর্থ্য

নাই—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া চিকিৎসা করাইবে। কাহারও উনানে হাঁড়ি চড়ে নাই—সুদ পাইলে চাউল কিনিবে। পরীক্ষার সময় হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দিতে হইবে—না দিতে পারিলে এতদিনের পরিশ্রম বৃথা হইবে। কাহারও বা মেয়ে বিবাহযোগ্য হইয়াছে, অনেক চেষ্টার পর একটি সৎপাত্র জুটিয়াছে—এখন টাকা না পাইলে পাত্রটি হাতছাড়া হইবে—ভবিষ্যতে এরকম পাত্র মিলিবে না। বহির্ব্যাপারে অন্নপূর্ণা স্বামীকে কোনদিন কোন কথা বলেন না, এখনও বলিলেন না—নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন—অতি সঙ্গোপনে, স্বামী যাহাতে বিচলিত না হন। দূর প্রদেশ হইতে সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা পত্র লিখিলেন, যেমন করিয়া হউক দেবেন্দ্রবাবু যেন ব্যাঙ্কটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, সকলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সম্ভব হইলে, কয়েকটি টাকা পাঠাইতে পারিলে মহিলাটি এই দুর্দ্দিনে সুখী হইতেন, না পাঠাইলেও দুঃখিত হইবেন না, সকলের যাহা হইবে সে দুঃখ হইতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহেন না। এত বড় অশান্তির মধ্যে প্রবাসী বঙ্গমহিলার ঔদার্য্য দেবেন্দ্রবাবুকে মুগ্ধ করিল—এই চিঠিখানাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা।

দেবেন্দ্রবাবু নির্ব্বাক। হতাশায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ব্যাঙ্কটিকে প্রাণ থাকিতে নষ্ট হইতে দিবেন না। নিজের সর্ব্বস্ব তিনি এই ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়াছেন; ইহার জন্য তিনি মুহূর্ত্তও বিচলিত হন নাই—সকলের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইলে তাঁহারও হইবে। আত্মীয়স্বজনের অনেক টাকা তাঁহার নিজ নামে আমানত আছে, সেদিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা কেবল তাহাদেরই জন্য—সেই সমস্ত অনাথা—যাহারা তাঁহার নাম শুনিয়া, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া, জীবনের শেষ সম্বলটুকু ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছে। তাঁহার মন

সর্ব্বদা তোলপাড় করিতেছে ; বাহিরে তিনি শান্ত সংযত—প্রতিদিনের কাজে কোন ক্রটি তাঁহার নাই।

৩

গরমের ছুটিতে নিরঞ্জন সস্ত্রীক টাঙ্গাইলে আসিয়াছে। উমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতে লাগিল ; বাহির হইতে হাঁকিল, ঠাকুরপো, ঠাকুরপো. শিগ্‌গীর এসো। ঠাকুরপো কোথায় গেছে? দুভাই—কারও টিকি দেখবার জো নেই! এরই ভেতর বের হয়ে গেছে!

—কি হয়েছে দিদি? এত হাঁপাচ্ছ কেন? মাধুরী শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—হয়েছে আমার মাথা, বল না, ঠাকুবপো কোথায় গেছে?

—আমায় কি কোন দিন বলে যান? হয়তো ক্লাবে গেছেন—নইলে আর কোথায় যাবেন!

—তাহলেই হয়েছে। বলিয়া দ্রুতগতিতে দরজার দিকে অগ্রসব হইল। মাধবী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ; করুণ স্বরে বলিল, বল না দিদি কি হয়েছে, কেন তুমি ওকে এত খুঁজে বেড়াচ্ছ?

উমা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, জানি ঠাকুরপোকে পাব না, এখানে এলে দু-মিনিটও বাড়ী থাকবে না—টো টো করে বেড়াবে! শ্বশুর ঠাকুর যে কি রকম হয়ে গেছেন, মা পাশে বসে কাঁদছেন, দেখে এলুম। ওকে ডেকে কোন লাভ নেই, নিজে থেকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ছুটে এলুম ঠাকুরপোকে ডাকতে—দেখছি তুমি একলাটি বসে আছ।

মাধুরী উদ্বিগ্ন হইল; কহিল, এস আমরা দুজনে গিয়ে শ্বশুর ঠাকুরের কাছে যাই, তুমি বরং ছিদামকে পঠিয়ে দাও। ওঁকে গিয়ে ডেকে আনুক গে।

আর কোন কথা হইল না, দুইজনে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

দেবেন্দ্রবাবু শান্ত ও গম্ভীর, ভিতরে চঞ্চলতা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; অন্নপূর্ণা তাঁহার কাছে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

মাধুরী ঘরে ঢুকিয়া শশুরকে হাওয়া করিতে লাগিল। একটু পরে, উমা মিছরির সরবৎ লইয়া আসিল।

বাতাস করিতে করিতে মাধুরী করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, বাবা?

দেবেন্দ্রবাবু কোন জবাব দিলেন না।

উমা আব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। মাধুরী ছেলেমানুষ—বেশী দিন টাঙ্গাইলে থাকে নাই। শ্বশুরের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে অভিভূত না হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

অন্নপূর্ণা বিশেষ কিছু জানিতেন না, কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন মন ভাল নাই—রাত্রে আহার করিবেন না। স্ত্রী কারণ জানিতে চাহিলে, দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, কথাটা বড় ভয়ানক—অন্নপূর্ণা সহ্য করিতে পারিবেন না।

কথাটা আর অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখা দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষেও অসম্ভব বোধ হইল। পুত্রবধূর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। গম্ভীর অথচ গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, কি কুক্ষণে লোন অফিসটা খুলেছিলাম! তখন কি জানতাম এরকম সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

অধীর ভাবে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাঙ্ক কি ফেল হয়েছে?

—এখনও হয়নি, হতে আর বেশী দেরী নেই। সবাই চাচ্ছে, যা কিছু আছে বেচে-কিনে অফিসটা তুলে দিই। আমি শুধু একে আঁকড়ে ধরে রয়েছি, আর পারি না—একেবারে হয়রান হয়ে গেছি।

উমা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, সবাই যখন চাচ্ছেন—আপনি সরে দাঁড়ান না কেন? ওদের যা খুসি করুন গে—এত কষ্ট কি সহ্য করা যায়?

দেবেন্দ্রবাবু একটু ম্লান হাসিলেন; কহিলেন, তুমি শুধু আমার কষ্টটাই দেখছো বৌমা। দায়িত্ব কতটা একবারও ভাবলে না; ভাববে কি করে, আমি তো তোমাদের কোনদিন জানাইনি।

ঠিক সেই সময় নিরঞ্জন সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবু তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাধুরী বাহিরে যাইবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হইলে দেবেন্দ্রবাবু সস্নেহে বলিলেন, তুমি চলে যেও না মেজ বৌমা; তুমিই না সবার আগে আমার কথা শুনতে চেয়েছিলে।

নিরঞ্জন বিছানার এক পাশে বসিলে, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেবেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, বৌমা আমায় ব্যাঙ্ক ছেড়ে দিতে বলছে। দেব বললেই কি দেওয়া যায়? অফিসের যখন ভাল সময় ছিল, আমি চালাইনি একে? আজ এর সসেমিরা অবস্থা হয়েছে বলে সরে দাঁড়াব? এ কি কখনো হতে পারে? হয় না। আমার কথা শুনে সবাই যথাসর্ব্বস্ব এতে রেখেছে—আমি এর ভেতরে রয়েছি বলে। এ সঙ্কট হয়তো দুদিন পরে আর থাকবে না। ব্যাঙ্কটা এখন তুলে দিলে পরে নিশ্চয়ই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করবে—সে সময় কি আর নতুন করে ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে পারবো আমরা? লিকুইডেশনে দিলেই বা কি হবে; এতে কারও ঘরের টাকা ঘরে ফিরে আসবে

না। অফিসিয়াল লিকুইডেটার আর নিজেদের লিকুইডেটার কারও দরদ এর জন্য থাকবে না—খরচ হবে অনেক। না হয় খরচা দিতে রাজি হলাম, কিন্তু এতে কি কেউ সব টাকা পাবে? শেয়ারহোল্ডার তো নয়ই—ডিপজিটারদের টাকা উঠবে কিনা সন্দেহ আছে; সব জিনিসের দাম কমে গেছে, রেহান রেখেছিলুম যে সময়ে সে সময়ে দাম ছিল পাঁচ হাজার এখন মেরে কেটে হাজার দুই আড়াই হলেই বর্তে যাব। বিক্রি করতেও কম সময় লাগবে না; মামলা মোকদ্দমা—বিশ বছর কেটে যাবে লিকুউডেটারকে রিপোর্ট দিতে।

মাধুরী কি যে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিয়াছিল, স্বামীর সম্মুখে শ্বশুরকে বলিতে পারিতেছিল না। দেবেন্দ্রবাবু ইহা লক্ষ্য করিলেন; সস্নেহে কহিলেন, কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ মেজ বৌমা? বল। নিরু রয়েছে? তাতে কি?

মাধুরী সলজ্জভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, সবাই জানে, আপনি অফিসটাকে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন, রোজ রোজ তারা কেন আপনাকে—

সন্তোষ সেই ঘরে প্রবেশ করাতে মাধুরীর প্রশ্ন শেষ হইল না। সন্তোষ বেশী দেরী করিল না, সে সব জানে; একটু পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সস্নেহে দেবেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, জানলেই তো হলো না মা! সবাই সব সময় সব সহ্য করতে পারে না। ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে, দরকার হলে পাবে বলে। এখন যে সবারই টাকার দরকার—না পেলে ক্ষেপে উঠবে না? দুকথা বলবে বই কি।

এতক্ষণ পরে অন্নপূর্ণার মুখ খুলিল, ক্ষোভের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আবার কি হয়েছে?

বাহিরে যথাসম্ভব শান্ত ভাব ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, আজকে বিশেষ কিছু হয়নি; একটা চিঠি পেয়ে মনটা বড্ড খারাপ হয়েছে।

চিঠিতে কি সংবাদ আছে জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইল। কিন্তু কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। উমার কটাক্ষ এবং ঘোমটার আড়ল হইতে মাধুরীর সজল চোখের কাতর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিরঞ্জন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিতে কি লেখা আছে?

মিনিট পাঁচ ছয় পরে একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া দেবেন্দ্রবাবু কহিলেন, তোমরা সবাই শুনতে চাচ্ছ, বলছি; বলবার ইচ্ছে আমার একেবারে নেই। শুনলে তোমাদের খুবই কষ্ট হবে।

উমা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, আপনি একা সব সহ্য কববেন, আর আমরা সবাই বসে স্ফূর্তি করবো। বলিতে বলিতে সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া ম্লান হাসিলেন, বলিলেন, বেশ, আজকে তোমরা সবাই মিলে এটাকে ভাগ করে নাও—আমি একা আর এ সব সহ্য করতে পারছি না।

তারপর তিনি ধীর ভাবে বলিলেন, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে হাজার টাকা জমিয়েছিল—

সকলে অবাক হইল; এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ভিক্ষে করে হাজার টাকা জমিয়েছিল!

—হাঁ। বৌমা, তুমি তাকে দেখেছ, আমাদের এখানে যে ভিখিরি বামুন এসে মাঝে মাঝে থাকতো, লাল কাপড় পরা—

উমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—সেই হাজার টাকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের অফিসে রেখেছিলেন, সুদ পাবে বলে, সুদ সে কোনদিন নিত না। সুদে সুদে শেষটায় তেরশ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। শেষবার সে এসেছিল টাকা তুলে নিতে, আমি তাকে টাকা তুলে নিতে দিইনি।

দেবেন্দ্রবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বুড়ো বামুন কি টাকার জন্যে নালিশ করেছে?

—এখানে নালিশ করলে তো বাঁচতুম; আদালতে নালিশ সে করেনি—এখানে নালিশ সে কোন দিন করবে না।

দেবেন্দ্রবাবুর চোখ সজল হইল, মুখ পাংশুবর্ণ, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য অন্নপূর্ণা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, এত উতলা হচ্ছো কেন, কি হয়েছে, সব খুলে বল।

—তোমাদের আমি সব খুলে বলছি; আগে একটু সামলে নিই।

কয়েক মিনিট পরে অনেকটা শান্ত হইয়া দেবেন্দ্রবাবু কহিলেন, বামুন রোজ এসে টাকা চাইত; আমি জিজ্ঞেস করতুম, ক টাকা? বুড়ো মাথা নেড়ে বলতো—সব কটা।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, সব টাকা নিয়ে বুড়ো কি করবে?

—মাটিতে পুঁতে রাখবে; বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু একটু ম্লান হাসিলেন, শ্বাসরোধ করিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, তারপর?

—বুড়ো কিছুতেই ছাড়বে না আমায়; যক্ষের ধন আগলে রাখবে। টাকা আমি তাকে কি করে দিই? ব্যাঙ্কের সে অবস্থা থাকলে দিয়ে দিতুম বইকি—কে আর বুড়োর ঝক্কি পোয়াতো! এ টাকা তার কোন কাজে লাগবে না—বাড়ীতে রেখে বুড়োকে কতবার করে বুঝোতে চেষ্টা

করলুম—কোন কথা সে আমার শুনতে চাইলে না। দশ টাকা, কুড়ি টাকা—একশ টাকা অবধি আমি তাকে দিতে চাইলুম—ভিখিরী বামুন নিলে না। যাবার সময় কদম গাছটা দেখিয়ে বলে গেল—সে যেমন টাকার শোকে মরতে চলেছে—আমারও একদিন কদম গাছে লট্‌কে মরতে হবে।

মেয়েরা একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; নিরঞ্জন কোন কথা বলিল না, স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

দেবেন্দ্রবাবু একটু হাসিলেন; বলিলেন, শুনে মনটা আমার একটু খারাপ হয়েছিল, পরে সব ভুলে গিয়েছিলুম।

অন্নপূর্ণা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমিই বা শাপমন্যি কুড়োতে গেলে কেন? ইচ্ছে করলেই তো তুমি ওই বিট্‌লে বামুনের টাকা কটা ফেলে দিতে পারতে?

দেবেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, দিতে পারতুম দেবার মত টাকা অফিসে ছিল—বামুনকে দিয়ে থুয়েও কিছু টাকা থাকত বইকি! কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি দেওয়া যায়—

অন্নপূর্ণা উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া বলিল, তোমাব সব তাতেই জেদ্ বেশী! এত শাপমন্যি দিলে—এর পরও তোমার ইচ্ছে হলো না! আবার হাসছিলে তুমি! একটু ভয়ও হলো না তোমার মনে—নিজের না হোক—ছেলেমেয়েরা রয়েছে—বেটার বউরা—তাদের ছেলেমেয়ে!

ম্লান হাসিয়া দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, দেব কি করে? একা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই তো ব্যাঙ্কের একমাত্র পাওনাদার নয়। বামুন চেয়েছিল—টাকা কটা মাটিতে পুঁতে রাখতে—কারও কাজেই তো আসতো না। আর সবাই চাইছে—টাকা খরচ করবে বলে—মেয়ের বিয়ে, ছেলে পড়ান, বাপের শ্রাদ্ধ, জমিদারের খাজনা, ডাক্তার দেখাবে বলে—সবাই

রোজগার করে খরচ করার জন্যে। ভিখিরী বামুন শুধু সঞ্চয়ই করেছে, খরচ করার মাহাত্ম্য সে বুঝবে কি করে? তাকে হাজার টাকা দিয়ে দিলে সে শুধু আগলে রাখতো—আর এদিকে সবার হাহাকার লেগে যেত। এখনও যে দুচার জন বিধবা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে মাসে মাসে দু-দশ টাকা দিচ্ছি, তাও একেবারে বন্ধ হয়ে যেত—এরা সবাই ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে—ভিখিরী বামুনের মত বাড়ী বাড়ী খেয়ে বেড়াতে পারে না।

উমা ও মাধুরী রাগে ফুলিতে লাগিল; বামুনকে সামনে পাইলে দু কথা শুনাইয়া দিত।

অধীরভাবে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, বুড়ো বামুন এর পর আর কোন দিন এসেছিল?

ক্ষীণকণ্ঠে দেবেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, না; আর সে এমুখো হয়নি। শুনছি—তার মৃত্যু হয়েছে—গাঁয়ের ভেতরে—গাছের তলায়—রাস্তার ধারে। বুকে চেপে রেখেছিল সে ব্যাঙ্কের পাশ বই। এখন গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে গিয়ে তার একমাত্র ওয়ারিশ। জেলা থেকে জজ সাহেবের চিঠি পেয়েছি—কড়া হুকুম—একমাসের ভেতরে হাজার টাকা কোর্টে জমা দিতে হবে।

সুখ ও শান্তি

১

সেদিন সন্ধ্যার পর নিরঞ্জনের ঘরে আড্ডা বসিল।

উমা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, বরাবর ভুল করে এসেছি।

—কি ভুল করে এসেছো দিদি? মাধুরী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কিছু না; তোর সব কথায় কাজ কি?—বড্ড ডেঁপো হয়েছিস দেখছি; বলিয়া উমা মাধুরীর গাল টিপিয়া দিল।

—এভাবে ফাঁকি দিলে চলবে না দিদি; তোমায় বলতেই হবে, নইলে আড়ি। বলিয়া মাধুরী হাসিয়া উঠিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত উমা বলিল, না হয় আমিও আড়ি দিলুম।

মিনিট খানেক না কাটিতেই মাধুরীর অসহ্য হইল। সে বলিল, আমায় তুমি বলবে না দিদি—কি ভুল তুমি করে এসেছ?

উমা অনুতপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, শ্বশুরঠাকুরকে আমি বরাবর ভুল বুঝে এসেছি। আমি ভাবতুম—তিনি শুধু শুধু আমাদের ওপরে জোর খাটান। আজ বুঝলুম—এ জোর উনি সবচেয়ে বেশী খাটান নিজের ওপরে! কি ভয়ানক বল তো! বিটলে বামুন গাল দিয়ে গেল—গাছে লটকে মরবে—একটুও টললেন না! আমি তো ভয়ে সারা হয়ে যেতুম! বিটলে বামুনের টাকা তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিতুম—এক মিনিটও আর রাখতুম না।

ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, তোমার বড্ড

ভয় দিদি! শাপমন্যি দিলেই হয় না, বিটলে বামুন শ্বশুর ঠাকুরের কি করতে পারে? তিনি তো আর—

উমা জ্বলিয়া উঠিল; বাধা দিয়া বলিল, হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিস যে বড্ড?

মাধুরী একটু অপ্রস্তুত হইল; তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, হাসি তুমি দেখলে কোথায়? বলছিলুম, শুধু গাল দিলেই হয় না, বামুনের সে তেজ আর নেই—

—নাই বা থাকলো, ওকথা শুনলে কারই বা মাথা ঠিক থাকে? জানি ওঁর কিছু হবে না, শুধু ভাবছি কি ভয়ানক লোক উনি, কি করে সহ্য করলেন, মাকে অবধি জানাননি!

—সে কথা আর বলো না দিদি; সবাই কথা চেপে রাখে, কোন কথা বলতে চায় না; বলিয়া মাধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

—সে কি রে! তোর আবার কি হলো? বলিয়া উমা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

মাধুরী লজ্জিত হইল; বলিয়া উঠিল, আমার আবার কি দেখলে তুমি? আমি তো কিছু করিনি—শ্বশুর ঠাকুরের কথা হচ্ছিল—

—ফের আমার সামনে মিথ্যে কথা। জানিস আমি তোর দিদি—গুরুজন? কৃত্রিম রাগের সহিত উমা বলিয়া উঠিল।

নিজেকে অনেকটা হালকা করিতে চেষ্টা করিয়া মাধুরী বলিল, সত্যি বলছি দিদি, তুমি হয়তো ভুল শুনেছ।

—তোর কোন কথা আমি শুনিনি, চোখে দেখেছি। লক্ষ্মীটি, কোন কথা আমার কাছ থেকে লুকোসনি—তোরই ভালর জন্যে বলছি।

উমার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাধুরী অবাক হইল; বলিল, এসব তুমি

কি বলছো দিদি—তোমার কাছ থেকে লুকোবো—আমি? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

অধীর ভাবে উমা বলিয়া উঠিল, বলিসনি, সব কথা চেপে রাখে?

মাধুরী কোন জবাব দিল না, কি যেন ভাবিতে লাগিল। উমা বিরক্ত হইল, কঠিন স্বরে বলিল, তুইও দেখছি এ বাড়ীর পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছিস, কোন কথা ভাঙতে চাস না?

মাধুরী আহত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি জানতে চাচ্ছ, খুলেই বল না?

ঠাকুরপো কি তোকে কোন কথা জানায় না?

মাধুরী একটা চাপা নিশ্বাস লইয়া বলিল, আজ অবধি তো বলেননি, কোনদিন বলবেন বলেও ভরসা হয় না।

ব্যথিত কণ্ঠে উমা কহিল, এরকম তো কোন দিন ছিল না! ভাল করে জানতে হচ্ছে।

মিনিট খানেক পরে মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছো দিদি?

—তুই তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করিসনি?

—আগে করতুম; এখন আর করি না, সয়ে গেছে।

—সয়ে গেলে চলবে কেন?

—না সইলে কি করি বল? জবাব তো দেবেন না, বেশী পেড়াপীড়ি করলে, হেসে বলবেন—তুমি বুঝবে না।

উমা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর তো আর কোন কাজ নেই, চাকর বামুন আছে—ছেলেমেয়েদের জন্যে আয়া রেখেছিস। বসে বসে কি করিস, ইংরেজী শিখেছিস?

মুখ কালো করিয়া মাধুরী জবাব দিল, কে শেখাবে বল?

—কেন, ঠাকুরপো ?

—দেখতেই তো পাচ্ছ ; বাড়ীতে কতক্ষণ থাকেন, সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াবেন। চেপে ধরলে বলেন, ওই ঢের হয়েছে—আর পড়ে কাজ নেই।

উমা অবাক হইল ; বলিল, ঠাকুরপো এ কথা বলেছে তোকে ? মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কি ঝোঁক ওর—আমায় নিয়ে কি হট্টগোলটাই না করেছে !

—এ মত ওঁর ঘুরে গেছে। লেখাপড়া জানা মেয়েদের ওপর উনি হাড়ে হাড়ে চটা। বলেন, সবাই শেখানো বুকনি আওড়ায়। কথা বলছে না ফিলজফি আওড়াচ্ছে—ঘরেবাইরে ফিলজফি শোনবার ওঁর দরকার নেই। তোমার ওপর কিন্তু ওর বড্ড টান, দিদি।

উমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মাধুরী তাহা লক্ষ্য করিল না, আবেগের সহিত বলিতে লাগিল, কি চোখে তোমায় দেখেন উনি—অবাক হতে হয় ! বলেন, বৌদির জোড়া মেয়ে বাঙলায় আর নেই, এত ভাবতে পারে—সব তার নিজের কথা—শুনলে আনন্দ হয় ! তা নয়, শুধু শুধু বই পড়া বিদ্যে—ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি রয়েছে কি জন্যে !

কথাটা চাপা দিবার জন্য উমা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরপো তোকে নিয়ে বেড়াতে বের হয় না ?

—মাঝে মাঝে টকি দেখতে নিয়ে যান, তাও আবার নিজে দেখে এসে ভাল লাগলে ; নতুন ছবি গোড়াতে দুজনে একসঙ্গে বসে আজ অবধি দেখিনি, বন্ধুদের নিয়ে একদিন হৈ চৈ করে দেখে এসে, তারপর আমার পালা।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল, তোকে কী ভালটাই না বাসে ! যেটা দেখে ওর ভাল লাগবে, তোকে না দেখালে—

—তুমি তো ওঁর দিকে টানবে দিদি! আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না।

—কি ভাল লাগে না তোর?

—এই সব বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া।

—বেটাছেলে একটু করবে বই কি, নইলে যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে। তুই কি মেয়েদের মুখ না দেখে থাকতে পারিস? পাড়ার বৌদের সঙ্গে আলাপ করিস না? ঠাকুরপোর বন্ধুদের বাড়ীতে তোর নেমন্তন্ন হয় না?

—হয়; সবাই বিলেত-ফেরত, টেবিলে খায়, বাবুর্চি রান্না করে।

—তাদের বৌরা কেমন দেখতে? তোর সঙ্গে কথা বলে?

—বলে, আমার কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকে। তাদের কেউ বি-এ, এম-এ পাস, ওদের সঙ্গেই তো আজকাল ওঁর ভাব।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, ভাব যা তা দেখতেই পাচ্ছি।

মাধুরী ইহা লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, দু একদিন থিয়েটার দেখতে নিয়ে গেছেন, একটু রাত হলেই ফেরবার তাড়া—থিয়েটার তখনও শেষ হয়নি, শেষ হতে ঢের দেরী! আমার চলে আসতে ইচ্ছে করে না—উনি কি আর করবেন, বসে বসে ঝিমোন, সেই থেকে আমি আর থিয়েটার দেখতে যাই না।

যতটা সম্ভব মুখ গম্ভীর করিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, এসব না হয় শুনলাম; আচ্ছা বল তো, ঠাকুরপো তোকে কি চোখে দেখে, নিশ্চয়ই তোদের কথা হয়।

মাধুরীর চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে সলজ্জ ভাবে বলিল, যাও, তোমার সব আজে বাজে কথা! কি চোখে আবার দেখবে? শুনলে তুমি নিশ্চয়ই হেসে ফেলবে।

—কক্ষনো না। বলিয়া উমা হাসি চাপিতে চেষ্টা করিল।

মাধুরী ইহা লক্ষ্য করিল না; মৃদুস্বরে বলিল, আমিই নাকি ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছি!

উমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; মাধুরীর গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, ঠাকুরপোর যে বড্ড নিন্দে করা হচ্ছিল?

—করবো না? বড্ড দুষ্টু যে, কিছুতেই পেরে উঠি না আমি ওর সঙ্গে। বলিতে বলিতে মাধুরী লজ্জা ও আনন্দে কাঁপিতে লাগিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিরঞ্জন সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মাধুরী কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পাইল না।

নিরঞ্জন তাহা লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, দুজনে নিরিবিলি বসে কার এগেন্‌ষ্টে কন্‌স্‌পিরেসি করছিলে? আমার?

—কোনো কথা বলো না দিদি; এতক্ষণ অবধি ক্লাবে কাটিয়ে হুঁস হলো বাড়ী ফিরতে হবে! সেখানে আর জায়গা হলো না—সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে, নইলে—

—নইলে, বাড়ী এসেই বা কি করবো! আমি তো আর এ বাড়ীর মেজ-বৌ নই; হাঁ—একদিন ছিল, সবাই আদর করতো, গল্প করতো।

উমা সহাস্যে বলিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, এ তোমার ভারি অন্যায়; দুদিনের জন্য এসেছ, কবে চলে যাবে! ভাবলুম, খেয়ে দেয়ে তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করবো, ঘরে ঢুকে দেখি, মাধুরী কড়িকাঠ গুন্‌ছে!

—কড়িকাঠ গুনতে আমার ভারি দায় পড়েছে! তুমিই তো আমায় ঘুমোতে দিলে না, আমি তো শুতে যাচ্ছিলুম।

উমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, পাড়াগাঁ—ভাবলুম একা থাকতে ভয় করবে—তুমি এলে উঠে যাব। সেখানে তো একজন নল

মুখে দিয়ে কি ভাবছেন তিনিই জানেন; কার জিনিষ কাকে দেবেন হয়তো ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। তোমরা সবাই জুটেছো বেশ—বলি বিয়ে করেছিলে কেন?

মুখ যতটা সম্ভব গম্ভীর করিয়া কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত নিরঞ্জন কহিল, বেশ ছিলুম বৌদি, কত গল্পই না তোমাতে আমাতে করেছি! তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশটাই না করেছ—কোথেকে ওকে এনে জোটালে—মুখ গোঁ করেই বসে আছে। তোমার সঙ্গে যে দু চারটে কথা বলবো তাও ওর সইবে না।

রাগে গর গর করিতে করিতে মাধুরী বলিল, বেশ তো, রাত ভোর না হয় কথাই বল; আমি মার কাছে শুতে যাচ্ছি।

—তোকে কোথাও যেতে হবে না, আমিই উঠছি। বলিয়া উমা সহাস্যে মাধুরীর আঁচল চাপিয়া ধরিল। তারপর শান্ত দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিল, এ তোমার ভারি অন্যায় ঠাকুরপো—সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে; কাল থেকে দুজনকে আমি চাবি বন্ধ করে রাখবো।

নিরঞ্জনের মুখে চোখে কৃত্রিম ভয়ের ভাব! উমার কথা শেষ না হইতেই সে বলিয়া উঠিল, আটকে মারা যাব, বৌদি—দুজনের একজনও বাঁচবো না। এ বরং আসছি যাচ্ছি—ঝগড়া করছি—কথা কাটাকাটি করছি—আটকে রাখলে একেবারে হাঁপিয়ে উঠবো যে!

তাহার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া উমা আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না; অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, তোমারই দোষ—তুমিই মাধুরীর সঙ্গে গল্প কর না—ভাল করে কথা বল না।

—বলি না? আলবৎ বলি—একশবার বলি।

—এ সব ভাঁড়ামি করে লাভ কি? বলিয়া মাধুরী একপাশে সরিয়া বসিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত নিরঞ্জন বলিল, আচ্ছা বৌদি তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর, ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে, ওকে আমি রোজ জিজ্ঞেস করি কিনা—কি রান্না হবে, খোকন কেমন আছে—সর্দ্দি হলে কালী ডাক্তারকে খবর দেব কিনা—গয়লার দুধের দাম দেওয়া হয়নি কেন—ঝি আসতে দেরী করছে—গলদা চিংড়ির চেয়ে পার্সে মাছ খেতে ভাল লাগে—

—সারারাত তোমরা বসে এই সবই কর—আমার ঘুম পাচ্ছে। বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে মাধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

—যাস্‌নি, বোস। বলিয়া উমা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

তিন দিন পর।

তখনও চারটে বাজে নাই; সন্তোষের কাছারী হইতে আসিতে দেরী আছে। নিরঞ্জনের ছেলেমেয়েদের জন্য উমা কলে পোষাক সেলাই করিতেছিল।

মাধুরী ঘরে ঢুকিয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল—ঘুমে তখনও তাহার চোখ জড়ান।

উমা নিবিষ্ট মনে কল চালাইতেছিল; মাধুরীর নিঃশব্দ প্রবেশ

লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ নজর পড়াতে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কখন উঠে এলি? ঠাকুরপো এখনও ঘুমোচ্ছে?

মাধুরী কোন জবাব দিল না; বুকে বালিশ রাখিয়া শুইয়া রহিল।

উমা আবার কল চালাইতে আরম্ভ করিল; মাঝে মাঝে আড়-চোখে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

—কি রে কথা কচ্ছিস না যে বড়! ঠাকুরপো কি উঠেছে?

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মাধুরী কহিল, আজ থেকে দিদি তোমার সঙ্গে আড়ি।

সেলাইএর উপর গভীরতর ভাবে মন নিবিষ্ট করিয়া উমা গম্ভীর ভাবে বলিল, আমারও আড়ি রইল।

দশ বার মিনিট কাটিল; কেহ কোন কথা বলিল না।

—না; উঠতে হচ্ছে, মাকে মহাভারত পড়িয়ে শোনাইগে। বলিয়া মাধুরী উমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাসি চাপিতে না পারিয়া উমা মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

অন্নপূর্ণার মহাভারত পড়া শেষ হইয়াছে, তিনি নাতি-নাতিনীদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। মাধুরীকে আসিতে দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন, এসো, বসো বৌমা; নিরু ঘুম থেকে উঠেছে?

মাধুরী মাথা নাড়িয়া জানাইল, নিরঞ্জন তখনও ঘুমাইতেছে। উমার ছেলেমেয়েরা কোলে পিঠে উঠিয়া মাধুরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বড় ছেলেটাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লইয়া সে কি যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল। সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, উমা নিবিষ্টমনে সেলাই করিতেছে।

মাধুরী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি খাবার তৈরী করবো মা?

অন্নপূর্ণা সহাস্যে উত্তর দিলেন, আমি কি করে বলবো মা; বৌমাকে জিজ্ঞেস করগে।

মাধুরী হতাশ হইল; দুই তিন মিনিট একইভাবে বসিয়া থাকিয়া এক রকম জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মনমরা ভাবে সন্তোষের ঘরে প্রবেশ করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, মা জানতে চাইলেন শ্বশুরঠাকুরের জন্যে আজ কি খাবার তৈরী হবে!

উমা সে কথায় কান দিল না; সশব্দে কল চালাইতে লাগিল।

—শুধু কি কল চালালেই হবে? শ্বশুরঠাকুর এসে খাবার খাবেন না আজ?

নিবিষ্টমনে কল চালাইতে চালাইতে উমা জবাব দিল, মীটসেফে রয়েছে—ঠাকুরপোকে দাও গে।

উত্তর শুনিয়া মাধুরী আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, রাগে গর গর করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উমার আব কল চালান হইল না; ছুটিয়া মাধুরীকে ধরিয়া আনিল।

—দশ মিনিটও হয়নি! বড্ড যে আড়ি দিয়েছিলি—রাখতে পারবি না—বড়াই করিস কেন?

—পারি না বলেই তো তোমরা আমায় পেয়ে বসেছো। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি করাই উচিত।

কৃত্রিম স্বাভাবিকতার ভান করিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোর কি করেছি—দুদিন এসে কথা বন্ধ করবি?

—করবো না? তুমি যে ওঁর দলে—সব সময় সায় দিয়ে বাড়িয়ে তুলছো!

—সায় দেব না? তুই যে সব সময় ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করিস্!

—আমি করি ঝগড়া? উনিই না সব সময় উল্টে আমায় ঠাট্টা করেন।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, ওঃ! পরশু রাতের জের এখনও মেটেনি!

—কেমন করে মিটবে? সব সময় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, বলিয়া মাধুরী মুখ গোঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

উমা তাহাকে সাদরে কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিল, এই না সেদিন বলছিলি—ঠাকুরপো তোর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়; আজ আবার বলছিস, সব সময় ঠাট্টা করে; তোর হদিস্ পাওয়াই ভার! আমি মেয়েছেলে, আমিই পাই না—আর ওতো বেটাছেলে!

মাধুরী এবার আরও চটিল; জোরে বলিয়া উঠিল, টিকি দেখতে পাওয়া যায় না—কথা বলবেন কখন? বাইরে কি সব করে আসেন চাপা দেবার জন্তে ঘরে ঢুকেই ঠাট্টা সুরু করে দেন—আমি এসব বুঝি না—না? বলিতে বলিতে মাধুরীর চোখ-মুখ রাগে এবং ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সন্দিগ্ধভাবে উমা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরপো কোথায় যায় জানিস্? তাহার চিত্রার কথা মনে হইল।

—জানব না কেন? এ সব কি আর লুকোনো থাকে! কত বন্ধু রয়েছে—সেখানে রাতদিন পড়ে থাকেন।

—এরা কারা?

—প্রফেসার, তার বৌ—মেয়ে—বোন—কত সব মেয়ে-বন্ধু জুটিয়েছেন—বলা হয় বান্ধবী।

—মেয়ে-বন্ধু!

—আমি কি মিথ্যে বলছি দিদি! বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

গম্ভীর ভাবে উমা কি যেন ভাবিতে লাগিল। মাধুরী ইহা লক্ষ্য করিল না; মরিয়া হইয়া বলিতে লাগিল, প্রফেসরদের বৌদের সঙ্গে গল্পগুজব করুন—আমি কোন কথা বলতে চাই না; তাঁরা মাঝে মাঝে আমার ওখানে আসেন, আমিও তাঁদের বাড়ীতে যাই। তাঁদের মেয়েরা—অনেকের বিয়ে হয়নি! বললে বিশ্বাস করবে না দিদি—তাদের বয়েস কুড়ি পঁচিশ—কারও বা ত্রিশ পেরিয়ে গেছে! অনেক ধিঙ্গী মেয়ের বিয়েই হয়নি—বাপ-মাও নেই যে দেখবে—হয়তো কারো শালী বা ওইরকম একটা কিছু—দিনরাত তাদের নিয়ে পড়ে থাকবেন।

রুদ্ধশ্বাসে উমা জিজ্ঞাসা করিল, এদের সঙ্গে কি করে ভাব হলো?

মাধুরী বিরক্তির সহিত জবাব দিল, আমি কি করে জানবো? আমায় কি উনি কোনদিন এসব কথা বলেছেন? তুমি জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবেন।

মিনিটখানেক পরে উমা বলিল, তোর ওখানে আড্ডা বসালেই পারিস্।

—রক্ষে কর দিদি! আমায় আর ও কথা বলো না—নাজেহাল হয়ে গেছি।

উমা অবাক হইল; উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন রে? এমন করছে কেন? কি হয়েছে?

—একদিন দেখলে, একথা আর বলতে না দিদি। কত লোক যে জুটে যায়! আসছে আর যাচ্ছে! কি মাথামুণ্ড গল্প করেন ওঁরাই জানেন! হুল্লোড় লেগেই রয়েছে। চা আর চুরুটের শ্রাদ্ধ।

—শুধু কি গল্প করে ? না তাসটাসও খেলে ?

—গল্পও করে না, খেলেও না—শুধু বসে বসে নরক গুলজার করে ! থেকে থেকে হুকুম হচ্ছে, চা, চা ! ষ্টোভ ধরাতে ধরাতে আমার আঙুলে কড়া পড়ে গেছে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, এটুকুও সহ্য করতে পারবি না ? তাহলে চলবে কি করে ?

তাহার নির্ব্বিকার ভাব মাধুরী সহ্য করিতে পারিল না ; বিরক্ত হইয়া বলিল, এখানে বসে থেকে তুমি ও কথা বলছ দিদি। তুমিও সহ্য করতে পারতে না। ঘুম থেকে উঠে কলেজ না যাওয়া অবধি জোর আড্ডা চলে। কলেজে কতটুকু সময় থাকেন উনিই জানেন—যত রাতই হোক না কেন ফিরতে—বলেন, কলেজে ছিলুম ! আর বাইরে থাকলে তবু দু-এক মিনিট ওপরে এসে বসেন ; বাড়ীতে আড্ডা বসলে তো কথাই নেই, ভাবেন—বাড়ীতেই তো রয়েছি। মাপ কর দিদি, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার বাড়ীতে আড্ডা দিয়ে।

তাহার অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া উমা হাসি চাপিতে পারিল না ; অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল, বন্ধুরা তো সব সময় থাকে না ; তাদের কি কাজ নেই ? আড্ডা-দিয়ে যে যার কাজে চলে যায়, সব সময় বসে থাকে না নিশ্চয়ই ! তারপর ঠাকুরপো—

মাধুরী রাগিয়া বলিল, বসে আবার থাকে না ! থেকে থেকে হয়রান হয়ে তবেই না সবাই উঠে পড়ে ! যাবার সময় ওঁকে বাড়ী রেখে যায় মনে করছো ? মনেও ভেবো না দিদি। উনিও ভাবেন, বাড়ীতে আর কতক্ষণ বসে থাকবো—সারাদিনই তো ছিলুম, একটু ঘুরে আসিগে। একে তুমি বাড়ী থাকা বল ? তার চেয়ে আড্ডা—

মাধুরী কথা শেষ করিতে পারিল না। নিরঞ্জন বারান্দা দিয়া

যাইতেছিল, উমা সস্নেহে ডাকিল, ঠাকুরপো। সে ঘরে ঢুকিলে জিজ্ঞাসা করিল, এত রোদ্দুরে বের হচ্ছ যে?

—রোদ্দুর হলেই বা করছি কি? দেখিগে কোথাও কথা বলবার লোক পাই কি না। বলিয়া নিরঞ্জন ইচ্ছা করিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল।

উমা সহাস্যে বলিল, তোমার কি ঘরে লোকের অভাব হয়েছে নাকি?

—কি করে বলি? বললেই উনি ফোঁস করে উঠবেন! ঘুম থেকে জেগে দেখি, ঘরে কেউ নেই। ভাবলুম, ভালই হয়েছে, অনেক দিন বৌদির সঙ্গে গল্প করিনি, নিরিবিলি বসে দুজনে কথা বলবো, কত কথাই না জমে রয়েছে আমার মনে। বসে বসে কড়িকাঠ গুণতে লাগলুম, তুমি আর আমার ঘরে এলে না! হঠাৎ মনে হলো, দূর ছাই, ডেকে আনিগে; বাইরে এসে দেখি উনি একেবারে জমিয়ে বসে আছেন—আর তুমিও জমে গেছ। একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম, ভাবলুম ঘরে বসে বইটই একটা কিছু পড়িগে। বড্ড রাগ হলো আমার—ওঁর মত তো কোঁদল করতে পারি না। চুপচাপ ঘরে একলাটি বসে থাকার চাইতে, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান ঢের ভাল। সে সুনাম তো আমার চিরকাল রয়েছে—

উমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেললে! একি কলেজে লেক্‌চার দেওয়া হচ্ছে, আগে থেকে মুখস্ত করে রেখেছ?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত নিরঞ্জন জবাব দিল, লেক্‌চারই বল আর যাই বল, মনের বাঁধ খুললে এরকমই হয়।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, আর তোমার লোক খুঁজতে যেতে

হবে না। অই চেয়ারটায় বসো, আমারও তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—বেশ তো, তোমাদের আসর জমে উঠেছে, আমি মাঝখান থেকে—

—ভাঁড়ামি রেখে দিদি যা করতে বলছে কর—আমিই না হয় চলে যাচ্ছি এ ঘর থেকে। বলিয়া মাধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

উমা গম্ভীর ভাবে বলিল, তোমাদের দুজনকেই থাকতে হবে, আমার কথা শেষ না হওয়া অবধি কেউ চলে যেতে পারবে না।

ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে নিরঞ্জন চেয়ারটায় বসিল। উমা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি যত সব ধিঙ্গি মেয়েদের বাড়ীতে পড়ে থাক—যাদের বাপ-মা নেই?

প্রশ্ন শুনিয়া নিরঞ্জন চমকিয়া উঠিল, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। সে কল্পনা করিতে পারে নাই, উমা মাধুরীর সামনে তাহাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে। সে অবাক হইয়া বলিল, আমি! গার্জিয়ান-লেস্ মেয়েদের কাছে সব সময় পড়ে থাকি?

তারপর সে ক্রূর হাসি হাসিল; বলিল, এবারে বুঝলুম কেন আসর এত জমে উঠেছে!

মাধুরী একেবারে কাঁদ-কাঁদ হইল। উমা তাহা লক্ষ্য করিল না; নির্ম্মম ভাবে বলিয়া উঠিল, কথাটাকে ও ভাবে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো না ঠাকুরপো, সত্যি কি মিথ্যে জবাব দাও।

উমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইল; থতমত ভাবে বলিয়া ফেলিল, তুমিও কি এসব কথা বিশ্বাস কর, বৌদি?

সন্দিগ্ধ ভাবে উমা মাধুরীর দিকে চাহিল।

মাধুরী মরিয়া হইয়া কঠিন স্বরে কহিল, দিদিকেও ফাঁকি দিতে

চাচ্ছ ! লতিকা দেবী না কে—তার ওখানে রোজ সন্ধ্যে বেলায় তুমি যাও না ?

নিরঞ্জন এবার আত্মস্থ হইল ; বলিল, মিস্ গুপ্ত ? তাঁর ওখানে যাব না ! যাই বই কি—রোজ নয়।

মাধুরী ও উমার দৃষ্টিবিনিময় হইলে উমা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এই লতিকা দেবীটি আবার কে—বলতে বাধা আছে কি ?

—পবির ক্লাসফ্রেণ্ড ; এক সঙ্গে এম-এ পড়েছে।

—কি করেন তিনি ? বিয়ে হয়েছে ?

—কর্পোরেশনের স্কুল ইন্সপেক্‌ট্রেস্ ;—বিয়ের কথা হয়েছিল, হয়নি।

—কোথায় থাকেন ? কার কাছে থাকেন ?

—পবির সঙ্গে এক বাড়ীতে, এক ঘরে নয়।

উত্তর শুনিয়া উমা স্তম্ভিত হইল।

মাধুরীর চোখে ক্রূর হাসি ; অর্থ—দেখলে, আমি সত্যি কথা বলিনি ?

এই অতর্কিত আঘাত সামলাইয়া লইতে উমার কয়েক মিনিট কাটিল। তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ রুদ্ধ নিশ্বাসের সহিত বাহির হইল ; পবি ঠাকুরপোর শেষটায় এই হলো ?

তারপর সে নিদারুণ দুঃখে বলিয়া উঠিল, তুমিও গিয়ে জুটেছ সেখানে ! কাজটা কি তোমাদের ভাল হচ্ছে ?

নিরঞ্জন একেবারে মুস্‌ড়িয়া গেল ; মুখ কালো করিয়া জবাব দিল, সব কথা তোমায় খুলে বলবো বলে—তোমায় খুঁজছিলুম বৌদি।

হতাশার স্বরে উমা বলিল, বেশ বল, আমি সব কথা তোমার শুন্‌ছি, একটা কথাও লুকিয়ো না, আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। বলিয়া উমা একটা বালিশ বুকে চাপিয়া ধরিল।

স্বামীর ইঙ্গিতে মাধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। উমা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, সোজা হইয়া বসিল; তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, না, মাধুরী এখানে বসে থাকবে, ওর সামনে তোমায় সব কথা খুলে বলতে হবে। এ সব আমার মোটেই সহ্য হয় না। শেষকালটায় কি তুমি ওকে মেরে ফেলবে, দেখছো না—ভেবে ভেবে একেবারে সারা হয়ে গেছে!

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া নিরঞ্জন কহিল, আমার কি দোষ এখনো আমি বুঝে উঠতে পারছি না। না হয় ধরেই নিলুম, পবি একেবারে বয়ে গেছে।

—দোষ নেই! তুমি ওখানে যাও কেন?

—না যেয়ে কি পারি? পবি যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তুমি তো সবই জান বৌদি। কেন আমায় দুষছো? পবিরও এতে হাত ছিল না—

উমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের হাসি। সে নির্ম্মম ভাবে বলিয়া উঠিল, লতিকা দেবী স্বইচ্ছায় পবি ঠাকুরপো না ডাকতেই তার ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে, না? বেশ বলই না, তিনি কি করে এসে জুটলেন?

নিরঞ্জন করুণ স্বরে বলিল, আজ নয় বৌদি; তুমি বড্ড বেশী এক্‌সাইটেড্‌ হয়েছ—আর একদিন ধীরে সুস্থে বলবো।

মিনিট খানেক চিন্তা করিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, বেশ, তুমি সেখানে গিয়ে কি কর?

—গল্প করি, যেমন তোমার সঙ্গে, তেমনি মিস্‌ গুপ্তের সঙ্গে, সব রকম কথাই হয়ে থাকে।

উমার চোখে হাসি; সে শান্ত দৃষ্টিতে মাধুরীর দিকে তাকাইল।

হাসি দেখিয়া মাধুরী জ্বলিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, তুমি তো

হাসবেই দিদি। বড়ঠাকুর এরকম করলে, এ হাসি তোমার বের হতো না। সে নির্ম্মম ভাবে বলিয়া উঠিল, সেখানে যাবার ওঁর দরকার কি? আর গল্প করাই বা কেন? সব তাতেই ওঁর বাড়াবাড়ি, যেন পবিত্রবাবুর আর কোন বন্ধু নেই; হলেই বা ছেলেবেলার বন্ধু, লতিকা দেবী তো তাঁর স্ত্রী নন্!

তাহার কথার ঝাঁঝে দুইজনই হাসিয়া ফেলিল। এ হাসি মাধুরীর অসহ্য হইল; সে বিরক্ত ভাবে বলিল, এ হাসির কথা নয় দিদি! জানো এ থেকে কত বড় সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে?

উমা একটু অপ্রতিভ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, কি সর্ব্বনাশ হতে পারে, আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

মাধুরী একেবারে মরিয়া হইয়া, নির্ম্মম বিদ্রূপ করিল, দিদি, তুমি কি মেয়েমানুষ?

উমা হতভম্বের মত বার বাব স্বামী এবং স্ত্রীব মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, তাহাদের ভিতরে পরস্পর বিরোধিতার কারণ জানিতে চেষ্টা করিল, বুঝিতে পারিল না।

ম্লান হাসিয়া নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, মাধুরী কি ভাবছে বলবো আমি?

উমা কিংবা মাধুরী কোন কথা বলিল না।

—মিস্ গুপ্তকে যদি পবি বিয়ে করতো আর আমি যদি সেখানে যেতুম মাধুরী হয়তো সেটা সহ্য করতে পারতো। বলিয়া সে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া মাধুরী ইহাতে সম্মতি জানাইল। উমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে কেন হবে? বিয়ে না করলে যে ভয়, বিয়ে হলেও সেই ভয়; কম কোথাও নেই, অবশ্যি ভয় যদি করতেই হয়।

—এ কথা ওকে জিজ্ঞেস কর ; বলিয়া নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল।

মাধুরী সে কথায় কান দিল না, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, মাধুরী ভাবছে, বিয়ে হলে মিস্ গুপ্ত আমার ওপর আর নজর দিতে পারবে না ; আর যদি দেয়ই তাতেও বড় একটা সুবিধা করতে পারবে না, তার বিয়ে করা স্বামী পবি রয়েছে, সমাজ রয়েছে, আইন রয়েছে। এখন তো আর এসব বালাই নেই ! ওর সব চেয়ে ভয় হচ্ছে, যে মেয়ে জোর করে এসে পবির ঘাড়ে চেপে বসতে পারে, আমার মত একটা নিরীহ প্রাণীর ঘাড় মটকাতে তার বেশী দেরী লাগবে না। বিয়ে হলে ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠবে না। এতেও অবশ্য সব সময় ওর মন খুঁত খুঁত করবে, তবু তো খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

শেষের দিকে নিরঞ্জন তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। উমাও সে হাসিতে যোগ দিল।

মাধুরী অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, আচ্ছা দিদি, তুমিই বল না, বিয়ে না করে যা পারে, বিয়ে করে কি কেউ তা পারে ? একি কখনো হতে পারে ?

উমা তাহারি সরলতায় মুগ্ধ হইল, সস্নেহে বলিল, বিয়ে করে যেটা পারবে না, বিয়ে না করে সেটা পারবে কি করে—তুইই বল না ?

এ কথার কি উত্তর দিবে মাধুরী ভাবিয়া পাইল না। সে বলি বলি করিয়াও বলিল না, লতিকাই ইহার এক মাত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু বিবাহ করিলে যে সে আর পারিবে না, ইহাই বা কেন হইবে ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

—কিরে চমকে উঠলি যে বড্ড ? বল্ না, কেন পাববে না ?

—ওকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই বৌদি। আজকালকার

মেয়েরা বুঝবে না এ সব কথা ; বোঝালেও বুঝতে চাইবে না, এটাই হচ্ছে এখনকার ধরণ ; বলিয়া নিরঞ্জন হাসিয়া উঠিল।

উমা সহাস্যে বলিল, কেন বুঝবে না ? ভাল করে বুঝিয়ে বললে সবাই বোঝে—কথাটা তো কিছু শক্ত নয়।

নিরঞ্জন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে নির্ম্মম ভাবে বলিল, বোঝালেই কি সবাই বুঝতে পারে ? বোঝবার শক্তি থাকা চাই।

—বড় বড় কথার বেলায় তোমার কথা হয়তো সত্যি।

—ভুল বৌদি, সব ভুল। ঢের ঢের মেয়ে আমি দেখেছি—বুঝিয়ে কোন লাভ নেই।

—বেটাছেলের ভেতরেও আমি কমতি দেখছি না !

—সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। আমি যাদের কথা বলছি বৌদি—তাদের খুব টনটনে বুদ্ধিশুদ্ধি, যা তোমার আমার নেই—লেখাপড়াতেও কমতি যায় না—এম-এ, বি-এ—এই সব। বিলেত-ফেরতও যে নেই এমন নয়। কিন্তু হলে কি হবে—মুড়ি-মিছরির এক দর।

উমা একটু হাসিল, বাধা দিয়া বলিল, বোঝালে কেন বুঝবে না—একথার জবাব এখনও হয়নি, ঠাকুরপো। সে কথা না শুনে মেয়েদের বিরুদ্ধে তোমার এসব কথা মেনে নিতে আমি মোটেই রাজি নই, তুমি জান।

স্রোতের মুখে বাধা পাইয়া নিরঞ্জন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, লিবার্টি আর গ্যালাণ্ট্রি এ দুটো একসঙ্গে কক্ষনো চলতে পারে না ; আজকালকার মেয়েরা এখানেই সবচেয়ে বড় রকমের একটা ভুল করছে—বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা—

উমা বাধা দিয়া সহাস্যে কহিল, একটু রয়ে সয়ে ঠাকুরপো, মাধুরী

জানলেও এখানে নয়—তোমার ইংরেজি বুকনিগুলো আজকের মত তুলে রাখ।

নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এ কথাগুলো তো আজকালকার সব মেয়েই জানে—এ বুকনি সব সময়ই তারা ঝাড়ছে।

—বড্ড ভুল করছো ঠাকুরপো। আমি একেবারে সেকেলে। বলিয়া উমা হাসিতে লাগিল।

তাহার কথা শেষ না হইতেই নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, এরা মুখে চাইবে স্বাধীনতা আর করবে ফ্লার্ট; শ্রদ্ধা এরা চায় না পুরুষের কাছ থেকে।

উমা বিরক্ত হইল; বাধা দিয়া বলিল, ফ্লার্ট! সে যে বড্ড খারাপ কথা!

নিরঞ্জন উত্তেজিত ভাবে বলিল, কথাটা হয়তো—হয়তো কেন—শুনতে খারাপ; তবু আমি বলবো—তারা সবাই ফ্লার্ট করছে। যে কোন লেখাপড়া-জানা মেয়ে—বি-এ, এম-এ তুমি বেছে নিও—আমি দেখিয়ে দেব, কত বড ফ্লার্ট সে। স্বামী সে চায় না—সে চায় লাভার—সে সব সময় তাব সঙ্গে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ করবে। সে চাইবে—তরুণ বলে একদল ছেলে—সব সময় তার স্তবগান করবে; সব সময় তাকে ঘিরে বসে থাকবে। যেমন চাইছে, পাচ্ছেও তেমনি; যে সব ছেলের একটুও পুরুষত্ব আছে, তারা এদের দিকে ফিরেও তাকায় না। এদের সঙ্গে সবাই ফ্লার্ট করে—রঙ্গরসিকতা করে; কিন্তু বিয়ে করে বেছে বেছে, তোমারই মত সেকেলে মেয়েকে। কেন করে জান?

রুদ্ধশ্বাসে উমা উত্তর দিল, না।

—এর কারণ হচ্ছে, এসব মেয়েকে ছেলেরা শ্রদ্ধা করে না; শ্রদ্ধা

করবার কিছু এদের ভেতরে পায় না—এরা যে সব কলের পুতুল। স্বাধীন হতে যে চাচ্ছে, তার ভেতরে থাকবে তেজ—সে বেটাছেলেই হোক আর মেয়েই হোক। ভেতরে তেজ যার নেই, তাকে কোনদিন কোন লোক শ্রদ্ধা করে না ;—শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা হয় না।

উমা সহাস্যে বলিল, বড্ড দূরে চলে যাচ্ছ ঠাকুরপো, একটু সামলে।

নিরঞ্জন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, আজকালকার মেয়েদের স্বাধীনতার মানে হচ্ছে, স্বামীর সব কাজে ইন্‌টারফিয়ার করা। সে জানতে চায়—স্বামী কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। স্বামী হয়তো সব কথা তাকে খুলে বলতে চায়, পারে না ;—বলে বলে সে হয়রান হয়ে গেছে—বললেই উল্টো ফল! বাবা মাকে তো সব সময় দেখছো—এত বড় একটা কাণ্ড হয়েছে—ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারছে না। কত মেয়েছেলে এসে মাকে কত কথাই না বলেছে। মা যদি মাধুরীর মত সব সময় সব কথা জানতে চাইতেন—বাবাকে মেয়েদের টাকা দিয়ে দিতে বলতেন—বাবা সে কথা না রাখলে বাড়ীতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলতেন—বাবা বেচারা যান কোথায়! আমি অবশ্য বলছি না—মাধুরী এ রকম করে—ওটা একটা কথার কথা।

একটু চিন্তা করিয়া উমা বলিল, এসব তো বাইরেকার কাজের কথা?

—কোনটা কাজ আর কোনটা অকাজ মাধুরী বুঝবে কি করে? স্বাধীনতার সুখও যেমন দুঃখও তার চেয়ে বড় কম নয়। সে কালের বুড়িরা স্বামীকে চিন্‌তো, বুঝতো, আজকালকার মেয়েরা স্বামীকে জানে না, বুঝতে চেষ্টাও কেউ করে না। সেজন্য স্বামীর কাছ থেকে অশ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়ে আসে। সব সময়ই আবদার করবে, তার কথা রাখতে হবে। কেন? সে কি জানে, কি বলে স্বামী তার কথা

রাখবে? সত্যিকার স্বাধীনতা যদি মেয়েরা চায়, তাকে শক্ত হতে হবে। এসব ছোট খাট ব্যাপার ঝেড়ে ফেলতে হবে; নইলে নিজেও মরবে, স্বামীকেও হারাবে সে।

রুদ্ধশ্বাসে উমা জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েদের সত্যিকার স্বাধীনতা তুমি কাকে বলছো ঠাকুরপো?

—এজ অব শিভ্যালরি আর নেই। আমি দুর্ব্বল, আমি কোমল, ফুলের ঘা সহ্য করতে পারি না বলে মেয়েদের আর পুরুষের মন ভোলাতে চাইলে চলবে না। পুরুষ চায় সুস্থ সবল সঙ্গিনী—যে সব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে পারবে। দেখছো বৌদি, চারদিকে আজ কত দুঃখ দৈন্য। পুরুষকে কত ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে আজ যেতে হচ্ছে। এ যাত্রা-পথের সহযাত্রী সে চায়, যে হাসিমুখে সব দুঃখ দৈন্য বরণ করে নেবে। শুধু নেবে না; এ দুঃখ সইবার শক্তি তার থাকবে দেহে ও মনে, কিছুতেই সে ভেঙে পড়বে না। এরকম মেয়েও বাঙলা দেশে রয়েছে, একটি দুটি নয়, হাজারে হাজার। কিন্তু তারা আর ঘর-কন্না করতে চাচ্ছে না; হয়তো মনের মত পুরুষ পাচ্ছে না, যাকে আত্ম-দান করবে। কিন্তু যারা ঘরকন্না করছে, স্বাধীনতা কথাটার মানে না বুঝে সব সময় গোল পাকাচ্ছে।

—গোল পাকাচ্ছে কি রকম?

—কেন নয়? মাধুরীকে তো দেখছো; ও কি দুর্ব্বল? ওর কি মনে কোন তেজ নেই? আছে বলেই না, আমি ওকে এত শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। ও যে দুর্ব্বল নয়, ওর যে তেজ আছে, মাধুরী জানে না। জানে না বলেই না, দিন দিন আমার আর ওর নিজের কি ক্ষতিটাই না করছে। এ মান অভিমান ওর জন্য নয়, এ সব হচ্ছে যারা দুর্ব্বল ওই তাদের জন্য—যাদের এটাই হচ্ছে একমাত্র সম্বল।

—তা হলে মাধুরী কি করবে ? ওর এতে দোষ কি ? বুঝতে পাচ্ছে না—

নিরঞ্জন একেবারে জলিয়া উঠিল, এ ক্ষুদ্রতা মাধুরীর শোভা পায় না। ও কি জানে না, বুঝতে পারে না, বেটাছেলে সব সময় মেয়েদের আঁচল ধরে বসে থাকতে পারে না, একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু বেটা-ছেলে কেন ? মেয়েদেরও তেমনি ; সব সময় মুখোমুখি বসে থেকে দুজনের কেউই সুখী হতে পারে না। আনন্দ পায় না। দুজনকেই বাইরে বের হতে হবে, মিশতে হবে সবার সঙ্গে ; বন্ধু তার পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক কিছু আসে যায় না।

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অন্নপূর্ণা সস্নেহে বলিলেন, বৌমা, বেলা যে একেবারে পড়ে গেছে।

নিরঞ্জন সেই প্রশান্ত দেবীমূর্ত্তির দিকে নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের সমস্ত উত্তেজনা সসম্ভ্রমে স্তিমিত হইল।

সমাধি

১

—আফিস নেই বলে কি, আজ স্নানাহারও নেই ?

—চান করবো বইকি ;—এরই ভেতরে হয়ে গেল ? বলিয়া পবিত্র সহাস্যে লতিকার মুখের দিকে চাহিল।

—আর বসে থাকবেন না ; উঠুন, অনেক বেলা হয়েছে। লতিকা উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

পবিত্র বার দুই তিন হাই তুলিল, বলিল, রোজই তো আফিসের তাড়া, আজ না হয় একটু দেরীতে খেলুম।

—না, না, আর দেরী করলে চলবে না; আমার হাতে অনেক কাজ।

—বেশ তো, আপনি না হয় খেয়ে নিন না? বলিয়া পবিত্র পুনরায় নিবিষ্ট মনে বই পড়িতে লাগিল।

লতিকা হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; মনে মনে বলিল, না এঁকে আমি আজ অবধি চিনে উঠতে পারলুম না।

মিনিট পনর ওইভাবে কাটিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া পবিত্র বলিল, আপনি এখনও এখানে বসে রয়েছেন! যান্, চান করে খেয়ে নিন্‌গে,—কেন মিছিমিছি কষ্ট করবেন, আমার এখনও ঢের দেরী—সবে বইখানা নিয়ে বসেছি—চমৎকার বই!

লতিকা অত্যন্ত বিরক্ত হইল; দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পবিত্র পিছন হইতে ডাকিল, মিস্ গুপ্ত! একটিবার শুন্‌বেন কি?

লতিকা ফিরিয়া আসিলে পবিত্র করুণ স্বরে বলিল, যদি অসুবিধে না হয়—কাইগুলি এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন—একটু ষ্ট্রং করে।

ভিতরে ভিতরে লতিকা জ্বলিতেছিল, বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না; মৃদু তিরস্কারের স্বরে উত্তর দিল, এত বেলায় চা খাবেন! বারটা বেজে গেছে! তার চেয়ে চান্ করে খেয়ে আবার না হয় বই নিয়ে বসবেন!

পবিত্র সহাস্যে জানাইল, অসুবিধা থাকিলে তাহার চায়ের আবশ্যক নাই। লতিকা গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর দ্রুতগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পার্ক সার্কাসে একটা চারতলার ফ্ল্যাট। বরাবর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ফ্ল্যাটে ঢুকিতেই সামনে পড়ে পবিত্রের ঘর; তারপর লতিকার কামরা। পাশাপাশি ঘর—মাঝখানে একটা ছোট দরজা—কখনো খোলা, কখনো বন্ধ। ছিটুকিনিটা লতিকার ঘরে; পবিত্রের ঘর হইতে খোলা অথবা বন্ধ করা যায় না। সেদিকটায় একটা মোটা সবুজ বনাতের পর্দ্দা ঝোলান। লতিকার ওপাশে রান্নাঘর; তারপর গোসলখানা।

একটা বয়;—সেই সব কাজ করে—পাঁচতলার চিলে কোঠায় আড্ডা লইয়াছে।

পবিত্র পড়ে আর ভাবে, বড় একটা কথা বলে না। মাহিনার টাকা লতিকার হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্ত; কি দিয়া কি হয় কোন খোঁজ-খবর রাখে না।

লতিকার অফুরন্ত সময়, কিছুতেই কাটিতে চায় না। দুই বেলা রান্না করে;—বই বড় একটা ছোঁয় না। একটা-দেড়টার সময় রোজ ইন্‌স্‌পেক্‌শনে বাহির হয়, তিনটা চারটার পর বাড়ী ফিরে। পবিত্রের ছুটি, পাঁচটায়; যেদিন অলডারম্যান আর কাউন্‌সিলারদের কোন মিটিং থাকে সেদিন ফিরিতে একটু রাত হয়।

লতিকা চা আনিল।

পবিত্র চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছিল; বইখানা তার বুকের উপর খোলা। মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লতিকা মৃদুস্বরে বলিল, চা।

পবিত্র তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিল, অপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল, আপনি নিজে নিয়ে এলেন! বয়কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হতো? বড্ড বেলা হয়েছে যে!

লতিকা মনে মনে বলিল, সেদিকে হুঁস থাকলে আজ আমার এদশা

হবে কেন। প্রকাশ্যে একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, এতে আর কি হয়েছে? নিজ হাতে চা করতে পারলুম—নিয়ে আসতে পারবো না!

—যান্, আর দেরী করবেন না, খেয়ে নিন্ গে; বলিয়া পবিত্র গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালা মুখে ঠেকাইল।

লতিকা সেখানে আর দাঁড়াইল না। বাথরুমের দিকে যাইতে যাইতে হতাশ হইয়া ভাবিল, এভাবে আর কতদিন চলবে!

গোসলখানার আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া লতিকা চমকিয়া উঠিল। কি বিশ্রী চেহারা হইয়াছে! মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; চোখের কোণে কালী—কি মোটা আর পুরু! গলা একেবারে সরু—একটু জোরে চাপ দিলে—ঘাড় মটকান যায়। দেহের মধ্যভাগ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। বুকের কাপড় তুলিয়া লতিকা দেখিল, হাড়কখানা আঙুলে গোনা যায়। জেল হইতে বাহির হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে সে আপনি মুগ্ধ হইয়াছিল;—বালীগঞ্জেও বেশ ছিল। আর এখানে আসিয়া তাহার এরকম অবস্থা হইবে, লতিকা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ভোরবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে তাহার ইচ্ছা করে না। ঘুম ভাঙিলেই মন বিষাইয়া উঠে। বেশীক্ষণ আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারে না। পবিত্র চায়ের জন্য অপেক্ষা করে—মুখ ফুটিয়া চায় না। স্বয় বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে—রান্নাঘরে যাইতে পারে না;—ইচ্ছা না থাকিলেও লতিকাকে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। বাথরুম হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পবিত্রকে সুপ্রভাত জানায়। তাহার ঘর গুছাইয়া রাখে—অন্যান্য কাজ করে; নিজের চেহারা ভাল করিয়া দেখার সময় পায় না। এ কয়মাসে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—চোখে ঝাপসা দেখে; এক ঘর হইতে আর এক ঘরে গিয়া ফিরিয়া আসিতে ক্লান্তি বোধ করে।

ক্রীমের কৌটা সামনে রাখিয়া লতিকা ভাবিল, এসব ছাই পাঁশ মুখে মেখে কি হবে! উনি তো মুখ তুলে একবারও তাকাবেন না। রাগে ও ক্ষোভে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে আপন মনে বিড় বিড় করিতে লাগিল পথে বের হলে, লোকগুলো হাঁ করে চেয়ে থাকে;—কি সব জঙ্গলি ভূত! মেয়েছেলে যেন কোনদিন দেখেনি! আর কেইবা এখানে আসে? নিরঞ্জনবাবু খাসা লোক। তাঁর সামনে সেজেগুজে বের হবো? ছিঃ! কি মনে করবেন তিনি? এমনি তো আজকাল ফ্যাশন্-দুরস্ত মেয়েদের দেখতে পারেন না। চিত্রার দুঃখ তো ঐজন্য—একবারও তার পানে ফিরে চাইলেন না।

লতিকা আবার ক্রীমের কৌটা তুলিয়া লইল; দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ক্ষয় হওয়াতে, মরিয়া হইয়া নিজেকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করিল।

মিনিট পনর পর সে পা টিপিয়া পবিত্রের ঘরে প্রবেশ করিল।

পবিত্র নিস্তব্ধ;—চোখ মুদিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে।

নিজের প্রতি নিদারুণ অশ্রদ্ধায় লতিকার মন বিষাইয়া উঠিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি তাহার আর রহিল না। টলিতে টলিতে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

২

মিনিট পনের পর নিঝুম ভাব কাটিলে, লতিকা আবার পা টিপিয়া দরজার কাছে গেল।

পবিত্র তেমনি নিস্তব্ধ ; টেবিলের উপর বই খোলা, সে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

স্তব্ধ হইয়া লতিকা ভাবিল, এ ধ্যান ভঙ্গ সহজে হইবে না।

নিরাশায় আহত হইয়া সে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল।

হঠাৎ লতিকার মনে হইল, পাশের ঘরে যেন একটা সাড়া পাওয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিল, শ্বাস রোধ করিয়া পরদার আড়াল হইতে উঁকি মারিল ; পবিত্র তেমনি স্তব্ধ, তেমনি ধ্যানমগ্ন।

লতিকা আর বসিতে পারিল না, বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

বার কয়েক হাঁটাহাটি করিয়া লতিকা থমকিয়া দাঁড়াইল। পবিত্র জাগিয়া দেখিবে, সে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। লতিকা আবার ঘরে আসিয়া বসিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, এ কি নিদারুণ নিঃশব্দ অত্যাচার! কেন আমায় এখানে টেনে নিয়ে এলো? কি করেছি আমি? একদিন নয়, দুদিন নয়, ছ-ছ মাস কেটে গেল। আর কদ্দিন সহ্য করবো? আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না। লতিকার দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। বেশ তো ছিলাম বৌদির ওখানে ; আমায় কেন—কেন নিয়ে এলো? ডেকে এনে, এ ভাবে কষ্ট দেওয়ার অধিকার

তাকে কে দিয়েছে ? আমি ? কক্ষনো না। না-না ;—আমি দিইনি। আমিই দিয়েছি। হাঁ-হাঁ-আমি—আমি নিজে থেকে।

—ওঃ! কেন দিলুম ? কেন দিলুম এ অধিকার ? কেন এলুম এ পাষাণ-পুরীতে ? এলুমই যদি, নিজের সর্ব্বনাশ কেন করলুম না ? —দেবতা না পাষাণ ?—পাষাণেও প্রাণ আছে, এর যে সেটুকু অবধি নেই ! পাথরও ছোঁয়াচ লেগে তেতে ওঠে।—সয়তান ? কক্ষনো না। একটিবার মুখ তুলে তাকাননি আমার পানে ! দুঘরের মাঝখানকার দরজা দুপুর রাত অবধি খুলে রেখেছি, ইচ্ছে করে। অথচ একদিনও পর্দ্দা সরিয়ে দেখেননি। সারারাত জেগে রয়েছি আমি—ভয়ে, ভাবনায়, আশায়, আশঙ্কায়। কিন্তু না, একদিনও না।—কেন এরকম করেছি আমি ? কি করেন দেখবো বলে ? কক্ষনো না। সে রকম তো কোন কথা হয়নি।—হাঁ, হয়েছে। কথা রয়েছে, দুজন যা খুসী করবো, অথচ কেউ কাউকে ভালবাসব না। আমিও না, উনিও না।—নিছক পাগলামি ! ভাল না বেসে—হাঁ পারে। পারে সয়তান ! আর পারে দেবতা।—কেন এলুম জানি না।—বৌদিকে বলেছিলাম ? কী বলেছিলাম ?—হাঁ, বলেছিলাম বই কি,—কেন এলুম।—সব ভুল। সে শক্তি আমার নেই ; ওঁর আছে। ইচ্ছে করলে উনি সয়তান হতে পারেন, দেবতা হতেও ওঁর বাধে না। আমি পারি না ; দেবতা হতে তো নয়ই, সয়তান হতেও না। আমি যে মানুষ, বড্ড দুর্ব্বল !—হাঁ, বড্ড দুর্ব্বল আমি। আমি চাই একজনকে যাকে জড়িয়ে ধরে আমি বেঁচে থাকবো।—শিশিরকে পেয়ে ভেবেছিলাম ঘর বাঁধব। শিশিরকে হারালুম, একেও পেলুম না।—সেভাবে পাব না, আমি জানি। সেভাবে আমি চাইওনি। প্রাণ আমার শিশিরকে দিয়ে ফেলেছি। সেটাকে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সেটা যে শিশিরের।—দেহ ?

একবার 'দিয়েছিলুম, শুধু একটিবার ভুল করে। এবার দিতে চাচ্ছি ইচ্ছে করে। হাঁ; ইচ্ছে করে বই কি।—কিন্তু কেন দেব? দিতে কি আমি আর পারি? একবার একজনকে যেটা দিয়ে ফেলেছি সেটা আবার আর একজনকে কি দেওয়া যায়? কেন যাবে না? দেহ যে তাই চাইছে। নইলে কি আর ছুটে আসতুম এখানে? প্রাণ যে আমার আজ অবধি শিশির শিশির কচ্ছে।—দেহকে প্রাণ মানা করে না কেন? তাহলে ত আমায় এত কষ্ট পেতে হতো না।—আগে করতো; এখন আর করে না। কি করে মানা করবে? প্রাণ যে একটিবার পেয়েই সুখী। দেহ এতে খুশী হবে কি করে? প্রাণের আশা মিটলেও, দেহের মিটতে চায় না।—প্রাণ একটিবার পেয়েই চিরকালের জন্য পেয়ে বসে রয়েছে।—দেহের ক্ষুধা কোনদিন মিটতে চায় না, তাই—; তাই বই কি; নিশ্চয়ই তাই।—কি. ভাবছেন উনি চোখ মুদে? ওঁর স্ত্রীর কথা? এ ধ্যান ওঁর আমি আজ ভেঙে দেব।

লতিকা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। ছুটিয়া পবিত্রের ঘরের দিকে গেল; দরজার সামনে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আবাব সে ফিরিয়া আসিল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিযা উঠিল, না। এ ধ্যান আমি কিছুতেই ভাঙব না। না, না, কিছুতেই না। আমি কে? কেন উনি আমার কথা ভাববেন?

লতিকা হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।

মিনিটখানেক পর লতিকা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; ভয়ে তাহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া পবিত্রেব নিকটে গেল, তাহার মুখের কাছে হাত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, না, শ্বাস ঠিক তেমনি বইছে। তাবপব অনিমেষ নয়নে পবিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পবিত্রের কি প্রশান্ত সুন্দর মুখ! প্রাণের গভীরতম প্রদেশে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে।

লতিকা সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না। টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার তন্দ্রা আসিল।

৩

—লতিকা!—লতা!—লতি!

লতিকা আচমকা জাগিয়া উঠিল। ভাবিল, স্বপ্ন দেখিতেছে। এবাব সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল;—লতিকা!—লতি!

কোন প্রকারে বস্ত্র সংযত করিয়া লতিকা দ্রুতগতিতে পবিত্রের ঘরে প্রবেশ করিল। পবিত্রের চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি! স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

কম্পিত বক্ষে লতিকা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, আমায় আপনি ডাকছিলেন?

—লতিকা!—লতা! তুমি এখনো আমার কাছে এলে না! আমি যে আর পারছি না!

—এই যে আমি এসেছি! বলিয়া লতিকা পবিত্রের হাত ধরিল।

—তুমি এসেছ লতি! আজ আমার বড্ড আনন্দ হচ্ছে। এত আনন্দ—আমি রাখতে পারছি না! তুমি এসেছ! আজ আমি সব পেয়েছি! সব পেয়েছি! বলিয়া পবিত্র লতিকাকে বুকে টানিয়া লইতে চাহিল।

লতিকা তাহার হাত ছাড়িয়া দিল; ভীত চকিত ভাবে দু পা পিছনে সরিয়া গেল।

—ভয় পাচ্ছ তুমি! কেন এত ভয় পাচ্ছ? আমি যে আজ সব পেয়েছি!

লতিকা ভয়ে আড়ষ্ট হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, ভেবে ভেবে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনি একটু শান্ত হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসুন; বয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আপনাকে ভাল করে চান্ করিয়ে আনবে।

—যেও না, দাঁড়াও!

তাহার অস্বাভাবিক আহ্বান শুনিয়া লতিকা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তোমায় ডেকেছি কেন জান?

চিত্রার্পিতের ন্যায় লতিকা উত্তর দিল, না।

—তোমায় ডেকেছি, আজ বলতে, আমি আজ কি পেয়েছি!

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, কি পেয়েছেন আপনি?

—আমি আজ সব পেয়েছি! সব পেয়েছি আমি!

এক পা দু পা অগ্রসর হইয়া লতিকা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি সব পেয়েছেন, আমায় আপনি বলবেন না?

—আমি তোমায় পেয়েছি! আমায় পেয়েছি! প্রতিমাকে পেয়েছি!—আমি সব পেয়েছি আজ! সব! সব! কোথাও কিছু পেতে আমার বাকি নেই!

পবিত্রের মুখ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উজ্জ্বল হইল। লতিকার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। আশা ও আনন্দে তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল।

পর মুহূর্ত্তে লতিকা দেখিল, সব পেয়েছি—সব পেয়েছি বলিতে বলিতে পবিত্র চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

বয় বাড়ী ছিল না; খাওয়া দাওয়া করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নীচের তলাকার লোকদের ডাকিতে লতিকার সাহস হইল না, তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় অবধি হয় নাই।

লতিকা ছুটিয়া গিয়া পবিত্রকে জড়াইয়া ধরিল, আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, আপনি ওরকম করবেন না, আমার বড্ড ভয় করছে।

—প্রতিমা! তোমার ভয় করছে, প্রতিমা?

—প্রতিমা আমি নই। লতিকা। লতি।

—প্রতিমাই লতিকা। লতিকাই প্রতিমা। আমি সব পেয়েছি। আমায় ভয় করছো কেন তুমি?

লতিকা তাহাকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইল, পাখাটাকে জোরে চালাইয়া দিল। ভয়ে ও দুঃখে তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

—তুমি কাঁদছো! কাঁদছো কেন তুমি?

—কাঁদবো না? আমার মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে!

—বেশ, এই আমি স্থির হয়ে বসলুম। বলিয়া নিঃশব্দে পবিত্র চোখ মুদিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! লতিকা স্তম্ভিত হইল।

পবিত্রের মুখমণ্ডল আনন্দে আরও উজ্জ্বল হইল। লতিকা বিস্ময়ে অভিভূত হইল, ভাবিতে পারিল না কি করিবে।

—আবার সেই ধ্যান! কয়েক মিনিট পর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইবে।

লতিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া অবরুদ্ধ ধ্বনি উত্থিত হইল, আবার সেই ধ্যান! আবার ধ্যানে বসলেন!

পবিত্র চোখ মেলিল, শান্ত নয়নে লতিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

লতিকা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; করুণ স্বরে বলিল, কি বলতে চেয়েছিলেন, বলুন,—চুপ করে রইলেন যে?

—সব ভুলে গিয়েছি।

—না, না, ভুললে চলবে না; ভুলতে আমি আপনাকে দেব না। আমায় আপনি পেয়েছেন, বলেছেন। কি করে আমায় পেলেন—আপনাকে বলতেই হবে।

—তুমি, আমি, প্রতিমা—সবাই এক। একই সাগরের বিভিন্ন তরঙ্গ। সাগর এক। তরঙ্গ বিভিন্ন হলেও এক। তোমায় আমি পাইনি?

লতিকা তাহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

—সব ঢেউ আলাদা। সাগর এক। ঢেউ নিয়ে সাগর। সাগর নিয়ে ঢেউ। সব ঢেউ আলাদা। সব ঢেউ এক। কিন্তু বড্ড কষ্ট।

লতিকা চমকিয়া উঠিল, করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি কষ্ট? কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন, বলবেন না আমায়?

লতিকা করুণ নয়নে পবিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কষ্ট আমার নয়, আমার আজ বড্ড আনন্দ হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে মানুষের, কি নিদারুণ দুঃখ।

—এ দুঃখ তো চিরদিন রয়েছে, চিরকাল থাকবে।

—কেন এ কষ্ট থাকবে? মানুষ মনে করে সে একা, আর কেউ নেই। কেন থাকবে না? মানুষ এক। মানুষ অনেক। সবাইকে নিয়ে একটি মালা। এ মালা সুন্দর নয়, মানুষ একে কুৎসিত করে রেখেছে। নতুন করে মালা গাঁথতে হবে, যাতে করে কোথাও আর কোন অসঙ্গতি থাকবে না।

—কে এই মালা গাঁথবে?

—সবাই গাঁথবে এই মালা, কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না। সবাই নিজের নিজের জায়গা ঠিক করে নেবে, যাতে করে এ মাল সুন্দর হবে, প্রিয় হয়ে উঠবে, এ মালাতে একটি কাঁটাও থাকবে না।

—কি করে এ মালা গাঁথা হবে ?

—সে সব আমি জেনেছি ; আমি যে সব পেয়েছি।

তারপর সে ম্লান হাসিল, ক্লান্ত স্বরে বলিল, আমি আর বলতে পারছি না, মাথাটা বড্ড ঝিম্ ঝিম্ করছে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমাব। আমায় নিয়ে তুমি বিছানায় শুইয়ে দেবে ? আমার পাশে এসে বসবে ?

লতিকার মন নাচিয়া উঠিল, সলজ্জ ভাবে পবিত্রেব হাত ধরিয়া বিছানায় শোয়াইল।

—আপনি এখন একটু ঘুমোন, আর কোনো কথা ভাবতে পাববেন না। আমি আপনাব মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

—আঃ, কি আরাম। তোমাব হাত দুখানা কেমন সুন্দর, কি ঠাণ্ডা, বড্ড নরম, হাত দুখানা আমার বুকের ওপর তুলে ধর। মনে হচ্ছে, কতদিন পর আমি তোমায় পেলুম। তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

লতিকা আনন্দে অধীর হইল, অতি সন্তর্পণে পবিত্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

একটু পরে পবিত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। লতিকা অনিমেষ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সজ্জবাদ

১

লতিকা ও পবিত্র চা খাইতেছিল।

লতিকা সহাস্যে বলিল, আজকে আফিস থেকে একটু বেলাবেলি ফিরে এসো।

—আজও টকিতে যেতে হবে নাকি?

—না গো না, সে ভয় করো না। আজ বের হতে হচ্ছে তোমাব নিজের জন্যে।

—আমার জন্যে, আমি তো তোমায় কোনো কথা বলিনি!

ক্ষোভের সহিত লতিকা উত্তর দিল, কোন খেয়াল তোমার থাকে না—বসে বসে পড়বে! আর ছাই-পাঁশ কি সব ভাববে, আমি না হলে তোমার একদিনও আফিস যাওয়া হতো না।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, একথা একশবার সত্যি। তুমি না এলে আমার এ সব কি করে হতো—ভেবেই পাই না আমি।

সলজ্জ ভাবে লতিকা বলিয়া উঠিল, যাও, আর ভালমানষি দেখিয়ে কাজ নেই, ঢের হয়েছে, এখন যা বলছি লক্ষ্মী ছেলেটির মত তোমায় সব শুনতে হবে, বুঝলে?

—শুন্‌ছি বই কি?

—বেশ, আজ একবার কমলালয়ে যাবে? মাথা নাড়লে চলবে না, একটা কোট আর একটা কামিজ দিয়ে কদ্দিন কাটাবে?

ভীত চকিত কণ্ঠে পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, এর জন্যে কমলালয়ে কেন ? বয়কে দিয়ে কাপড় কিনে এনে বাড়ী বসে তৈরী করলেই—

—না, না, সে বড় বিশ্রী দেখাবে।

—কিচ্ছু বিশ্রী হবে না—আমি বরং খুশী হয়ে পরবো। মেয়েরা বোঝে না বাড়ীর তৈরী পোষাক পরতে কেমন ভাল লাগে।

কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে লতিকা বলিল, আবার লেক্‌চার স্বরু করলে। গল্প করতে পার না ?

পবিত্র একটা চাপা নিশ্বাস লইল ; বলিল, গল্প করতে আজ অবধি আমি শিখিনি। কথা বললেই বক্তৃতার মত শোনায়, কারও ভাল লাগে না আমার কথা।

লতিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল, বেশ লেক্‌চার স্বরু করে দাও, তোমার লেক্‌চার আমার বড্ড ভাল লাগে। দেখো যেন সেদিনের মত বলে বসো না—আমার মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে, তোমার হাত দুখানা বড্ড নরম, কোলে মাথা রেখে—

সহসা বাহিরের দরজায় সজোরে করাঘাত হইল।

—পবি, তোরা বসে বসে কি করছিস ? শিগ্‌গীর দরজা খোল, দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি।

পবিত্র তাড়াতাড়ি দরজা খুলিল, লতিকা দ্রুতপদে নিজের ঘরের দিকে ছুটিল।

নিরঞ্জন হঁকিল, তুমি ছুটে পালাচ্ছ যে ? অমল ! তোমাদের অমলদা।

লতিকার মাথায় বাজ পড়িল, কি করিয়া সে অমলকে মুখ দেখাইবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, অমলদা ! আমি ভাবলুম কে না কে ? আপনাদের ফ্রেণ্ডের অন্ত নেই—আসবারও কামাই নেই।

এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে গিয়া লতিকার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, অমলদা, কবে এলে? ভাল ছিলে সেখানে? বৌদিদি, দাদা, চিত্রা ভাল আছে?

অমল সহাস্যে বলিয়া উঠিল, তোমার মুখ দিয়ে যে খই ফুটছে। এত কথার জবাব দেব কি করে?

তার পর সে বলিল, হপ্তা খানেক হলো ল্যাণ্ড করেছি, ইটালিয়ান বোটে এলুম, ভাড়া কম। দেশে কি ফিরতে দেয়, সে এক ঝকমারি ব্যাপার! সে সব কথা পরে হবে। তোমায় এত শুকনো দেখাচ্ছে যে?

লতিকা সলজ্জ ভাবে জবাব দিল, বেশ চোখ তো তোমার! দেখ না কি রকম মুটিয়েছি, এর চাইতে বেশী হলে আর বাঁচবো না। বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

সে কথার উত্তর না দিয়া অমল সহাস্যে বলিল, পবিত্র যে সেই অবধি চুপ করে আছ? তোমার খবর কি হে? শুন্‌লুম, তোমাদের দুজনের জেল হয়েছিল?

কথাটা ঘুরাইবার জন্য পবিত্র বলিল, তোমায় দেখছি। কতদিন পর দেখা হলো।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তোমার সব সময়েই ফিলজফি-কাল অ্যাটিচুড্‌ ঠিক তেমনি আছে।

সকলে সে হাসিতে যোগ দিল।

লতিকা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তোমরা সবাই বসে গল্প কর, আমি এক্ষুনি আসছি। তারপর সতৃপ্ত দৃষ্টিতে পবিত্রের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার তো এ সব হুঁস নেই, দেখ যেন গল্প করতে করতে

বের হয়ে পড়ো না। বলিয়া সে দ্রুতগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

—তারপর পবিত্র, কি খবর? বলিয়া অমল হাসিল।

—খবর তো তোমার কাছে। এতদিন কোথায় ছিলে? কোন খোঁজখবর নেই। ব্যাপারখানা কি বল তো? কি করছিলে এতদিন?

—জার্ম্মানিতে ছিলুম, সেখান থেকে সোজা দেশে ফিরছি।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, নাৎসিরা খুব অত্যাচাব করছে, না?

—কাগজে যতটা দেখছো তার চেয়ে ঢের বেশী।

—এত অত্যাচার সে দেশের লোকেরা কি করে সহ্য করছে! বলিয়া পবিত্র উৎসুক ভাবে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমল গম্ভীরভাবে জবাব দিল, সবাইকে তো আর জেলে দিচ্ছে না, সবার ওপর অত্যাচারও করছে না—ঠিক আমাদের দেশের মত—সবাই ক্ষেপেও উঠছে না। যাদের প্রোটেক্‌শান ক্যাম্পে ধরে রাখছে—তারা হচ্ছে মাইনরিটি। জার্ম্মানি আর আমাদের ভেতরে তফাৎ এই—তারা হের হিটলারকে সাপোর্ট করছে; আর আমরা গভর্ণমেণ্টের পলিসি মনে মনে অ্যাপ্রুভ না করলেও, মুখে হয়তো প্রটেষ্ট করছি—কাজে কিছুই করছি না। ওসব দেশের আবহাওয়া আলাদা। ওরা যেটা বুঝবে সেটা করবে—নিজে না করলেও অ্যাকটিভলি সাপোর্ট করতে ওদের বাধে না। আর আমরা হচ্ছি বুদ্ধিমানের জাত—বুঝি সব—কাজের বেলা—কাউকে দেখতে পাই না। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে ষ্ট্যামিনার।

তারপর সে পবিত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, আবার তো মুভমেণ্ট স্থরু হয়েছে; এবার তোমরা জয়েন্‌ করনি?

পবিত্র সলজ্জভাবে জবাব দিল, আমি কিছু ঠিক করিনি; মিস্ গুপ্ত কি করবেন—আমায় এখনও বলেননি।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, মিস্ গুপ্ত! সে আর এসবের ভেতরে নেই। কি রকম সব গুছিয়ে নিয়েছে, দেখেছ?

অমল গম্ভীরভাবে বলিল, এর কোন মানে নেই। আবার খেয়াল হলে দেখবে, সব ঝেড়ে ঝুড়ে ঠিক বের হয়ে পড়েছে। লতিকে এজন্যে আমার বেশ লাগে—ওর একেবারে অ্যাট্যাচমেণ্ট নেই। মেয়েদের ভেতরে এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। ওরা সব সময় আঁকড়ে থাকতে চায়—নিজেকে কক্ষনো ফ্রী রাখতে পারে না।

—মেয়েদের কি সব নিন্দে হচ্ছে? বিহাইণ্ড আওয়ার ব্যাক?

লতিকা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল; পিছনে একটি ট্রেতে চা এবং খাবার লইয়া বয় আসিল।

—নিন্দে নয়; তোমার প্রশংসা করছিলুম। বলিয়া অমল হাসিয়া উঠিল।

—এত খাবার কি করে খাব? নিরঞ্জনের ওখানে এই খেয়ে এলুম।

—সব দিশি খাবার; একটাও রাখতে পারবে না।

—তোমার ডিস্?

—আমরা এই সবে চা খেয়ে উঠলুম।

—না, তোমায় খেতে হবে। বয়, ডিস—ওদের খাবার খেয়ে খেয়ে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

বয় ডিস্ আনিলে অমল নিজের ডিস্ হইতে কয়েকটা জিনিষ তাহাতে রাখিল।

লতিকা ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা সবাই আমায় মেরে

ফেলবে—সবার ডিস্ থেকে তুলে দিলে! অমলদা তোমায় এ ডিস্‌টা নিতে হবে।

তারপর সে চায়ের পেয়ালা মুখে ঠেকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিত্রা এসেছে?

—এসেছে, বেশ ভালই আছে।

—কতদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি! বলিয়া লতিকা একটা চাপা নিশ্বাস লইল।

—এস না, তোমায় একটা লিফ্‌ট দিচ্ছি—বালীগঞ্জ অবধি।

লতিকা কোন কথা বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

অমল স্মিতহাস্যে কহিল, আমি এসে বলে কয়ে বৌদিকে ঠাণ্ডা করেছি—দেখলুম মেজাজ বড্ড কড়া।

—বৌদি কি আমায়—

—সে সব তোমায় ভাবতে হবে না; এস না, গাড়ী তৈরী।

—আমায় ইন্‌সপেক্‌শনে বের হতে হবে যে।

—বেশ, আমি না হয় ও বেলা আসবো।

চা খাওয়া শেষ হইল।

নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে বলিল, সাড়ে নটা! অমল তুমি বরং বোসো—আমি চললুম—এগারটায় ক্লাস।

অমল উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, রোসো, আমিও আস্‌ছি। তারপর সে লতিকাকে বলিল, আজ বিকেল পাঁচটায়—তোমাদের দুজনকেই যেতে হবে, বুঝলে?

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পবিত্র ও লতিকা নীচে আসিয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

ছয় মাস পর।

—একটা বড় রকমের লড়াই যে এখনি বেধে যাবে, এ ভয় করবার কারণ এখনও হয়নি। বলিয়া অমল চুপ করিল।

—কে বললে হয়নি? হু হু করে চারদিক থেকে লড়াইএর হাওয়া বইছে যে!

অমল বাধা দিয়া বলিল, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি; যদ্দিন সব দেশ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকবে, ততদিন এ ভয় থাকবেই। কোন দেশকে একথা বললে চলবে না, ডিস্আরমামেণ্ট করছো না কেন? সে শুনবে কেন? এখনও যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাদ-বিসম্বাদে লড়াইকেই চরম মীমাংসা বলে মনে করে।

লতিকা অধীরভাবে বলিয়া ফেলিল, সবাই মিলে-মিশে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেই পাবে।

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল, জবাব দিল, পারে বই কি—লীগ্ সে চেষ্টাই এদ্দিন অবধি করে এসেছে, পারেনি। পারবে কি করে? লড়াই তো দেশের লোকেরা বাধায় না!

পবিত্র অবাক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, দেশের লোক বাধায় না! বাধায় কে?

অমল গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, লড়াই বাধে কতকগুলো ইন্টার-ন্যাশনাল কন্ডিশনের জন্য যে গুলোর মীমাংসা না হলে, যে অবস্থা-গুলো দূর না করতে পারলে শুধু চেঁচিয়ে বা কাগজে রিজলিউশন লিখে লড়াই থামান যায় না। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ থেকে সুরু করে

আজ অবধি সবাই নাজেহাল হয়েছে। উইলসন্ চেয়েছিলেন, গোড়া থেকে সব দেশ যত শিগগীর পারবে ডিস্‌আরমামেণ্ট সুরু করবে; লীগ কভেনাণ্টেও ছিল সে সব কথা। ডিস্‌আরমামেণ্ট কি হয়েছে? বরং আমরা ঠিক উল্টো দেখছি। যারা লড়াইএ হেরে গেছে, জোর করে তাদের ডিস্‌আরম্‌ড্ করা হয়েছে—যারা জিতেছে, তারা সবাই যত তাড়াতাড়ি পারে খুব বেশী করে আরম্‌ড্ হচ্ছে। জার্ম্মানি আর অষ্ট্রিয়া ছাড়া আর সবাই লড়াইএর আগে যত টাকা খরচ করতো, তার চাইতে ঢের বেশী ওয়ার অফিসে খরচ করছে। করছে বটে, কিন্তু এত টাকা খরচ করবার কি তাদের ক্ষমতা রয়েছে? নেই; অন্যান্য সব ডিপার্টমেণ্টকে ষ্টার্ভ করে শুধু এদিকে ঝুঁকেছে।

পবিত্র একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সব দেশে কি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈবী কবছে? সব দেশ কি তৈরী করতে পারে?

—তৈরী করবে কেন? অন্য দেশ থেকে কিনে আনে। লাষ্ট ওয়ারে হাজার হাজার ইংরেজ আর এলাইজ মরেছে শুধু ব্রিটিশ রাইফেল, ব্রিটিশ বেয়নেট আর ইংরেজদের কামানের গোলাতে।

লতিকা অবাক হইল; উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এদের মারলে কে? নিজেরা নিজেরা মারামারি করে—

—মারলে জার্ম্মান্। মারলে অষ্ট্রিয়ান্। এরা সবাই ইংরেজদের কারখানা থেকে কামান-বন্দুক কিনেছিল; গোলাবারুদ কিনেছিল।

পবিত্র ও লতিকা স্তম্ভিত হইল।

উত্তেজিত ভাবে অমল বলিতে লাগিল, ন্যাশনালিজ্‌ম্ ন্যাশনালিজ্‌ম্ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আরমামেণ্ট রিংএর ধুরন্ধরেরা এক একজন পাকা ন্যাশনালিস্‌ট। দেশের বড় বড মাথাওয়ালা লোক—

রিটায়ার্ড হাই মিলিটারি অফিসার, রিটায়ার্ড সিভিল্ অফিসার, একস্-পলিটিসিয়ান্—যারা সবাই দেশের ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের হাত করতে পারে, তারাই হচ্ছে রিংএর ডিরেক্টার। মুখে এরা সবাই বড় বড় পেট্রিয়ট্। নিজের দুপয়সা লাভের জন্য এরা কি না করতে পারে! যত সব স্কাউণ্ড্রেল! ভিকার্স আর্মষ্ট্রংএর নাম শুনেছ?

—না, কারা এরা?

—একটা ইংলিশ ফার্ম্। শুধু ভিকার্স-আর্মষ্ট্রং কেন? সিন্‌ভার-ফুসো—এরা হচ্ছে ফরাসী। জার্ম্মান ক্রুপের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। চেকোশ্লোভাকিয়ার—স্কোভা। এরা পয়সা পেলে কাকে না মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে? মনে করো না—ওল্ড আর্মস্, স্মল আর্মস্; এরা বেচে—মোষ্ট আপটুডেট্। একবারটি ভেবে দেখে না এই সব অস্ত্র দিয়ে শত্রুরা তাদের নিজের দেশের লোকদের মারবে। জাপানও কম্‌তি যান না আজকাল। মিট্‌সুইর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই—পৃথিবীর মস্ত বড়লোক—এরও সবচেয়ে বড় ব্যবসা হচ্ছে, পয়সা পেলে দেশের শত্রুর কাছে গোলাবারুদ বিক্রী করা।

লতিকা আর সহ্য করিতে পারিল না; আতঙ্কে বলিয়া ফেলিল, ভয়ানক লোক এরা।

অমল বাধা দিয়া বলিল, এতে ভয়ানক তুমি আর কি দেখলে। এরা কি করে পৃথিবীর লোকদের কান ধরে চরিয়ে বেড়ায় শুন্‌লে একেবারে মুসড়ে যাবে। এরা করে কি জান? কোন নতুন মারণ-অস্ত্র বের হলে, সবার আগে সেটাকে বেচে ফেলে সেই দেশকে যে দেশ দুদিন পরে নিজের দেশের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে—এতে করে এদের ব্যবসাবুদ্ধির চরম বিকাশ হয়। এরা জানে, নিজের দেশের পোটেন্‌শিয়াল্ এনিমির কাছে বিক্রী করলে, ভড়কে গিয়ে নিজেদের

গভর্ণমেণ্টও সেই অস্ত্র কিন্‌বে। অন্যান্য ব্যবসায় একজন বিক্রী করতে পারলে আর একজনের বিক্রী করবার স্কোপ কমে আসে; এর বেলায় সে রকম হয় না। একজনকে বিক্রী করতে পারলে, আর একজনের কাছে বিক্রী করবার আরও স্থবিধে হয়, সব দেশই চায় ইকোয়ালি আর্মড্‌ হতে।

লতিকা ও পবিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

অমল গম্ভীর ভাবে কহিল, অবশ্য একথা ঠিক, অনেক দেশে লাইসেন্স ছাড়া আর্মস্‌ বিক্রী করবার হুকুম নেই। কিন্তু সেমি-ম্যানুফ্যাকচার্ড পার্টসের বেলায় ঠেকাচ্ছে কে? সেগুলো নিজের দেশে এনে জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছে। লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ এ দিকে কি নজর দিয়েছে? শুধু হোয়াইট স্লেভ ট্রাফিক আর আফিংএর ব্যবসা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে।

লতিকা বাধা দিয়া বলিল, ও দুটো কাজ হাতে নেওয়া কি লীগের অন্যায় হয়েছে? কত মেয়ের সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, এক দেশ থেকে ভুলিয়ে এনে অন্য দেশে পাপ ব্যবসা চালাতে তাকে বাধ্য করছে! জীবনে তার স্থখ নেই, শান্তি নেই, স্বাধীনতাটুকু অবধি তার কেড়ে নিয়েছে! যে আসছে তাকে সন্তুষ্ট করতে হচ্ছে না? বুড়োই হোক আর যুবকই হোক! নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, কি ভয়ানক কথা!

বলিতে বলিতে লতিকা শিহরিয়া উঠিল। অমল অপ্রতিভ হইল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, আমি তো লীগকে কোন দোষ দিইনি এজন্যে। বিশ্বরাষ্ট্রের ইতিহাসে লীগ এ দুটোই কাজের মত কাজ করেছে।

তারপর সে উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, এতে করে জগতের

যেটুকু উপকার হয়েছে, সেটা কতটুকু? কয়েকটা কেন, কয়েক লাখ সাদা চামড়াওয়ালা মেয়েকে যাতে করে এরকম দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে না হয় তারই চেষ্টা করেছে। কালো, হলদে এদের কথা আজ অবধি ভেবে দেখেনি; লীগ কি শুধু সাদা মেয়েদের জন্যে? যাক এসব কথা, এতে করে শুধু হতভাগিনীদের রক্ষা করা হয়েছে। ওপিয়াম কণ্ট্রোল করে, কয়েক লাখ পরিবারের লোকদের সুস্থ ও সবল করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই যে আর্মামেণ্ট রিংএর ধুরন্ধরেরা পৃথিবীর সব লোকের সর্ব্বনাশ করছে, লীগ কি তাদের কোন কথা বলেছে? বলেছে কি, আর্মামেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রি প্রাইভেট্ পারসনের হাতে থাকতে পারবে না? একথা বলবার সাহস আজ অবধি লীগের হযনি।

পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, এতে করে কি হবে?

অমল উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, গভর্ণমেণ্ট যদি এই সব কারখানার মালিক হয়—এতে করে এটুকু হবে কেউ আর দেশেব শত্রুদের আর্মস্ সাপ্লাই করতে পাববে না। এখন যেমন যাব টাকা আছে, সে দেশ কারখানা না থাকলেও অন্য দেশ থেকে সাপ্লাই পায়। সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, লড়াইয়ের ভযও অনেকটা কমে আসবে।

—কিন্তু তাই কি হবে? বলিয়া পবিত্র চুপ করিল।

—কেন হবে না? বলিয়া অমল সজোরে টেবিলে কবাঘাত করিল।

সন্দিগ্ধ ভাবে পবিত্র জবাব দিল, শুনেছি চায়নাতে বড় রকমের কারখানা নেই, গোলা বারুদ তাদের বাইবে থেকে কিনে আনতে হয়। তোমার কথা শুনে লীগ কাজ করলে, চীনের কি দুরবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ কি? দুহাতের ভেতরে জাপান; শুনলুম, সিটস্থই রিং রয়েছে তাদের। জাপান একেবারে ওঁৎ পেতে রয়েছে, সব সময় হানা দিচ্ছে;

ইটালি আবিসিনিয়ার টুটি চেপে ধরতে চাইছে যে! বাইরে থেকে গোলা-বারুদ অস্ত্রশস্ত্র কিন্‌তে না পেলে এরা আত্মরক্ষা করবে কি করে? একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে। এর উপরে চীনে অনেক ফরেন্‌ সেট্‌ল্‌মেণ্ট রয়েছে, ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান—এরা সবাই ঘাঁটি আগলে বসে রয়েছে। এরা কেউ চাইবে না চীন যোল আনা জাপানের হাতে গিয়ে পড়ে। এরা সবাই চীনকে সাহায্য করবে, চীন এদের গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে গোলা-বারুদ কিনবে; জাপান এতে করে চটে উঠবে না?

—চটে উঠবে কেন?

—কেন উঠবে না? চীন এখন প্রাইভেট পার্টির কাছ থেকে কিনছে, ইচ্ছে করলে জাপানও কিনতে পারে। এ কেনা-বেচার ভেতরে ইন্‌টারন্যাশানাল কম্‌প্লিকেশন নেই। যেই চীন গভর্ণমেণ্টদের কাছ থেকে কিনতে চাইবে, চারদিক থেকে হট্টগোল বেধে যাবে। য়ুরোপের লড়াইএর কথা ভেবে তুমি আঁৎকে উঠছো সে লড়াই এসে পড়বে ফার ঈস্‌টে! বলিয়া পবিত্র চুপ করিল।

কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া অমল বলিয়া উঠিল, ক্যাপিটালিষ্ট ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, ক্যাপিটালিষ্ট ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ ধ্বংস না হলে লড়াই বন্ধ হতে পারে না। আমাদের আনতে হবে কম্‌প্লিট্‌ সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ শুধু ন্যাশনাল নয়, ইন্‌টারন্যাশনাল।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল।

অমল রাগে জলিয়া উঠিল, বলিল, হাসলে যে বড্ড?

—কিছু নয়, এমনি।

—এড়িয়ে গেলে চলবে না, তোমায় বলতে হবে, কেন হাসলে? বলিয়া অমল সজোরে টেবিলে করাঘাত করিল।

—হাসলুম তোমার কথা শুনে, তুমি সব সময়ে পার্টির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কথা বল।

—পার্টি! পার্টি তুমি কোথায় পেলে? বলিয়া অমল গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

লতিকা দুই জনের মাঝখানে পড়িল; ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, বেটাছেলেদের বড্ড দোষ, কেউ হার মানতে চায় না। এতে করে কেন লড়াই বাধবে না?

অমল ও পবিত্র লজ্জিত হইল; উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

লতিকা রাগত ভাবে বলিল, ভারি বদ্ তোমরা, একটুতেই ঝগড়া বাধিয়ে ফেল। তারপর হাতাহাতি। এখন তো কেমিক্যাল ওয়্যার-ফেয়ারের দিন এসেছে। দুটো গোলা-বারুদ এ ওকে দিলে, তাতে কার কি এসে যায় বল? বলিতে বলিতে লতিকা উত্তেজিত ভাবে হাসিয়া ফেলিল।

অপ্রতিভ ভাবে অমল জবাব দিল, তুমি ঠিক ধরেছ, কি ভয়ানক কাণ্ড করে তুলেছে! কত রকমের একসপ্লোসিভস্ তৈরী করছে ঠিক নেই। বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই কোথায় কি হচ্ছে; সবাই মনে করেছ, সাধারণ জিনিষ সব তৈরী হচ্ছে, যা সবাই সব সময় ব্যবহার করে। ব্রিটিশ ডাই ষ্টাফ্ করপোরেশন্ ব্রুনারমণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে—যারা সোডা বিক্রী করে সারা পৃথিবীময়। এর সঙ্গে এসে জুটেছে—ইউনাইটেড অ্যালক্যালি আর নোবল্ এক্সপ্লোসিভস্ কনসার্ণ। সবাই মিলে হয়েছে একটা কম্পানী; নাম দিয়েছে তার ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি্স্ লিমিটেড। এরা বিলেতের সমস্ত কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলো কনট্রোল করে। এদের শাখা প্রশাখা সব দেশে রয়েছে—বিশেষ করে আমেরিকা আর কানাডায়। এখন আবার

পাঞ্জাবে একটা বড় কারখানা খুলতে চাচ্ছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সময়ে ব্রিটিশ ডাইষ্টাফ্ করপোরেশনে তু মিলিয়ন্ শেয়ার নিলে, সবাই ভাবলে টেক্সটাইল ইন্‌ডাষ্ট্রির ডাই সাপ্লাইএর সুবিধে হবে। তার পর না সবাই বুঝতে পারলে—

লতিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সবাই কি বুঝতে পারলে অমলদা ?

অমল গম্ভীরভাবে বলিল, বুঝতে পারলে কি মতলবে শেয়ার নিয়েছে। আজ ইম্পিরিয়াল্ কেমিক্যাল সোডা, রং, আর আর সব কেমিক্যাল. তৈবী করছে; লড়াই বাধলে—এস্‌কপ্লোসিভস্ মাসটার্ড গ্যাস, আর আর সব মারণ-অস্ত্র তৈরী করতে এর একটুও বাধবে না। কলকারখানাও বদলে ফেলতে হবে না; একই কারখানায়, পীস্ আর ওয়ার, সব সময় সমানভাবে কাজ চলবে।

লতিকা ও পবিত্র স্তম্ভিত হইল। পবিত্র ভাবিল, কোন অবস্থাতেই ষ্টেট্ কণ্ট্রোলড্ ইন্‌ডাস্‌ট্রি পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে না।

লতিকা অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এতে করে এখনও কেন পৃথিবী জোড়া লড়াই বাধছে না অমলদা ?

—এখনও যে সব দেশ তৈরী হয়ে উঠতে পারেনি, পারলে ঢের আগে লড়াই বেধে যেত। জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া—যাদের প্রতিহিংসা নেবার কথা, তারা এখনও তুর্ব্বল। নাৎসী রাইজিং থেকে মনে হচ্ছে, জার্ম্মানি আবার পুরোদস্তর রিআর্মড্ হবে; বাইরে থেকেও এভাব বেশ বোঝা যাচ্ছে। য়ুরোপের ধুরন্ধরেরা চোখ বুজে মনে করছে—বিপদ কেটে যাবে; কোন কোন দেশ আবার ব্যালেন্স অব্ পাওয়ার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। এও কি কখনও হয় ? লড়াই বাধছে না—সব দেশ গরিব বলে—টাকা নেই। এতো ঢাল-তরোয়ালের

লড়াই নয়—টাকার লড়াই। এবারে আর কেউ কাউকে ধার দিচ্ছে না—একবার দিয়ে আমেরিকা ঠকেছে—আর হাত পোড়াচ্ছে না। দেবেই বা কোত্থেকে—ক্রাইসিস্ যে সবাইকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যে সবাই একটু দম নিচ্ছে। পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা আর একটু ভাল হলে—যাকে বলে চলনসই—সাজ-সজ্জার হিড়িক লেগে যাবে; যে যত তাড়াতাড়ি পারবে সেজে-গুজে নেবে—টাকার কথা তখন আর কেউ ভাববে না। তারপর যে মারণ সুরু হবে—আমরা কল্পনাও করতে পারি না—যারা হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করছে—তাদের তো মারবেই; যারা বাড়ী বসে থাকবে তাদেরও রাখবে না।

শ্বাসরোধ করিয়া লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, তাদের কেন মেরে ফেলবে? তারা তো কোন দোষ করেনি!

অমল অত্যন্ত উত্তেজিত হইল; চীৎকার করিয়া বলিল, কেন মেরে ফেলবে না? তারা কোন দোষ করেনি? তারাই তো লড়াইকে বাঁচিয়ে রাখে—রসদ দিয়ে, লোক দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে। কোন কলকারখানা থাকবে না এবারে—সব ধ্বংস হয়ে যাবে—যাতে করে আর মারণ-যন্ত্র—বিস্ফোরক তৈরী না হতে পারে।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই তিন পর, অমল হাই তুলিয়া বলিল, নিরঞ্জন আজ আর এলো না, আমায় এবারে উঠতে হচ্ছে।

—আর একটু বসো না, অমলদা। তোমার তো কোন কাজ নেই। আমি চা নিয়ে আসছি। বলিয়া লতিকা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পবিত্র মনে মনে বলিল, আবার ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাধলে আর কারও

সুবিধে হোক না হোক ভারতবর্ষের লাভ হয়তো হবে, যদি আমরা সে সুযোগ না হারাই। পরমুহূর্ত্তে সে আবার হতাশ হইল; আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ লইতে ভারতবাসী শিখে নাই, সকল সময় সে ইহা লক্ষ করে না, সর্ব্বদা অপ্রস্তুত থাকে।

৩

লতিকার পিছনে ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বয় প্রবেশ করিল। লতিকা হাসিয়া উঠিল, বলিল, নিরঞ্জনবাবু এসেছেন, বাঁচলুম।

—কেন বল তো? নিরঞ্জন স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল। মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া লতিকা উত্তর দিল, দু ঘণ্টা ধরে অমলদা আমাদের দুজনকে ভয় দেখাচ্ছিল।

চোখ বড় বড় করিয়া অমল বলিয়া উঠিল, ভয় দেখাচ্ছিলুম আমি? কক্ষনো না।

ঠোঁটের কোণে হাসি টানিয়া লতিকা কহিল, ভয় আবার দেখাওনি! এতক্ষণ বসে বসে কি করছিলে? বলনি তুমি—সবাই মরবে—কোন লোক আর বাঁচবে না এবারে লড়াই বাধলে?

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, ওঃ! মনে করছিলুম কি না কি! সে তো ভয় দেখাবার জন্যে নয়; যাতে করে আর লড়াই না হতে পারে—

লতিকা আর হাসি চাপিতে পারিল না; হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

অমল একটু অপ্রস্তুত হইল; জিজ্ঞাসা কবিল, এত হাস্‌ছো যে বড্ড ?

হাসিতে হাসিতে লতিকার পেটে খিল ধবার উপক্রম হইল; কোন রকমে নিজেকে সংযত কবিয়া বলিল, দেখছেন নিবঞ্জনবাবু, পীস্‌ আনতে গিয়ে অমলদা বাড়ীব ভেতরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছিল আর কি!

লতিকা আবার হাসিতে লাগিল।

অপ্রতিভভাবে অমল বলিয়া উঠিল, একটু একসাইটেড্‌ হয়ে পড়েছিলুম।

—একসাইটেড! একে তুমি একসাইটেড্‌ বলছো—তুজনে মাবা-মাবি স্বরু করেছিলে আর কি! আমি মাঝখানে না পডলে, নিবঞ্জন-বাবুকে অ্যাম্‌বুলেন্স ডাকতে হতো না?

নিরঞ্জন সহাস্যে বলিল, তুজনে বসে কথা কাটাকাটি কবছো, কি হয়েছিল, ব্যাপারটা একটু খুলেই বল না?

—আপনি বরং অমলদার কাছ থেকে শুনুন, ওঁব একসাইটমেণ্ট এখনও রয়েছে। বলিয়া লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

নিরঞ্জন তাহাব দিকে তাকাইতেই অমল সকল কথা খুলিয়া বলিল। ইতিমধ্যে কি যেন একটা কাজে লতিকা সেই ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল।

অমলের কথা শেষ হইতেই নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, ওঃ! আমি ভাবলুম, কি না কি একটা ব্যাপার হয়েছে!

তারপর সে পবিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লতিকাব আজকাল ওব উপর বেশ একটু টান্‌ হয়েছে দেখছি।

অমল ও পবিত্র কোন জবাব না দিয়া হাসিতে লাগিল।

—কি, খুব যে হাসি হচ্ছে, দেখছি! অমলদা আর এক কাপ চা?

—কোন আপত্তি করবো না। পবিত্রকে—

—না, ওঁর এক কাপের বেশী খেলে ঘুম হয় না। বলিয়া লতিকা আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিরঞ্জন ও অমলের দৃষ্টিবিনিময় হইল; পবিত্র একটু হাসিল।

—হাসলে যে? অমল জিজ্ঞাসা করিল।

—হাসব না? এটা কি তোমাদের দুজনের একচেটে?

লতিকা পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, এবারে তোমরা বসে গল্প করো আর যত খুসি চুরুটের শ্রাদ্ধ করো; আমি হাতের কাজগুলো সেরে নিগে।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, কাজ! কাজ! কি কাজ তুমি এখন করবে? ফারপোতে গিয়ে সবাই ডিনার খাব এখন।

লতিকা পবিত্রের মুখের দিকে চাহিল; তারপর বলিল, বেশ; বেশী রাত করবেন না।

—না গো না, পবিত্রকে ধরে রাখবো না আমরা।

—আর আমার?

—তোমার আবার কি? সারারাত কড়িকাঠ গুনবে!

—অমলদা! তুমি বড্ড—

—দুষ্টু! না?

—যাও, তোমাদের সঙ্গে আমি আর পেরে উঠি না। বলিয়া লতিকা ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল।

অমল সন্দিগ্ধভাবে বলিল, তোমার এ খেয়াল কি করে মাথায় ঢুকলো? তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

লতিকা কি উত্তর দিবে, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিযা রহিল। নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ফার্পোতে যাবে বই কি! মাধুরী ওসব জায়গায় যেতে ভালবাসে না।

অমল গুম হইয়া বসিয়া রহিল; ভাবিল, মাধুরীর সমাজে লতিকার স্থান নাই।

সকলের মুখেই একটা অস্বস্তির ভাব। অমল তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, অনেকদিন বাঙলা গান শুনিনি; লতি, রবিবাবুর দু-একখানা ভাল গান গাও না—নতুন গান—যা আমি শুনিনি।

কি উদ্দেশ্যে অমল গানের কথা পাড়িল লতিকার বুঝিতে একটুও দেরী হইল না; সে গম্ভীরভাবে জানাইল, অমল ইতিপূর্ব্বে চিত্রার গান শুনিয়াছে। বেশী পীড়াপীড়ি করাতে সে ম্লান হাসিয়া কহিল, সে পাট অনেক দিন তুলে দিয়েছি।

অমল অবাক হইল; জিজ্ঞাসা করিল, কেন? পবিত্র কি তোমার গান শুনতে চায় না?

ক্লান্তির স্বরে লতিকা জবাব দিল, শুনবেন না কেন? কোন যন্ত্র এখানে আমি রাখিনি—শুধু গলায়—

তাহার কথায় অমল আর কান দিল না; সব কটা ঘর খুঁজিয়া দেখিতে গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, একটা ছোট্ট এস্‌রাজ অবধি রাখনি?

—এটা যে আমাদের নীড়! কতকগুলো আজেবাজে জিনিষ রাখবার জায়গা নেই।

—নীড়!

—দুজনে বাসা বেঁধেছি; খেয়াল হলে দুজনে দুদিকে উড়ে যাব।

অমল ও নিরঞ্জন বিস্মিত হইল, পবিত্র ও লতিকার কথা ভাবিতে লাগিল।

নিস্তব্ধতা লতিকার অসহ্য বোধ হইল; বলিল, কি ভাবছো বসে অমলদা? বিলেতের গল্প কর; শুধু গল্প। গল্প শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে—তোমরা কেউ গল্প করতে পার না!

লতিকা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল।

অমল আপন মনে বলিল, নীড়! ফাইন্ আইডীয়া! আমাদেরও এমনি ছিল।

—আপনা-আপনি কি বিড় বিড় করছো? তোমায় আবার ভূতে পেলে নাকি! নিরঞ্জন হাঁকিল।

অমল সহাস্তে উত্তর দিল, ভাবছি, আমাদেরও এমনি একটি নীড় ছিল। ভেঙে দিলে, উড়ে এলুম।

—তোমারও নীড়! আমিই শুধু ফাঁকে পড়লুম। বলিয়া নিরঞ্জন একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

—ফাঁকা তোমার নয়; একেবারে জমাট! পবিত্রের ঠোঁটের কোণে হাসি। কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত নিরঞ্জন বলিল, ফাঁকাই হোক আর জমাটই হোক চিরকাল এ নিয়েই থাকতে হবে। সে কথা হচ্ছে না। আমি ভাবছি—অমল কাকে জুটিয়েছিল, ইংরেজ না ফরাসী! তরুণী না অশীতিপরা বৃদ্ধা!

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল, জবাব দিল, তরুণীও নয়, বৃদ্ধাও নয়, একেবারে খাঁটি বেটাছেলে—একটি দুটি নয়, অনেক।

—তুমি একজন পাকা রেভলিউশনারি; নইলে কম্‌প্লিট সেক্স-ট্রান্‌স্‌ফরমেশন্; বলিয়া নিরঞ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে সে হাসিতে যোগ দিল।

অমল সহাস্যে বলিল, সেটা ছিল আমাদের ক্লাব—বার্লিনে কুড়ি পঁচিশ জন বাঙালী ছেলে সেখানে থাকতুম। আর একটি ছেলে ছিল, ইন্‌ডিয়ান হলেও বাঙালী নয়—কাথিযাওয়াড়ের দিকে বাড়ী।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অমল, এ ক বছব তোমার কি করে চলতো? বাড়ী থেকে তো একটা পয়সা পেতে না।

—টাকা পেতুম না বললে মিথ্যে বলা হবে, নিতুম না বল।

—বেশ, কেন নিতে না?

—নেব কি করে? কত বড় রিস্ক বড়দার! আমার ঠিকানা তাকে দিইনি অনেক ভেবে। টাকার অভাব আমার কোনদিন হয়নি, বিশেষ করে জার্ম্মানিতে।

উৎসুক ভাবে পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, পার্টি ফাণ্ড থেকে পেতে?

অমল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, পার্টি ফাণ্ড কোন দিন পারসনাল ইউজের জন্য দেওয়া হয় না।

—তা হলে কোত্থেকে টাকা পেতে?

—আমরা সবাই জার্ম্মান মেয়েদের ইংরেজি পডাতুম।

নিরঞ্জন অবাক হইল; জিজ্ঞাসা কবিল, তাবা তোমাদের কাছে পড়তো? ইংরেজ টিউটার নেই?

—থাকবে না কেন? তাদের সবাই রাখতে পাবে না—ফী অনেক।

পবিত্র গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ক্লাব কি করে চলতো?

অমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, সে কথা ভাই বলতে পারবো না, আমায় আর এসব নিয়ে অনুরোধ করো না।

—বেশ, নাই বা বললে; তোমরা তো সব সময় হৈ চৈ করতে, তোমাদের ঘর দেখতো কে? লতিকা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল।

—ওই কাথিয়াওয়াড়ি ছেলেটি! গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলে, এবারে গল্প বলছি। বলিয়া অমল মৃদু হাসিল।

নিরঞ্জন শঙ্কিত হইল, কহিল, গল্প বলতে গিয়ে টাইম ওভার করো না যেন, আটটা বেজে দুমিনিট।

—না, ডিনারের আগেই শেষ করবো।

—একটু দেরী হলে কোন দোষ হবে না, আমারা তো সাহেবদের সঙ্গে বসে খাব না। বল অমলদা তোমার গল্প। বলিয়া লতিকা উৎসুক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গম্ভীব ভাবে অমল বলিতে লাগিল, অদ্ভুত ছেলে সে! আমাব সব কথা তোমাদেব বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হবে না, আমি যা বলছি সব সত্যি, একটি কথাও মিথ্যে নয়।

নিবঞ্জন হাঁকিল, ভূমিকা বেখে গল্প স্বরু কর।

—আট বছব বযসে স্কুলে জিযোগ্রাফি পডতে গিয়ে ম্যাপ দেখে যুবোপ দেখবার তাব বড্ড সখ হলো। এ সখ কম বেশী কবে সব ছেলেমেয়েরই হযে থাকে, দুদিন আগে আব দুদিন পরে।

—বেশ তাতে কবে কি হলো? নিবঞ্জন কৃত্রিম উৎসাহেব সহিত জিজ্ঞাসা কবিল।

—এত তাড়া দিলে গল্প কক্ষনো জমে উঠবে না। বলিযা লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

অমল গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, ন বছব বয়সে বাড়ী থেকে বের হলো সে, বাবার বাক্স ভেঙে। বাবা খুব বড় লোক—মস্ত বড কারবার। সে কিন্তু চুবি কবলে মাত্র দশটা টাকা। পাঁচ টাকা রাখলে পকেটে, আব পাঁচ টাকা ট্যাঁকে, যাতে কবে কেউ না জানতে পারে।

গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অমল চুপ করিল।

লতিকা অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

—তারপর সে ছোকরা কি করলে তুমিই বল?

—আমি কি করে বলবো?

—তুমি গল্প শুন্‌তেই জান, বলতে পার না। যা খুশী তাই বলবে।

—যা খুশী তাই বললেই হলো, মানে থাকবে না তার? বলিয়া লতিকা অমলের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

—বাড়ী থেকে পালিয়ে, সে এলো করাচীতে একটা সেলিং ভেসেলে।

—সেলিং ভেসেল! পাল তোলা জাহাজ কোত্থেকে পেলে সে? লতিকা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—এখনও আমাদের দেশের সওদাগররা পাল তোলা জাহাজে করে ভারত মহাসাগরের ধারে ধারে মাল বয়ে নিয়ে যায়। এরকম একটা জাহাজে চড়ে, ছোকরা এলো করাচী। জাহাজের লোকেরা তাকে দেখতে পায়নি—একটা পিপের ভেতরে লুকিয়েছিল সে।

লতিকা হাঁ করিয়া গল্প শুনিতেছিল, মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খেলে কি সে এ ক দিন?

অমল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, সে কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, তারপর?

—করাচীতে নেমে সে ধরা পড়ে গেল। জাহাজের মালিক জিজ্ঞেস করলে, ওহে ছোকরা, কোত্থেকে এলে, যাচ্ছ কোথায়? ছেলেটা থতমত খেয়ে কেঁদে ফেললে, অল্প বয়স। চোখ মুছে সে জানালে, বিলেতে যাচ্ছে চাকরি করতে। সওদাগর তো একেবারে অবাক হয়ে

গেল। হলে কি হবে, ছেলেটা যে বামুন। সওদাগর হচ্ছে জাত বেনে। তার গিন্নী শুনে বললে, এত টাকা রোজগার করলে, না হয় একটা সৎ কাজ কর, পরকালে কাজ দেবে—আহা, বামুনের ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দাও।

লতিকা অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রীর কথা রাখলে সওদাগর ?

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, রাখেনি আবার! তার ঘাড়ে কটা মাথা ? সওদাগর কিন্তু খুব হিসেবী, হেসে গিন্নীকে বললে, তোমার কথা রাখবো বই কি, এক্ষুনি বামুনের ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লতিকা বলিল, তারপর ?

—সওদাগর ছেলেটাকে ডেকে বললে, বামুনের ছেলে তুমি; কত টাকা কত ভাবে নষ্ট করছি, আমার জাহাজ যাচ্ছে পারস্য উপসাগরে, এতে করে তুমি যাও, সেখান থেকে আর কোন জাহাজে চেপে বিলেত যেও, বুঝলে ? ছোকরা তো মহা খুসি।

—গেল সে এতে করে বিলেত ?

—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। সওদাগর গিন্নীর সইল না, স্বামীকে সে ভাল করে চিন্তো। ছোকরাকে বাড়ীর ভেতরে ডেকে আনলে, বামুনের ছেলে, এতো দোষ নেই। সামনে বসিয়ে তাকে খাওয়ালে, গরম পোষাক পরালে, ঘর থেকে দুখানা ভাল রাগ্ দিলে তাকে—তারপর সেই ষাট বছরের বুড়ি বামুনের ছেলের পায়ের কাছে দুখানা গিনি রেখে গড় হয়ে তাকে প্রণাম করলে।

—তারপর কি হলো অমলদা ?

একটু দম লইয়া অমল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, যেতে যেতে ভয়ানক ঝড় এলো, জাহাজখানা ভেঙে চূড়মার হয়ে গেল—কোন রকমে ভাসতে ভাসতে একটা পোর্টে এসে লাগলো।

—তারপর ?

—জাহাজের লোকরা তুলে নিলে তাকে আরবীদের একটা নৌকায়, কেউ কারও কথা বুঝতে পারে না। সাত দিন সাত রাত পর নৌকো এসে ভিড়লো এডেনে।

—এডেনে এসে দেখলে, মুফৎ আর যাওয়া যায় না, ফাঁকি আর চলে না। পাশপোর্ট অফিসে এসে শুনলে, হাজার টাকা ট্যাঁকে থাকা চাই। ছোকরা এক ফন্দি আঁটলে।

—কি ফন্দি বার করলে সে? লতিকা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—বলিহারি ছোকরা! শুনলে একেবারে অবাক হয়ে যাবে! দুপুর রোদে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়ে কুলপি বরফ বেচতে লাগলো। ছ মাস পর দেখলে, হাজার টাকা জমিয়েছে।

—অদ্ভুত ছেলে বই কি! তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে, বলিয়া লতিকা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, এ ছেলে দেখতে পাওয়া যায় না। সব সময় এড়িয়ে এড়িয়ে চলে; এদের বেলায় ড্রীমই সব চাইতে ভাল, বাস্তব একেবারে অচল।

—পাঁচশ টাকা ট্যাঁকে গুজলে, আর পাঁচশ দিয়ে জাহাজের টিকিট কিনলে; এলো সে সোজা চলে ব্রিন্দিসী।

—পেলে সে চাকরী, সেখানে? লতিকা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, চাকরি! চাকরি সে করবে কেন? সে যে বেরিয়েছে ম্যাপ ভেরিফাই করতে!

—খুঁজে নিলে সে সব চেয়ে নোংরা হোটেলে, একটা কুৎসিৎ

পল্লীতে। খেলে সে সব চেয়ে নোংরা খাবার, যা কেউ মুখে দেয় না। রাত্রে থাকতো হোটেলে, দিনের আলোতে দেখে বেড়াতো বড় বড় বাড়ী, ভাল ভাল গাড়ী, ছেলেমেয়ের হাত ধরে নেচে বেড়ানো, আর স্ফূর্ত্তি। দুটোর তুলনা করে তার ভাল লাগলো না। দু দিন থেকে সে হাঁপিয়ে উঠলো, ছুটে চলে এলো প্যারিসে।

—সেখানে এসে সে কি করলে? কোথায় উঠলে?

—ঠিক তেমনি একটা নোংরা হোটেলে; প্যারিসে এসে তার মন আরও খারাপ হয়ে উঠলো। দিনের আলোতে বেশী লোকজন দেখা যায় না—বড় বড় বুলভার্ড আর রু সব খালি। সন্ধ্যে হলে কোত্থেকে যে সব লোক এসে জোটে ঠিক নেই। স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা বইতে থাকে। মিউজিক্ হল, নাইট ক্লাব আর ক্যাবারেতে ঢুকে ছোকরা একেবারে হক-চকিয়ে গেল। মন তার আইঢাই করতে লাগলো। সে আরও দেখলে—

—আর কি দেখলে সে? বলিয়া লতিকা চেয়ার টানিয়া অমলের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

—দেখলে সে প্যারিসের আনডার ওয়ার্ল্ড; লণ্ডনের চাইতেও ভয়ঙ্কর। এখানকার উৎসব সুরু হয় মাঝরাত্রি থেকে। কত বদলোক সেখানে থাকে—একতলাতে—একতলার নীচে—বেস্‌মেণ্ট কাফেতে। কত জঘন্য হীন কাজ সেখানে সে দেখতে পেলে—ভোর অবধি। আনডার ওয়ার্ল্ডে ঢোকবার আগে পুলিশের লোক তার আইডেন্‌টিটি কার্ড দেখতে চাইলে;—পরিচয় পত্র না থাকলে সেখানে যেতে দেয় না। ভাল করে ছোকরার গা ঝেড়ে দেখলে কোন ফায়ার আর্ম সঙ্গে এনেছ কিনা। ফায়ার আর্ম নিয়ে ঢোকবার হুকুম নেই।

নিরঞ্জন উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে গিয়ে কি দেখলে তুমি?

অমল অবাক হইল; বলিয়া উঠিল, আমি! আমার কথা তো হচ্ছে না।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, না হয় সেই ছোকরার কথাই হলো, দেরী করছো কেন? ফারপোতে যেতে হবে না?

—দেখলে হাফ্ নেকেড্ পুরুষ আর মেয়ে; মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যত সব কুলি-মজুরদের অ্যালিওর করে আনবে বলে। ছোরা চালাতে সবাই মজবুত—মেয়েরাও কমতি যায় না—দরকার হলে ছোরা মেরেই সেখানকার সব ঝগড়া মেটান হয়। একটার পর একটা—কত সব ডান্‌স্ হল সে দেখলে—সেখানকার আলোর জলুস কত! পুরুষ আর মেয়েরা বাইরে খুবই ভদ্র—ঝগড়া বাধলে আর রক্ষা নেই—তারা কাউকে খুন করতে কসুর করে না, এক মিনিটও ভাবে না। মেয়েদের বুকের ওপরে কারও কাপড় নেই। শেষ রাত্রের দিকে প্রকাণ্ড হলঘরে পুরুষ আর মেয়ে ওই অবস্থায় কাতারে কাতারে শুয়ে আছে—কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ বা গোঙাচ্ছে, কেউ আবার কাঁদছে—মদ খেয়ে সবাই টং হয়ে আছে, কারও মাথার ঠিক নেই।

—এ তো সব গেল ছোটলোক আর বদমায়েসদের কথা। ছোকরা দেখলে, যাদের আমরা বড়লোক বলি—যারা হচ্ছে—সিভিলাইজড কালচার্ড—সেই সব পুরুষ আর মেয়ে ভাল ভাল পোষাক পরে, রাত তিনটে থেকে ভোর সাতটা-আটটা অবধি সেখানে খাচ্ছে, নাচছে, মদ চালাচ্ছে। সেই সব বড় ঘরের মেয়েরা কুলিমজুরদের ঘাড়ে হাত দিয়ে কত কথাই না বলছে! মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁস্ হয়ে গিয়েছে

তারা ! বড় ঘরের ছেলেরাও সেখানকার নোংরা মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা গল্প করছে। মাঝে মাঝে পিছনের ছোট ছোট কামরায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে আবার খানিক পরে বের হয়ে আসছে। বলিয়া অমল চুপ করিল।

—চুপ করে রইলে যে ? ফারপোতে যেতে এখনও মিনিট কুড়ি দেরী।

—প্যারিসে সে আর টিকতে পারলে না, ছুটে এলো লণ্ডনে; ওয়েষ্ট এণ্ডে জায়গা পেলে না ; ইষ্ট এণ্ডে কাটালো পনের দিন স্লামের ভিতরে। সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলো তাকে, আমার এক বন্ধু বার্লিনে। তাকে পেয়ে আমরা সবাই খুশী হলুম।

লতিকা অবাক হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, খুশী হলে কেন ?

অমল গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, য়ুরোপের কোন ভাষাই সে ভাল করে জানতো না—ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতো। আমরা করলুম তাকে আমাদের ক্লাবের ষ্টুয়ার্ড—আমাদের ঘর আগলে রাখতো সে।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া অমল বলিতে লাগিল, দুপুর রাতে নাৎসি ষ্টর্ম্ ট্রুপস্ এসে ক্লাব ঘিরে ফেললে—আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলে। ছেলেটাকে দু দিন রেখে ছেড়ে দিলে।

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটির তারপর কি হলো ?

চাপা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল উত্তর দিল, জানি না ; তাকে খুঁজতেই আমি বের হয়েছি।

অমল আর কোন কথা বলিল না, গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, এটা কি আর একটা গল্প ; ছ্যাঃ !
অধীরভাবে অমল উত্তর দিল, গোড়া থেকে আমি বলছি—এটা গল্প নয়—সত্যি ঘটনা—আমার একটা কথাও মিথ্যে নয়।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া কহিল, সত্যি হলেও, এ সত্যির এখনও শেষ হয়নি; এতে না আছে মিলন, না আছে ট্র্যাজেডি। আমি বলছি, তারপর কি হলো।

মাথা ঝাঁকাইয়া উৎসাহের সহিত লতিকা বলিল, বেশ, আপনিই গল্পটা শেষ করুন।

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত নিরঞ্জন কহিতে লাগিল, সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে ছোকরা সোজা চলে এলো ওয়ারসতে। সঙ্গে ছিল—ট্রান্‌জিট্ ভিসা ফর পোলাণ্ড—দাঁড়াবার হুকুম নেই। পোলা নেগরীকে দেখেছ? সেখানকার সব মেয়েরা হলো এক একজন পোলা। দুদিন ঘুরে ঘুরে সে তাদের দেখলে—কোন হুঁস্ নেই ছোকরার—কাঁচা বয়েস। পোলাণ্ড ছেড়ে যেই রাশিয়ায় ঢুকতে যাচ্ছে সে, ফ্রন্টইয়ারে আটকালো তাকে; প্রিভেণ্টিভ্ অফিসার পোলাণ্ড পার হতে দিলে না; ধরে নিয়ে এলো ব্রিটিশ কন্‌সালের আফিসে। বুড়ো কন্‌সাল চটে উঠলো, অনেক করে তাকে ধমকালো। ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, আমায় বার্লিনে পাঠিয়ে দাও, সেখান থেকে আমি দেশে চলে যাচ্ছি। কন্‌সাল আর পোল অফিসার মুখচাওয়াচায়ি করতে লাগলো। বুড়ো কন্‌সাল মুখ কালো করে বললে খরচা দিতে পারবে না, দেবে পোলাণ্ড। প্রিভেণ্টিভ অফিসার ছোকরাকে নিজের খরচায় বার্লিনে ফিরে যেতে বললে। ছোকরা কিন্তু বড্ড চালাক, গোড়াতে এতটা ভাবতে পারেনি, একেবারে বেঁকে বসলে; সে বললে, একটা কানাকড়িও তার নেই। গভর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে টাকা বের করা সোজা নয়, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেক ভেবে চিন্তে পোল অফিসার ছোকরাকে দিলে ছেড়ে।

লতিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল,

চুপ করলেন যে? আপনার গল্প অমলদার চাইতে ঢের বেশী এক্‌সাইটিং।

—রাশিয়াতে সে একমাস কাটালো, ঘুরে ঘুরে সোভিয়েটদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলো। তারপর চলে এলো রুমানিয়ায়, ট্যাঁকে আর একটি পয়সা নেই;—কুলপি সেখানে কেউ খায় না—বড্ড ঠাণ্ডা সে দেশ। কি আর করবে; এসে হাজির হলো ব্রিটিশ কন্‌সালের অফিসে। কন্‌সাল বুড়ো;—তারও এক ছেলে এমনি ভবঘুরে। সব শুনে টুনে, তাকে দশ পাউণ্ড দিয়ে দিলে। নিজের পকেট থেকে দিলে, না সরকারী তহবিল থেকে দিলে, সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

—তারপর?

—তারপর এলো সে টার্কিতে; সেখান থেকে বুলগেরিয়া—গ্রীস হয়ে; আবার ট্যাঁক খালি। এবারকার কন্‌সাল বড্ড কড়া; ধমকে বললে, দেশে ফিরে যাও; পনের পাউণ্ড ধার দিলুম—তিন মাসের ভেতরে শোধ করবে।

মুখ আরও গম্ভীর করিয়া নিরঞ্জন বলিতে লাগিল, য়ুরোপের ম্যাপ ভেরিফাই করা হয়ে গিয়েছে। জাহাজে বসে ভাবলে সিভিলিজেশন্ বড্ড বিশ্রী;—হাড়ে হাড়ে চটে উঠলো য়ুরোপের ওপরে;—ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা এর চাইতে ঢের ভাল। এক এক করে সব বিলিতি পোষাক সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। যে কাপড় পরে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল খুঁজে-পেতে সেখান বার করলে—কোমরে জড়িয়ে নিলে।

কোন রকমে হাসি চাপিয়া লতিকা বলিল, তারপর?

—বোম্বেতে ল্যাণ্ড করে বাড়ীতে তার করলে; টিকিট কিনলো হরিদ্বারের।

—হরিদ্বার কেন? লতিকা উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল। নিরঞ্জন সে কথার জবাব দিল না; বলিল, কনখেলে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হলো—ইয়া বড় বড় সাদা দাড়ি আর গোঁফ; জটার ভারে দাঁড়াতে পারে না—বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মুখ গম্ভীর করে সাধু বললে, পয়লা সংসার; পিছু সন্ন্যাস, পবি যেমন করেছে।

লতিকার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

—সন্ন্যাসী শিষ্যের কানে কানে দিলে এক নিগূঢ় মন্ত্র।

অমল সহাস্যে বলিল, থামলে কেন? শেষ করে ফেল।

—গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শিষ্য বাড়ী ফিরে এলো। হারানিধি পেয়ে বাপ-মা দিশাহারা হলেন;—সাত দিন সাত রাত উৎসব চললো। টুকটুকে মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দিলেন বিয়ে। নবীন সন্ন্যাসী এখন আর ম্যাপ ভেরিফাই করতে বের হন না; নবীন তপস্বিনীর কাছে প্রোবেশনারি করছেন।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল; নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে হাঁকিল, ফারপো।

৪

আরও বছরখানেক পর।

পবিত্র মৃদুস্বরে বলিল, অনেক করে ভেবে দেখেছি, অমল—তোমার দলে আমি যেতে পারবো না।

অমল বিরক্ত হইল; বলিয়া উঠিল, আসতে পারবে না কেন? এদ্দিন পরে একথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু শুধু আমায় হয়রান করলে তুমি।

পবিত্র ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, ভেবে চিন্তে দেখতে হবে না ?

—কি ভেবে দেখছ তুমি ? আমাদের গলদটি কোথায় দেখতে পেলে ?

পবিত্র চুপ করিয়া রহিল।

জোরে টেবিলে ঘা দিয়া অমল চীৎকার করিল, চুপ করে থাকলে চলবে না পবিত্র !

পাশের ঘর হইতে লতিকা ছুটিয়া আসিল ; বিরক্তির সহিত বলিল, দুমিনিটও হয়নি, ছেড়ে গেছি ; এরই ভেতরে ঝগড়া বাধিয়ে তুলেছো ! কি হয়েছে অমলদা, ওঁকে তুমি কি জিজ্ঞেস্ করছিলে ?

অমল লতিকাকে একপাশে সরাইয়া দিল ; তীব্রকণ্ঠে কহিল, আজকে এর একটা হেস্তনেস্ত করবো ; আর আমার সহ্য হচ্ছে না ! কেন তুমি জয়েন করবে না, তোমায় আজ বলতেই হবে। নইলে আমি ছাড়বো না।

পবিত্র এখনও কোন কথা বলিল না। লতিকা তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল ; সহাস্যে বলিল, বেশতো, তুমি কমিউনিষ্ট দলে না যেতে চাইলে, অমলদা তো তোমায় জোর করে টেনে নিতে পারে না ? কেন জয়েন্ করবে না বলতে দোষ কি ?

পবিত্র ক্ষুণ্ণভাবে জবাব দিল, তোমরা তো এক কথা বলবে, আবার আমার কথা সহ্য করতেও পারবে না।

—তোমার কথা বলা বরং সহ্য হয়, কথা না বলা একেবারেই সহ্য করতে পারি না। লতিকা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল।

—বেশ আমি বলছি ; শেষটায় আবার রাগ করো না, অমল।

অমল কোন উত্তর দিল না ; গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পবিত্রের কথা শুনিবার আগ্রহ তাহার আর ছিল না।

পবিত্র বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না কমিউনিজ্‌ম্‌ সব দেশে স্প্রেড্‌ করতে পারে—

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পারবে না ?

—কি করে স্প্রেড্‌ করবে ? কার্ল-মার্কস কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্‌টো বের করেছিলেন, একশ বছর আগে। সে সময়কার আর এখনকার অবস্থা কি এক ?

অমলের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি; সে গম্ভীরভাবে বলিল, এর জন্য আর কথা-কাটাকাটির দরকার দেখছি না ;—সোভিয়েট রাশিয়াই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

—সোভিয়েট রাশিয়ার কথা আলাদা।

অমল হাঁকিল, একবার বলবে, চলবে না ; প্র্যাকটিক্যাল ইলাস্‌ট্রেশন দিলে বলবে, এক্‌সেপশান প্রুভস্‌ দি রুল।

পবিত্র তাড়াতাড়ি বলিল, আমি এভাবে কথাটা বলিনি। আমি বলতে চাচ্ছি, পেটিট্‌ বুর্জোয়াদের মার্কস ভাল করে চিনতে পারেননি ; চিনতে পারেননি বললে ঠিক বলা হবে না ; মার্কসের আমলের গরিব ভদ্রলোক আর এখনকার আমলের গরিব ভদ্রলোক এক নয়। সে সময়ে তারা সবাই ছিল রিএকশনারি—কোন অদল বদল, তারা চাইতো না ; তাদের কোন দলও ছিল না, যাদের কোন জোর অথবা স্বাধীন মতামত থাকতে পারে। মার্কস ভেবেছিলেন, শেষটায় এরা সবাই এসে মজুরদের দলে ভিড়বে। সব দেখে শুনে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, ছোট ছোট কলকারখানা, ছোট ছোট দোকান—কারবার—টুকরো টুকরো জমি নিয়ে চাষ-আবাদ পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পাবে ; ক্যাপিটালিজম্‌ হাঁ করে এ সব গিলে ফেলবে। মার্কসের এ ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে কি ?

অমল কোন জবাব দিল না।

পবিত্র বলিতে লাগিল, আমরা বরং ঠিক উল্‌টো দেখছি। ইংলণ্ড জার্ম্মানি, আমেরিকা—যে সব দেশে ক্যাপিটালিজ্মের চরম বিকাশ হয়েছে—এসব দেশে এখনও ছোট ছোট দোকান রয়েছে, কলকারখানা চলছে। একথা ঠিক, ছোট ছোট কলকারখানা আব দোকান বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে না। কিন্তু একদল লোক সব দেশে সব সময়ে রয়েছে—যারা কিছুতেই হার মানতে চাইছে না; এরা কারও অধীনে কাজ করতে চাচ্ছে না, বুদ্ধি এদেব খুব টনটনে। যেই একটা ফেল পড়বার মত হয়ে ওঠে, ওমনি সেটা ছেড়ে দিয়ে, আর একটা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এতে করে সব সময় নূতন নূতন কাজ করে তাবা বেঁচে রয়েছে; একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে মজুরদেব দলের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারেনি।

অমল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এদের কতটুকু শক্তি! কতটুকু অর্থবল। তুমি ভেবেছ এবাই কমিউনিজম্‌কে আটকে রাখছে, স্প্রেড্ হতে দিচ্ছে না?

—শক্তিহীন বলেই না এবা সমাজের কোন পরিবর্ত্তনেব কোন সহায়তা করতে পারে না। কিন্তু এদের ভেতরেও আর এক দল রয়েছে, যারা মজুর নয়, বড় লোকও নয়; এবাই হচ্ছে গিয়ে আজকার দিনে সব চেয়ে শক্তিমান;—এদের তুমি দলে টেনে নেবে কি করে?

লতিকা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এরা কারা?

—এরাই হচ্ছে নিউ পেটিট্‌বুর্জ্জোয়া! গরিব ভদ্রলোক এদের আর বলা চলে না; দুই একজনের অবস্থা হয়তো তেমন ভাল না হতে পারে, কিন্তু এরা গরিব নয়। মাকর্স ভেবেছিলেন, ক্যাপিটালিজ্মের পর প্রোলিটেরিয়েট্‌দের যুগ এসে পড়বে, এ তো আমরা দেখছি না।

আমরা দেখছি, আর এক দল লোককে—যারা বিদ্যেয়, বুদ্ধিতে, কর্ম্ম-দক্ষতায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরা সবাই জানে তাদের নিজেদের শক্তি কি প্রচণ্ড। ধনিকদের মত টাকাওয়ালা না হলেও, ধনিকদের এরা চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! এরা হচ্ছে আজকের দিনে কারবারের ম্যানেজার, কারখানার এঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কের বড় বড় অফিসার। এরাই তো ইনডাষ্ট্রিয়ালিজেশন্ চালাচ্ছে, শেয়ার-হোলডার তো ঘুমিয়ে রয়েছে—ডিভিডেণ্ড পেলেই খুশি। সবাই আবার ডিভিডেণ্ডের জন্য বসে থাকে না; শেয়ার মার্কেটে জুয়ো খেলে দুপয়সা রোজগার করে। এদের মাত্র একটি কমপিটিটার রয়েছে, সে হচ্ছে গিয়ে ফিনান্-সিয়ার। কারখানা এরা চালালে কি হবে? এদের সবার টিকি রয়েছে বাঁধা ধনিকদের কাছে। যা খুশী তাই এরা সবাই করতে পারে না; ফিনান্সিয়াররা এদের অনেক ভাল ভাল স্কিম টার্ণ ডাউন করে দেয়। হলে কি হবে; নিউ পেটিট্ বুর্জ্জোয়া এখনও ক্যাপিটালিজমের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মজুরদের ওপরে এদের যে সিম্প্যাথি নেই এও নয়।

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, রাশিয়াতে কি এরকম লোক নেই?

পবিত্র গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, এ কথা এখন আর উঠতে পারে না। রাশিয়াতে এরকম কোন দল আগে ছিল না।

তারপর সে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমল কোন কথা বলিল না। পবিত্র আবার আরম্ভ করিল, রেভলিউশনের আগে রাশিয়া অনেকটা ভারতবর্ষের মত ছিল, কলকারখানা কম, তাও আবার সব জায়গায় নয়। সেখানকার ম্যানেজার আর এঞ্জিনিয়াররা সবাই বিদেশী—ঠিক আমাদের দেশের সেকেণ্ড এডিশন।

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, তোমার লেক্‌চার তো অনেক

শুনলুম ; এবারে আমাদের দেশের কথা বল। এখানে কমিউনিজমের কোন বাধাই আমি দেখছি না।

—আমাদের কথা পরে বলছি। নিউ পেটিট্ বুর্জ্জোয়া এরা মোটেই কন্জারভেটিভ নয়। এরাও চাইছে সমাজের ভেতরে একটা অদল বদল যাতে করে লোকের সুখ সুবিধে হয়, যাতে করে ধনিকরাই লাভের সবটা চেয়ে না বসে। তোমরা কমিউনিষ্টরা এদের একেবারে আমল দিলে না, বিপিন পালকে কংগ্রেসীরা যেমন ঠেলে নিয়ে গিয়ে বসালে ইংলিশ-ম্যানের অফিসে, তোমরাও করলে তেমনি; নিউ পেটিট্ বুর্জ্জোয়াকে ঠেলে দিলে ধনিকেদের দলে।

—ধনিকদের দলে ঠেলে দিলুম আমরা? অমল অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—ঠেলে না দিলেও স্বাভাবিক ভাবে এরা ধনিকদের দলে গিয়ে ভিড়লো।

লতিকা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, স্বাভাবিক ভাবে কেন? এদের দুদলের স্বার্থ কি এক?

—স্বার্থ হয়তো এক নাও হতে পারে। এতেই কি সব? কার-খানার মালিক যেই হোক না কেন, একে চালায় দুদল লোক, এক দল মাথা দিয়ে, আর এক দল হাত দিয়ে। মাথাকে হাত সব সময় বাধা দিতে লাগলো ; মাথা এ সহ্য করবে কেন? নতুন নতুন কল আবিষ্কার করলে, হাত ভাবলে মাথাই আমার পরম শত্রু—আমায় ছাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। মাথা এবারে চটে উঠলো, ভাবলো, ভারি আপদ এসে জুটেছে তো, কাজ করতে দেবে না। মাথা হচ্ছে কাজ-পাগলা ; পেটের ধান্দাও তার খুব বেশী নেই, মোটা মাইনে পায়। ধনিকের মত আলসে নয়। শুধু শুধু বসে বসে খেতে সে চায় না, এত টাকাও সে জমাতে

পারেনি। একেবারে উঠে পড়ে লাগলো ; চটে গিয়ে এমন সব কল বানাতে লাগলো, যা কেউ কোন দিন ভাবতে পারেনি। নতুন কলে পুরোন মজুর আর দরকার হয় না, রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে সেই সব কল চালান যায় এমন ফুলপ্রুফ সেই সব মেশিন্। ট্রেড ইউনিয়ানের ঠিক দাঁত ভেঙে দিলে ? থাকবে কি করে ? এ সব কলে মজুর খুব কম লাগে, যে কোন দিন কোন কল চালায়নি, হয় তো ফেরি করে বেড়িয়েছে, সেও চোখ বুজে নতুন কল চালাতে পারে। এতে করে এলো র‍্যাশান্যালিজেশনের যুগ।

অমল তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, র‍্যাশান্যালিজশনই সব শেষ করে ফেললে।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল, এর জন্য দায়ী তোমরা।

অমল চীৎকার করিয়া উঠিল, আমরা ?

পবিত্র উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল, তোমরা নও ? তবে কেন যখন-তখন ষ্ট্রাইক করালে মজুরদের দিয়ে ? মডার্ণ ইন্ডাষ্ট্রি তো চালাচ্ছে নিউ পেটিট্ বুর্জোয়া ; এরা ধনিকদের মত নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় না। এদের বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, যত সব কাজ-পাগলা লোক এরা। সব কাজে বাধা পেলে এরা শুনবে কেন ? মরীয়া হয়ে নতুন নতুন কল বানাচ্ছে—এমন সব কল যাতে করে মজুরদের বিষদাঁত ভেঙে গেছে। পৃথিবীর মজুররা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছে, চোখে সরষে ফুল দেখছে। মার্কস এসব কথা ভেবে দেখেননি ; দেখবেন কোত্থেকে ? সে যুগে সায়েন্স এতটা প্রোগ্রেস করেনি।

লতিকা মাথা ঝাঁকাইয়া উৎসাহের সহিত বলিল, এদ্দিনে বুঝলুম, বিলেতে কেন আর ষ্ট্রাইকের হিড়িক নেই।

পবিত্র সহাস্যে কহিল, কেবল এজন্যেই নয়, ক্রাইসিস ত সবাইকে

শেষ করে দিয়েছে—ক্যাপিটালিস্ট্ আব প্রোলেটেরিয়েট দুদলেরই গেল গেল ভাব।

—আচ্ছা এ না হয় বুঝলুম, যে দেশে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজেশন্ এবকম একিউট ফর্মে নেই, সে সব দেশে নিউ পেটিট্ বুর্জ্জোয়া নেই বোধ হয়। বলিয়া লতিকা সলজ্জ ভাবে হাসিয়া উঠিল।

পবিত্র একটু চিন্তা করিল, মৃদু হাসিযা বলিল, তুমি আমায মুস্কিলে ফেললে দেখছি।

লতিকাব মন আনন্দে অধীব হইল। সে মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, আমি আবাব কি মুস্কিলে ফেললুম তোমায়? আমি তো এসব পডিনি।

—তাতে কবেই তো সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হয়েছে। তাহার বুকে হাত বাখিযা লতিকা আদবেব স্ববে বলিল, না তোমায় বলতেই হবে, আমাব বড্ড জানতে ইচ্ছে কবছে এসব কথা।

—বেশ তো, বই বয়েছে, পডলেই পাব, বলিযা পবিত্র একটু হাসিল।

মাথা ঝাঁকাইযা লতিকা জবাব দিল, ছাই বই! তোমাব মুখ থেকে শুন্‌তে—

লতিকা আব শেষ কবিতে পাবিল না, লজ্জায় বাঙা হইয়া উঠিল।

তাহাব চুল লইয়া খেলা কবিতে করিতে পবিত্র বলিল, বেশ, বলছি, যেখানে বুঝতে পাববে না, বলো।

লতিকা কোন কথা বলিল না, উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পবিত্র আবার আরম্ভ কবিল, দুটো দেশ—ইটালি আর জার্ম্মানি—এ দুটো দেশেই নিউ পেটিট বুর্জ্জোযাবা সব চেয়ে বেশী করে মাথা উঁচু করেছে। দুটো দেশের চেহারা বাইবে এক, ভেতবে আলাদা। ফাসিজ্‌ম্

যখন ইটালিতে এলো—তখনকার চেহারা অনেকটা আমাদের দেশের মত। ছোট ছোট দোকান, কারখানা,—সবাই ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক—খুব বড়লোক সে দেশে বেশী ছিল না। টুকরো টুকরো করে জমি, সবাই চাষ করতো। বড় বড় কলকারখানা সে দেশে সে সময়ে খুব বেশী ছিল না; ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ এত ইন্‌টেন্‌স্ ছিল না, যাতে করে ইটালিতে ভাল রকমের ক্লাস ওয়ার বাধতে পারে। আবার জার্ম্মানির দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখবে,—কি একিউট ইনডাষ্ট্রিয়ালিজম্ সেখানে, ঠিক ইংলণ্ড আর আমেরিকার মত।

লতিকা অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, এতে করে কি হলো? তাহার কথায় কান না দিয়া পবিত্র আবেগের সহিত বলিতে লাগিল, আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি দুটো দেশের আজকালকার চেহারা দেখে, বাইরে থেকে একেবারে চেনা যায় না—কোনটা জার্ম্মান আর কোনটা ইটালি। কি করে এ সম্ভব হলো? ইটালিয়ান ফ্যাসিজ্‌মের মেন্ ষ্ট্রেঙ্গথ হলো গিয়ে পেটিট বুর্জ্জোয়া—জার্ম্মানিতেও এরা—

অমল বাধা দিয়া বলিল, কেন? ইটালিয়ান্ এরিষ্টোক্রেসি জার্ম্মান এরিষ্টোক্রেসি, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ ম্যাগ্‌নেটস্, ব্যাঙ্কার্‌স্—যারা ক্লাস প্রিভিলেজ মেনটেন্ করতে চায়, তারা সবাই এতে রয়েছে।

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, রয়েছে বইকি। কিন্তু এরা এর ড্রাইভিং ফোর্স নয়—এতটুকু আইডিয়ালিজম্ এদের নেই। এর মেন ষ্ট্রেঙ্গথই হচ্ছে, পেটিট বুর্জ্জোয়া। সব চেয়ে অবাক হতে হয়—দুদেশের পেটিট বুর্জ্জোয়াদের দেখে—এরা একদলের নয়। ইটালিয়ান্ পেটিট বুর্জ্জোয়ারা হচ্ছে ছোট ছোট কলওয়ালা, ছোট ছোট দোকানদার, ছোট ছোট চাষী-মালিক।

লতিকা উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আর জার্ম্মানিতে?

—এন্‌জিনিয়ার, টেক্‌নিশিয়ান, কেমিষ্ট—সবাই যারা সে দেশের ইন্‌ডাষ্ট্রিতে র‍্যাশানালিজেশন এনেছে। এ ছাড়া অবশ্য দুদেশের তরুণ ও তরুণীরা—যাদের আর করবার কিছু নেই—তারাও এতে যোগ দিয়েছে।

লতিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, তুমি সব সময়—র‍্যাশানালিজেশন্—র‍্যাশানালিজেশন্ করছো। সেটা কি? ভূত না প্রেত, যারা ভয়ে লেবার আঁৎকে উঠেছে?

এমনি সময় নিরঞ্জন নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার দখল করিল। তাহাকে দেখিয়া পবিত্র আর কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, চুপ করে রইলে যে বড্ড, বলবে না, র‍্যাশানালিজেশন কাকে বলে?

পবিত্রের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল; বলিল, আর না, নিরু এসেছে—আর কোন কথা পাড়ো।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, দেখ পবি, তোর সব কাজেই বাড়াবাড়ি, বেচারা তোর কথা শোনবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে—আর তুই গম্ভীর ভাবে বলে বস্‌লি—আজ আর নয়। কেন, মিস্ গুপ্ত এসব সহ্য করবে? সে কি—

নিরঞ্জন কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে ভাবিয়া পবিত্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বলছি।

ইহার পর লতিকার আর কোন কথা শুনিবার উৎসাহ ছিল না; উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিল না।

পবিত্র গম্ভীর ভাবে বলিল, এক কথায় র‍্যাশানালিজেশন্ বোঝাতে হলে বলতে হয়—সব চাইতে বেশী মূলধন খাটিয়ে সব চাইতে বেশী

করে লাভ করবার প্রচেষ্টা, পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্য থেকে যতটা সম্ভব মানুষকে বাদ দেওয়া ; কাঁচা মাল খুব কম করে খরচ করে, বেশী করে পাকা মাল তৈরী করা ; সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের ভিতরে এমন একটা ব্যবস্থা করা, যাতে করে নিখরচায় বেশী কাজ পাওয়া যায়,—লাভ হয় খুব বেশী।—এই সব আব কি। ভাল করে বলতে হলে, হোল প্রসেস্ অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন্ ডিস্‌কাস্ করতে হবে।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া লতিকা কহিল, না হয় আর একদিন বুঝিয়ে বলো ; আজ থাক ইটালি জার্ম্মানীর কথা।

অমল হুঙ্কার দিল, আজ আর কোন কথা হবে না এখানে। পবিত্র, থামলে যে বড্ড ?—ফ্যাসিজ্‌ম্ কি করে এলো ?

পবিত্র দেখিল, অমল একেবারে নাছোড়বান্দা ; গম্ভীর ভাবে বলিল, সে সব তো তুমি জান—নিজে দেখে এসেছো—আমায় শুধু শুধু—

অমল বিদ্রূপের স্বরে জবাব দিল, তোমার মতটা শুনতে বাধা আছে কি ?

নিরুপায় হইয়া. পবিত্র বলিতে আবম্ভ করিল ; দুদেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা দুরকম হলেও—এক জায়গায় দুটোর আশ্চর্য্য মিল ছিল ;—দুটো দেশই একেবারে হয়রান হয়ে গিয়েছিল, যাকে বলে সসেমিরা অবস্থা। তা থেকে গড়ে উঠলো এক একটা নতুন দল ;—ইটালিতে ফ্যাসিষ্ট ,—জার্ম্মানিতে নাৎসি। লড়াইয়ে জিতেও ইটালি ইংরেজ আর ফরাসীদের কাছে সম্মান পেলে না ; জার্ম্মানি হেরে গিয়ে কি লাঞ্ছনা ভোগ করেছে সবাই জানে। এ নিদারুণ অপমান তরুণ ইটালি আর তরুণ জার্ম্মানির অসহ্য হলো। তারা সব হয়ে উঠলো পুরো-দস্তুর ন্যাশনালিষ্ট ; সোসিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্টদের ইন্‌টারন্যাশনালিজম

সে দেশের তরুণ-তরুণী বরদাস্ত করতে পারলে না। মরীয়া হয়ে, তাদের ওপরে যাচ্ছেতাই অত্যাচার সুরু করে দিলে। কিন্তু হলে কি হবে, ইটালির ফ্যাসিজ্‌মের পেছনে একটা ফিলজফি, একটা আদর্শ গড়ে উঠলো; নাৎসিদের ভেতরে এখনও সে রকম কিছু ফুটে ওঠেনি।

তীব্র কণ্ঠে অমল বলিয়া উঠিল, ফিলজফি না তোমার মাথা। যত সব অপরচুনিষ্ট।

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, গোড়াতে তাই ছিল; এখন আর সে রকম নেই। মুভমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে একটা আইডীয়া গড়ে উঠেছে, একথা আজ না মেনে আর উপায় নাই।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, সে আইডীয়াটা শুনতে পারি কি?

—দি কন্‌সেপশন্ অব্ দি টোটালিটেরিয়ান্ ষ্টেট্—দি করপোরেট ষ্টেট; এ ফিলজফি এরা পেয়েছে—হেগেলিয়ান্ ন্যাশনালিজ্‌ম্ থেকে।

—সেটা আবার কি?

—এ ফিলজফি বলছে, ষ্টেট সবার ওপরে। রাষ্ট্রের কাজে সবাইকে মাথা নোয়াতে হবে, ইন্‌টারন্যাশানালিজ্‌ম্, সুপার ষ্টেট এসব বাজে কথা, ষ্টেট সব বিষয়ে হাত দেবে, ধনিক আর মজুর সব দেশে রয়েছে, চিরকাল থাকবেও; তাদের মারামারি কাটাকাটি করতে দেওয়া হবে না। করলে ষ্টেটের লোকসান হয়, ষ্টেট তাদের সেজন্য সাজা দেবে যদি দরকার মনে করে। এখন যেমন মানুষের অবাধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রয়েছে, যা খুসি তাই করতে পারে—অবশ্য আইন বাঁচিয়ে, তেমনি আইন বাঁচিয়ে ধনিক আর মজুরদের চলতে হবে, দরকার হলে ষ্টেট যে কোন কারখানা দখল করতে পারবে, চালাতে পারবে, এতে ধনিক আর মজুর কারও কথা শুন্‌তে ষ্টেট বাধ্য নয়। ষ্টেট ধনিককে চোখ রাঙিয়ে বলছে, লাভ করতে চাও কর, কোন কথা বলবো

না, কিন্তু রয়ে-সয়ে। সব সময়ে মনে রাখবে তুমি আমার ডান হাত আর মজুররা আমার বাঁ হাত ; দুটো হাতই আমার চাই, একটা মোটা আর একটা সরু হলে চলবে না আমার। মজুরদের ফাঁকি দিতে চেয়েছ কি মরেছো। বেশ, আমি তোমার লাভ পাবার স্থবিধে করে দিচ্ছি। এই দেখ, চারদিকে কেমন ট্যারিফ ওয়াল উঠিয়েছি। আর কি চাই বল, সব আমি করে দিচ্ছি, কিন্তু আমায় সব সময় মানতে হবে। আবার মজুরদের শাসান হচ্ছে, তোমার ট্রেড ইউনিয়নিজ্‌ম্‌-টিজ্‌ম্‌ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে ; আমার ট্রেড ইউনিয়ানের ভেতরে তোমায় আসতে হবে ; ষ্ট্রাইক করতে কোন দিন পারবে না। আমি শালিস বসাব ; যদি আমার শালিসি না মান. দেখছো আমার দল, একেবারে মাথা ভেঙে দেব না! বলিয়া পবিত্র উত্তেজনায় হাসিয়া উঠিল।

লতিকা উৎস্থক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুসোলিনি, হিট্‌লার—এরা এত পাওয়ারফুল হলো কি করে ?

—হবে না? চারদিকে যে হট্টগোল লেগে গেল—সবাই কথা বলছে, যার যা খুসি করছে! যে জোর গলায় বলতে পারে, যে যা চাইবে সব পাবে, শুধু আমার কথা শুনে চল। তার কথা কে না শোনে বল ? সব্বাই চুপ, একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল। ষ্টেট বললে, তোমরা সবাই সব বুঝবে না। কি করে বুঝবে বল ? এদেশের কটা লোক পলিটিক্‌স্ বোঝে ? মুসোলিনি আর হিটলার হেঁকে বললেন, আমার কথা শুন্‌বে না ভোট দিয়ে সব ঠিক করবে। ভোট দিয়ে দিয়ে তারা হয়রান্ হয়ে গিয়েছিল। বললে, আমরা তোমাদের চাই। ওসব আমরা কি করে বুঝবো বল ? কমিউনিষ্ট আর সোসিয়ালিষ্টরা এই করে আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। ষ্টেট তরুণদের দিকে মুখ

টিপে হেসে বললে, বুড়োদের তোমরা চাও? ছেলেমেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। হাঁ করে রইলে যে বড্ড? পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট মানে বুড়োদের রাজত্ব; ইয়ং পিট ছাড়া আর কোন ছোকরাকে সেখানে মাতব্বরি করতে দেখেছো কোনদিন? আজ্ঞে না। বেশ, পার্লামেণ্ট রাখতে চাও, রাখ; কিন্তু বাইরে একটা দল কর—মস্ত বড় দল—যার কথা না শুনলে, দেখিয়ে দেবে কি করে শোনাতে হয়। এই থেকে গজিয়ে উঠলো ফ্যাসিষ্ট আর নাৎসি মুভমেণ্ট।

তারপর সে মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষনো টিক্‌বে না, টিকে থাকতে পারে না, তোমরা দেখে নিও। বড় জোর দুচার দশ বছর, একশো দুশো বছরও টিকতে পারে।

লতিকা ফিক করিয়া হাসিল; বলিল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, কেন? একশো দুশো বছর আর কটা দিন, সমাজের পক্ষে? হাজার বছর তো একটা চোখেব পলক।

নিরঞ্জন গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ফ্যাসিজ্‌ম্ কেন টিক্‌বে না?

—কি করে টিক্‌বে, তুমিই বল? কলওয়ালাকে বলা হচ্ছে, বড় রকমের ডিভিডেণ্ড পাবে; মজুরকে বলা হচ্ছে, মাইনে বাড়বে, কাজ কম করতে হবে; বাড়ীওয়ালাকে বলা হচ্ছে, ভাড়া বেশী পাবে; ভাড়াটেকে বলছি, ভাড়া কম করে দিতে। এ কি কখনও হতে পারে?

লতিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, এ কি হয়?

পবিত্র গম্ভীর ভাবে বলিল, এও হতে পারতো, যেমন ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের গোড়াতে হয়েছিল, সেদিন কি আর রয়েছে? আজ সব দেশে কলকারখানা গড়ে উঠেছে, বাজার হয়ে আসছে দিন দিন ছোট।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, তাহলে তুমি আমাদের দলে আসবে না ?

—কি করে যাব বল ? সেদিন তোমায় বলেছিলুম, এখন কমিউ-নিজ্‌মের রব ওঠালে, ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে এদেশে ডেকে আনা হবে, এ আমি কক্ষনো সহ্য করতে পারবো না। একেই এদেশের গভর্ণমেণ্টে অত্যন্ত ষ্ট্রং ; এর শক্তি আরও বেড়ে যাবে। সে প্রচণ্ড শক্তির কাছে আমরা কি আর কোন দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো ?

জবাব শুনিয়া অমল গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা হাসিয়া বলিল, আর কেন অমলদা ? ঢের হয়েছে। এবারে চা খেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়া যাক।

—হুঁ ! অমলের ভাব অনেকটা—আচ্ছা দেখা যাক্।

লতিকা চা আনিতে ছুটিল।

৫

পরদিন ভোর বেলা অমল আবার যখন পার্ক সার্কাসে আসিয়া উপস্থিত হইল, পবিত্র তখন বাড়ী ছিল না। লতিকা রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বয়কে বাজারে যাইবার জন্য তাগিদ দিতে-ছিল। অমল নিঃশব্দে খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

ঘর গুছাইতে আসিয়া লতিকা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে ? এরই ভেতরে রাউডন্‌ স্কয়ার থেকে ঘুরে এলে ?

অমল টেবিলের উপর খবরের কাগজ নামাইয়া রাখিল।

—অমলদা! এত ভোরে! আমি ভাবলুম—

—পবিত্র, না? বেশ তো আমায় পবিত্র মনে করে—

—ছিঃ! তুমিও নিরঞ্জনবাবুর মত স্থুরু করলে? রাতে ঘুমোতে পারনি, না? বলিয়া লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

অমল অবাক হইল।

—হাঁ করে চেয়ে রয়েছ যে? নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারনি।

—কেন পারবো না? বেশ ঘুমিয়েছিলুম।

মাথা ঝাঁকাইয়া লতিকা বলিল, মিথ্যে কথা! নিউ এম্পায়ারে বসে বসে যে রকম উস্‌খুস্‌ করছিলে! একটু বসো, আমি চট্‌ করে চা করে নিয়ে আসছি।

—পবিত্র এলে একসঙ্গে হবে'খন। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে? বসো—গল্প করি।

—কি আছে আজকের কাগজে?

—রোজ যা থাকে—ডিস্‌-আর্মামেণ্ট কন্‌ফারেন্স। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

একটা চেয়ার দূরে টানিয়া লইয়া লতিকা বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অমলদা, তুমি কি সত্যি ওঁকে তোমাদের দলে নিতে চাচ্ছ? পারবে?

—তোমার কি মনে হচ্ছে?

—বুঝতে পারছি না?

—পবিত্র কি আমাদের দলে আসবে না?

—কি করে বলবো?

—দুজনে এদ্দিন ধরে ঘর করছো, এখনও—

—সত্যি বলতে কি অমলদা, আমি ওঁকে এখনও ঠিক্ বুঝে উঠ্তে পারিনি। বলিতে বলিতে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল।

তারপর সে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁকে কি তোমার সত্যি দরকার অমলদা? কটা লোক উনি চেনেন্। নতুন লোকের সামনে কথা বলতে গিয়ে চোখ মুখ লাল করে বসেন। পারেন শুধু বসে বসে বই পড়তে আর ছাই পাঁশ সব ভাবতে। কোন কাজ ওঁকে দিয়ে হতে পারে, এ আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তুমি শুধু শুধু—

—হয়রান হচ্ছি, না? এটুকু হয়রান আমাকে হতেই হবে। পবিত্র যে দলে যাবে, সে দলে ও হবে একটা অ্যাসেট্।

—অ্যাসেট্! লতিকা অবাক হইয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—ওকে কিচ্ছু করতে হবে না।

—কিচ্ছু করতে হবে না?

—না।

লতিকা একটু নিশ্চিন্ত হইল; তারপর উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে ওঁকে এত টানাটানি করছো যে?

—না করে কি করি বল? সমস্ত চিন্তার ভার ওকে দিয়ে, আমি শুধু লোক জোগাড় করবো—দেশের ভেতরে একটা তুলকালাম লাগিয়ে দেব।

—সত্যি বলছো তুমি অমলদা, আর কোন কাজ ওকে করতে হবে না? আর সব যেমন আছে, ঠিক তেমনি থাকবে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ; আর সব যেমনি আছে, ঠিক তেমনি থাকবে, কোন ভয় নেই তোমার। বলিয়া অমল মুখ টিপিয়া হাসিল।

তারপর লতিকার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া

বলিল, আমার একটা রিকোয়েষ্ট রাখবে? আমার হয়ে ওকে একবার বলবে?

লতিকা শঙ্কিত হইল, বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না; জিজ্ঞাসা করিল, কি বলতে হবে আমায়?

—বলবে, এতে কোন দোষ নেই।

লতিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভীত চকিত কণ্ঠে বলিল, তোমায় আমি একটুও বিশ্বাস করতে পারছি না অমলদা।

—না না, সত্যি বলছি, এতে ভয় করবার কিছু নেই।

লতিকা মনে মনে বলিল, ভয় নেই; ভরসাও যে পাচ্ছি না আমি।

—কি ভাবছো?

—কি আর ভাববো? তোমার কথা—

—তাহলে বলবে ওকে আমার হয়ে? আমার রিকোয়েষ্ট না রাখলেও তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখবে।

লতিকা এদিক ওদিক চাহিয়া জবাব দিল, আমার কথা রাখবেন? ভয়ানক গোঁ ওঁর—তুমি তো জান না, অমলদা।

—আলবৎ রাখবে, ওকে রাখতেই হবে; বলিয়া অমল সজোরে টেবিলে করাঘাত করিল।

লতিকা সহজ স্বরে বলিল, তোমার রিকোয়েষ্ট আমি রাখবো, যদি তুমিও আমার একটা কথা রাখ।

অমল অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, রাখবো, নিশ্চয়ই রাখবো—একটা কেন—একশো কথা তোমার আমি রাখবো।

তিন চার মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, লতিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, কথা দিচ্ছ তুমি, ঠিক রাখবে?

তারপর সে মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, অমলদা, তুমি বিয়ে কর। অমল গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল; কোন উত্তর দিল না।

দুষ্টু হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, রেভলিউশন্ করার চাইতে এটা নিশ্চয়ই কিছু শক্ত কাজ নয়?

—কম শক্ত বলে আমার তো কোনদিন মনে হয়নি। ভেবেছিলুম, বিয়ে করবো না, তোমাদের দুজনকে দেখে অবধি বড্ড লোভ হচ্ছে আমার।

লতিকা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বড্ড ভুল করছো অমলদা, বিয়ে তো আমরা করিনি।

—না করলেও, একেই বলে বিয়ে—টু. দি এক্সক্লুসন অব অল আদার্স।

লতিকা শঙ্কিত হইল; মুখ কালো করিয়া বলিল, এ কাজও করো না অমলদা; বিয়ে এর চাইতে ঢের ভাল—ঢের বেশি সুবিধে তাতে রয়েছে।

—এতে অনেক ফ্রিডম্ আছে।

লতিকা হঠাৎ উত্তেজিত হইল; বলিতে লাগিল, এ ফ্রিডমের মানে হচ্ছে, অপমান আর অশ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ান? যে যা মুখে আসবে বলবে, আর আমাকে সব সহ্য করে যেতে হবে, কোন জবাব কোনদিন কাউকে দিতে পারবো না। সবাই মনে করবে, আমি এত চীপ—আমাকে নিয়ে যা খুসি তাই করা চলে। পারুক না পারুক, আশা তো রাখে? আর যে যাই ভাবুক—তুমি আর নিরঞ্জন-বাবু—যাক সে কথা! তুমি বরং বিয়ে না করে চিরকাল ব্যাচেলর থাকো, না হয় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে খেয়াল মিটিয়ো—বিয়ে না করে এরকম ঘর-সংসার পেতে বসো না। এতে করে তোমার

কোন ক্ষতি হবে না, তাই বলে কোন মেয়ের এভাবে সর্ব্বনাশ তুমি করো না।

লতিকার কথা শুনিতে শুনিতে অমলের মুখ ক্রমশ কালো হইয়া উঠিল; সে ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি পবিত্র তোমার সর্ব্বনাশ করেছে এখানে এনে?

লতিকা সগর্ব্বে উত্তর দিল, না। সে প্রকৃতি ওঁর নয়; সেজন্যেই না আমি ওঁকে এতটা শ্রদ্ধা করি। উনি কোনদিন আমায় বলেননি ওঁর সঙ্গে চলে আসতে। আমিই ওঁকে ধরে এনে খাঁচার মধ্যে পূরে রেখেছি; কোন বাধা উনি তাতে দেননি।

—তাহলে দুঃখ করছো কেন?

—দুঃখ? দুঃখ আমি করিনি; এতেই আমার সুখ; এতেই আমার আনন্দ! আমায় ধরে রাখতে উনি চাননি, কোনদিন চাইবেনও না, আমি জানি।

অমল কোন কথা বলিল না; স্থির দৃষ্টিতে লতিকাকে দেখিতে লাগিল।

লতিকা আবেগের সহিত বলিতে লাগিল; এই যে ঘর-সংসার দেখছো অমলদা;—এ কার। আমার! কোন দরদ ওঁর এর জন্যে নেই। কোন অভাব ওঁর নেই; এদ্দিন দুজনে ঘর করছি, একদিনও মুখ ফুটে বলতে শুনিনি, এটা আমার চাই—নইলে চলবে না। আজ এই মুহূর্ত্তে আমি যদি ওঁকে বলি, এ সবে আর আমার পোষাচ্ছে না—তোমায় নিয়ে আর আমার থাকা চলে না—দ্বিধা-শঙ্কা-শূন্য হয়ে উনি বলবেন—তুমি ঠিক জেন অমলদা—উনি অতি সহজ স্বরে বলবেন, তুমিই থাক, আমি চলে যাচ্ছি। এক সেকেণ্ড অবধি উনি ভাববেন না, এতটুকু দরদও ওঁর আমার জন্যে নেই। মেয়েদের এ যে কি ভয়ানক

সুখ—তা তুমি বুঝবে না অমলদা ! দোহাই তোমার, এ ভয়ঙ্কর সুখের মুখ আর কোন মেয়েকে তুমি দেখিও না।

লতিকা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কয়েক মিনিট পর নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, ওঁর আসবার সময় হয়েছে, একলা একটু বসো অমলদা ; আমি ওদিকের যোগাড় দেখিগে—ওঁকে আবার অফিস যেতে হবে।

সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কাগজ সামনে রাখিয়া অমল আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

৬

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা পবিত্র, তুমি কি বলতে চাও, যে দেশে ছশো ছত্রিশটা রেস রয়েছে, ভাষা রয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী, ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম, আচার-ব্যবহার রয়েছে, সবার ওপরে ইনটেন্‌স্‌লি কম্‌প্লিকেটেড মাইনরিটি প্রবলেম্‌ রয়েছে, সে দেশের লোক ন্যাশনালিজমের আওতায় দেশ স্বাধীন করতে পারবে ? নূতন গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট সে স্বাধীনতা এনে দেবে ?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, দুটোর কোনটাই আমি বলিনি !

অমল গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার খাঁটি কথাটা শুনতে পারি কি ?

শেষ চাটুকু নিঃশেষ করিয়া পবিত্র বলিল, কোনদিন নেশন:গড়ে উঠবে কিনা বলতে পারি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ;

আর যদিই বা গড়ে ওঠে, সে হবে খুব আস্তে আর খুব দেরীতে—প্রগ্রেস হবে এত স্লো স্পীডে যে এর ওপরে নির্ভর করে কোন কাজ হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

—আর রিফর্ম অ্যাক্ট ?

—এ বিষয়ে আমার মত আরও ডেফিনিট্, একেবারে স্পষ্ট ;—ডেমোক্র্যাসির ট্র্যাডিশন যে দেশে নেই, সে দেশে পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট একেবারে অচল ;—ওপর থেকে একটা পার্লামেণ্টারি ফর্ম চাপিয়ে দিলে, শীগগির ডিক্‌টেটরশিপ এসে পড়ে, যেটাকে আমি সব চেয়ে ভয় করি, আর যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেনট্রাল য়ুরোপ আর ইটালিতে।

লতিকা এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল ; উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, য়ুরোপে হয়েছে বলে, এদেশেও যে ডিক্‌টেটর্‌শিপ গজিয়ে উঠবে কে বললে ?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, কে বললে তা বলতে গেলে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে যে আমাকে।

লতিকা অপ্রতিভ হইল ; কহিল, বেশ, যা বলতে চাচ্ছিলে বল।

পবিত্র ধীর ভাবে বলিল, আমার কথা হচ্ছে, শুধু অ্যাবসেন্‌স্ অব ট্র্যাডিশন্‌ই যে এর একমাত্র কারণ তা নয়। সেক্‌শানাল এণ্ড মাইনরিটি রিপ্রেজেন্‌টেশনের আলাদা বন্দোবস্ত করলে ষ্ট্রং পার্টি ফরমেশন হতে পারে না। এতে করে পার্লামেণ্টারি মেশীনারি ভেঙে গিয়ে ডিক্‌-টেটার্‌শিপ আপনা আপনি গজিয়ে ওঠে, একে ডেকে আনতে হয় না। কম্যুনাল এণ্ড ফাংশনাল রিপ্রেজেন্‌টেশনের জন্য আমাদের দেশেও তেমনি হবে, লাট-বেলাটেরা হয়ে উঠবেন এক একজন ডিক্‌টেটর, রিফর্ম অ্যাক্টে ব্যবস্থাও রয়েছে তেমনি। এতেও হয়তো আমি আপত্তি

করতুম না, যদি এরা মুসোলিনি, হিট্‌লারের মত ন্যাশনাল ডিক্‌টেটর হোতেন। এ ছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে, পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি একটা লাক্‌সারি—বড়লোকদেরই পোষায়; যেটা ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে বেশ চলছে, জার্মানি আর ইটালিতে তা চললো না, লড়াইয়ের পর এরা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত গরিব—পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট টিকিয়ে রাখতে পারলে না।

তাহার কথায় অমল সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, শুধু এজন্যে তুমি নিউ অ্যাক্ট রিজেক্ট করতে চাচ্ছ?

—না আরও একটা বড় কারণ রয়েছে—কন্‌ষ্টিটিউশানাল—আজ অবধি কোন কাগজে এদিক থেকে কোন কথা ওঠেনি।

লতিকা উৎসুক ভাবে বলিল, সেটা তোমায় বলতে হবে। একটু দাঁড়াও, বয়কে একটা কথা বলে আসি।

একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এবারে বল, আর আমায় উঠতে হবে না। বয়কে দেখিয়ে দিয়ে এলুম কি রান্না করতে হবে।

পবিত্র আরম্ভ করিল, নেটিভ ষ্টেটের উপরে আমাদের কোন হাত থাকবে না, আর তাঁরা আমাদের মাথার উপরে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াবে এ আমার একেবারেই সহ্য হবে না। কেন, আমরা কি পাতিয়ালার ভিটেবাড়ীর প্রজা?

লতিকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, হঠাৎ এত চটে উঠলে যে বড্ড?

—চটে উঠবো না। নিজামের ভিটেবাড়ীর প্রজাও এ অন্যায় আবদার সহ্য করতো না। কেন ষ্টেটগুলোকে আমাদের উপরে মোড়লী করতে দেওয়া হবে? এসব আমি মেনে নিতে পারতুম, আমাদেরও যদি পাতিয়ালা, ভূপালের উপরে মোড়লী করতে দেওয়া হতো।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ছাড়া আর কোন কারণ রয়েছে তোমার ?

—রয়েছে বই কি, এটা কি একটা ফেডারেশন্ ? যত সব ধাপ্পা-বাজি ! আল্‌টিমেট্ মভারৃনিটি রইল সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা আরও বেশী বেড়ে গেল না ? পার্লামেণ্ট এখন ষ্টেটের ব্যাপারে ইন্‌ডিরেক্টলি ইন্‌টারৃফিয়ার্ করছে, পরে করবে ডিরেক্টলি। আমাদের লিডাররা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না ; সব্বাই সেফগার্ড আর কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে মেতে রয়েছে।

আকস্মিক উত্তেজনায় পবিত্র লজ্জিত হইল ; মৃদু হাস্যে বলিল, সবাই ভাবছে রাজারাজড়াদের হাত করে ইংরেজ যা খুসি তাই করতে পারবে, বড় লাটের কাছে এদের সবার টিকি যে বাঁধা রয়েছে। কংগ্রেসও ছেড়ে কথা কইবার ছেলে নয়—এদ্দিন এদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি, বড়লাটের সঙ্গে এক জোট হয়ে যেই এরা আমাদের সঙ্গে গে ল বাধিয়ে তুলবে, কংগ্রেসও তেমনি এদের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে এদের সবাব জীবন দুর্ব্বিষহ করে তুলতে পিছপা হবে না, এ তোমরা নিশ্চযই জেনো।

মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া পবিত্র আবার বলিল, লর্ড স্যালিস্‌ব্যরির একটা কথা আমার বড্ড ভাল লেগেছে।

লতিকা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, এও ভাল, এদ্দিন পর শুনলাম তোমার আর কারও কথা ভাল লেগেছে। পবিত্র সে কথার জবাব না দিয়া বলিতে লাগিল, স্যালিস্‌ব্যরি বলেছেন, ফেডারেল লেজিস্‌লেচারে প্রভিন্সের রিপ্রেজেনটেটিভদের ভোট দিয়ে পাঠালে আর ষ্টেটের রিপ্রেজেনটেটিভদের নমিনেট করে পাঠালে দাঁড়াবে এই

যে, ভাইসরয় লেজিস্‌লেচার ডিসল্‌ভ করে দিলে, ষ্টেটের একই রিপ্রেসেনটেটিভ ঘুরে ঘুরে আসবে; এ বড় কম সর্ব্বনেশে ব্যবস্থা নয়।

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল; কেন, তুমি এতে কি ভয় করছো?

—আমি করিনি। লর্ড স্যালিসব্যরি করছেন; তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। ফেডারেল লেজিস্‌লেচারের ইচ হাউসের ষ্টেট রিপ্রেসেনটেটিভ হচ্ছে ওয়ান্ থার্ড, এরা সবাই বাস্তুঘুঘু হয়ে বসে থাকবে; বড়লাট বদলাবে, মিনিষ্টার বদলাবে, ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সদস্য সবাই বদলে যাবার সম্ভাবনা, আর এরা সবাই ঠায় বসে থাকবে যতদিন প্রিন্সদের খুশী রাখতে পাববে। এতে করে এদের সঙ্গে আর সবাই পেরে উঠবে কেন বল? সেজন্য স্যালিস্‌ব্যরি বলেছেন—"a constitutional dilemma of fundamental importance from which there appears to be no issue remains to be mentioned." অথচ এসব আমাদের দেশের কাউকে বলতে আজ অবধি শুনিনি।

অমল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল; কি করে শুনবে?

পবিত্র উত্তেজিত ভাবে বলিল, কেন? সবাই কি এক জোট হয়ে বলতে পারে না, ষ্টেটদের প্রভিন্সের ওপরে কোন ক্ষমতা দেওয়া হবে না, যদি ষ্টেটদেব ভেতরকার ব্যাপারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কোন হাত না থাকে? তারা কি বলতে পারে না, সভার্নিটি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে রাখলে চলবে না। ফেডারেশনকে দিতে হবে? ইণ্ডিয়ান লেজিসলেচার শুধু, ফেডারেল অ্যাসেম্বলি নয়—বড়লাটের তো অ্যাসেণ্ট দেবাব ভিটো করবার সার্টিফাই করবার ক্ষমতা রয়েছে? হোয়াইট পেপার যেমন করে হোক সেফগার্ড সুদ্ধ পার্লামেণ্ট আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। কেউ একে রুখতে পারেনি,—সেফগার্ড থাকবেই একটিরও

নড়চড় হবে না। কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে যতই হৈচৈ করি না কেন, এর ন্যাশনাল সলিউশন্ এ কনিষ্টিটিউশনে হতে পারে না, এ দুটো আমাদের ঘাড়ে চেপে থাকবেই। কদ্দিন এর মেয়াদ এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

—বেশ তো, সবই বুঝলুম, বুঝলুম না তুমি কি করবে। বলিয়া অমল হাসিয়া উঠিল।

পবিত্র সহাস্যে কহিল, আমার কথা তো হচ্ছে না; আমি বলছিলুম, কন্‌ষ্টিটিউশনালিষ্টের কথা।

—তাদের তুমি কি করতে বলছো; লতিকা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—ইউনাইটেড্ হয়ে ডিমাণ্ড করতে, ভাইস্‌রয় লেজিস্‌লেচারের কাছে রেস্‌পন্‌সিবল না হলেও কিছু এসে যায় না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজ্‌ভেল্ট সেখানকার কংগ্রেসকে নিজের কাজের জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেন না; কিন্তু বড়লাট পার্লামেণ্টের কাছেও জবাবদিহি করতে পারবেন না। কৈফিয়ৎ তাকে দিতে হবে, হিজ্ মেজেষ্টি দি কিং এম্‌পারারের কাছে, আর কারও কাছে নয়। লাটবেলাটদের বাহাল করবার সময়—এদেশের ক্যাবিনেট কতগুলো নাম পাঠাবে, কিং এম্পারার এর ভেতর থেকে একজনকে অ্যাপয়েণ্ট করবেন, বাইরে থেকেও তিনি লোক নিতে পারবেন—অবশ্য যদি ক্যাবিনেট তার সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করে। সেফগার্ড থাকলেও এ সিষ্টেম্ এডপ্‌ট করলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। অমল অবাক হইল; বলিয়া উঠিল, এতে কি হবে?

—কমিউন্যাল এণ্ড পারশন্যাল রিপ্রেসেণ্টেশনের জন্যে এদেশের পার্লামেণ্টারি মেশীনারি ভেঙে পড়বেই, গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ঠিক চলবে;

সেফগার্ড থাকবে। ইংরেজ লাটবেলাটেরা থাকবে, সাহেবদের আশঙ্কার কোন কারণ আর রইল না। আমাদের সুখ সুবিধা খুব সামান্যই হবে, তবে এরই ভেতরে যতটা করে নেওয়া যায় আর কি?

—বেশ, এ না হয় বুঝলুম। এতে—

—একটু সবুর কর, সব বলছি। পার্লামেণ্ট থাকে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে। সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট যা খুশী তাই করছে। আর গোটা কয়েক মেম্বার যারা এদেশ থেকে মোটা হয়ে সেখানে বসে সেই বুড়ো সেক্রেটারিকে চালাচ্ছে, তাদের হাত থেকে আমরা বাঁচবো। সবার ওপরে রইল হিজ মেজিষ্টি—দি সিম্বল অফ দি ব্রিটিশ কমন্-ওয়েলথ অব নেশন্স্। নিজেরা আমরা ঘরে বসে মারামারি করি, কাটাকাটি করি, কিছু এসে যায় না। তুমি যদি কমিউনিজম চাও, দেশের লোককে হাত কর, নিরু ফ্যাসিষ্ট হোতে চাইলেও আমি আপত্তি করবো না যদি এর আগে পলিটিক্যাল এণ্ড লিগাল সভার্নিটি ট্রান্সফার হয়ে আমাদের হাতে আসে। বলিয়া পবিত্র ঘড়ির দিকে তাকাইল।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লতিকা বিরক্ত হইল, বলিয়া উঠিল, হাসলে যে বড্ড অমলদা!

—হাসবো না? পবিত্রের মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি, ভেবে শেষটায় এই বার করলে!

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, কনষ্টিটিউশনাল এজিটেশনের এটাই হচ্ছে চরম পরিণতি। এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

—এতে যদি কিছু না হয়, তাহলে কি করবে?

পবিত্র বলিল, কি আর করবো? হাত গুটিয়ে বসে থাকবো—সব্বাই যা করছে!

—কেন? আর কি কোন উপায়ই ঠাণ্ডরাতে পারলে না?

—দিব্বি আছি ভাই। কে আর এ সব ঝকমারির ভেতরে যাচ্ছে বল! খাচ্ছি, দাচ্ছি—রাত ভোর ঘুমোচ্ছি—ছুটির দিন দুপুর বেলা অবধি বাদ যায় না, বলিয়া সে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিল।

লতিকার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল; আদরের স্বরে বলিল, ভারি দুষ্টু তুমি! যাও! আমি কি তোমায় ধরে রেখেছি?

—আমি কি তাই বলছি, বলিয়া পবিত্র আবার হাসিল।

লতিকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল; পবিত্রের কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, তাহলে ওকথা বললে কেন?

—বলেছি, আমার খুশী!

—অমলদা কি মনে করছে?

—অমল আবার কি মনে করবে? পবিত্র অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ক্ষীণ বাহুলতার আবেষ্টনে পবিত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া লতিকা করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বল না, কেন তুমি অমলদার দলে যাচ্ছ না?

—কি করে যাই বল, কমিউনিজম যে মোটেই আমার ভাল লাগছে না।

লতিকা আহত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কেন ভাল লাগছে না? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পৌনে নয়টা বাজিয়াছে।

অমল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

অমল পবিত্রের পিছন ছাড়িল না, বিকাল বেলায় আবার আসিল।

ম্লান হাসিয়া লতিকা বলিল, তোমরা দুজনে তর্ক করো, আমায় আর এর ভেতরে টেন না, অমলদা।

—কেন? তোমার আবাব এর ভেতবে কি হলো? অমল সশঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—কিছু হয়নি; সব সময় তোমাদের কথা বুঝে উঠতে পারি এরকম বিদ্যে আমার নেই,—মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে।

—ওঃ! আমি ভাবলুম কি না কি হয়েছে। তুমি শুধু শুনে যাবে; একটু সড়গড় হলে বুঝতে আর কষ্ট হবে না। বলিয়া অমল পবিত্রের দিকে চাহিল। সে কোন কথা বলিল না।

পবিত্রের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি না হয় আমাদের দলে নাই এলে, তুমি কি বলতে চাও কমিউনিজ্‌ম্ আমাদের দেশের আবহাওয়া সইতে পারবে না?

পবিত্র কয়েক মিনিট চিন্তা করিল; তারপর ধীরভাবে জবাব দিল, ধাতে সইবে না বলি কি করে, রাশিয়াকে তো দেখছি।

—তাহলে তুমি টুথ এণ্ড নেল ফাইট করছো কেন?

—কেন করবো না? তোমরা যে সব দিক ভাল করে দেখতে চাও না।

—কেন চাইবো না? দেখছি বলেই না কমিউনিজ্‌ম্ আনতে চাচ্ছি।

—একে কি সব দিক দেখা বলে? তোমরা শুধু দেখছো, রাশিয়ার মত ভারতবর্ষ একটা মস্ত বড় দেশ, আমরা সবাই গাঁয়ে বাস করি—চারদিকে খোলা মাঠ—মাঝে মাঝে দুচারটে ছোট ছোট কুঁড়ে, যাতে

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে ; বড় বড় সহর আমাদের বেশী নেই—কলকারখানাও কম ; অনেকগুলো রেস, গুনে শেষ করা যায় না , কত রকমের ভাষায় যে আমরা কথা বলি তার ঠিক নেই। রাশিয়াতে গ্রীক অর্থডক্‌স চার্চের লোক রয়েছে, রোমান ক্যাথলিক, মুসলমান, বৌদ্ধ সবাই রয়েছে ; আমাদের ভেতরে কত ধর্ম্ম রয়েছে ঠিক নেই ; আমাদের মত মাইনরিটি কোশ্চেন রাশিয়াতেও ছিল ; রাশিয়ার পথঘাট খারাপ, এদেশের রাস্তাও শুধু পায়ে চলার পথ, যেন দাগ কেটে রয়েছে ; আমাদের মত রাশিয়ার ফি একশ জন লোকের ভেতরে আশি জন চাষবাস করে খায়। সবই মানলুম—এ থেকেই তোমরা মনে করছ, আমাদের দেশেও কেন কমিউনিজ্‌ম্ চলবে না।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইন্‌ডিয়ার পক্ষে কমিউনিজ্‌ম্ বেষ্ট সলিউশন্ নয় কি ?

—বেষ্ট কিনা বলতে পারি না ; হাঁ, একটা প্রব্যাব্‌ল্ সলিউশন—সবাই মানবে।

—তাহলে কেন বলছো, আমি ভুল করছি ?

—মস্ত বড় ভুল করছো তুমি দুটো জায়গায়।

—সে দুটো কি কি ?

—একটা হচ্ছে, রাশিয়াতে এখনও ফুলফ্লেজ্‌ড্ কমিউনিজ্‌ম্ হয়নি, পাকা কমিউনিষ্ট ষ্টেট হতে ঢের দেরী।

—এ আর নতুন কথা তুমি কি বলছো ; এখন তো সবে ষ্টেট ক্যাপিটালিজ্‌ম্ চলেছে, এর পর হবে পাকা কমিউনিষ্টিক্ ষ্টেট। বলিয়া অমল হাসিল।

পবিত্র সহাস্তে কহিল, আগে অক্টোবর রেভলিউশনের কথা একবার মনে করে দেখ, তারপর ফাইভ্ ইয়ার প্ল্যানের কথা ভাববে।

অমল একটু আশান্বিত হইল; আবেগে বলিয়া উঠিল, এ কি আর ভাবিনি; নইলে তোমায় নিয়ে এত টানাটানি করছি কেন?

সহসা পবিত্র গম্ভীর হইল; বলিল, ভেবে দেখ সে সময়কার রাশিয়ার কথা আর আমাদের দেশের আজকের অবস্থা; দুটোতে আস্‌মান্ জমিন্ ফারাক্ নয় কি? য়ুরোপে লড়াই বাধলো; জারিষ্ট রাশিয়া এলাইজ্‌দের দলে এলো। লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে বন্দুক দিয়ে তাদের লড়াই করতে পাঠালে। রাশিয়ান আর্মির কটা লোক মুখোমুখি হয়ে লড়াই করেছে? ওয়ান-থার্ডও নয়। যানবাহন একেবারে অচল হয়ে গেল; রসদ মজুত রয়েছে, সেগুলো রাশিয়ান সোলজারদের কাছ অবধি পৌঁছলো না। তারা পেলে না খেতে পরতে; এমন কি গোলাবারুদ অবধি পাঠাতে পারলে না জারের গভর্ণমেণ্ট। এত বড় অপদার্থ ছিল সেই গভর্ণমেণ্ট, এত বিশ্রী ছিল তাদের ব্যবস্থা। এদিকে দিনের পর দিন ট্রেন্‌চের ভেতরে রাশিয়ান সোলজাররা কাটাতে লাগলো; কি নিদারুণ দুঃখ কষ্ট তাদের সইতে হয়েছিল! তারা সবাই মরীয়া হয়ে উঠলো, দু বছর যেতে না যেতে তারা সবাই চাইলে শান্তি, তারা চাইলে বাড়ী ফিরে যেতে, তারা রুটি রুটি করে আকাশ পাতাল মাতিয়ে তুললে! এ তো গেল লড়াইএর কথা। দেশের ভেতরে যখন তখন ষ্ট্রাইক হতে স্বরু করল; জারের গভর্ণমেণ্ট আব টিকতে পারলে না। এলো প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট—কিরেন্সকির! এলাইজ্‌রা সে বেচারাকে এক মিনিটও ভাবতে দিলে না, হিনডেনবুর্গ লাইন অ্যাটাক্ করতে বললে। কিরেন্সকি করলেও তাই; আক্রমণ ব্যর্থ হলো। হিনডেনবুর্গের প্রচণ্ড আঘাত রাশিয়ান আর্মি সহ্য করতে পারলে না—সবাই চারদিকে ছুটে পালাল। পেট্রোগার্ডে ধর্ম্মঘট হলো; সেটাকে দাবিয়ে দিয়েও প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট

বলশেভিকদের ধ্বংস করতে সাহস করলে না। এই তো ছিল সেদিনকার রাশিয়ার অবস্থা। তারপর নবেম্বর মাসে কি করে কি হলো তুমি সব জানো।

অমল বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল, এ আর নতুন কথা তুমি কি বললে?

তাহার বিরক্তি এবং ধৈর্য্যচ্যুতি ইচ্ছা করিয়া পবিত্র লক্ষ করিল না; বলিতে লাগিল, রাশিয়ার সঙ্গে আর সব জায়গায় মিল থাকলেও, সবচেয়ে বড় জায়গাটায় মিল আমি দেখছি না। জারের মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতা ও অপ্রতিহত শক্তি থাকলেও তার গভর্ণমেণ্ট ছিল একেবারে অকেজো, কর্ম্মচারীরা ছিল চরিত্রহীন, একেবারে চলঃশক্তিহীন। ইংরেজদের বেলায় সে কথা কি বলা চলে? ইচ্ছে করলে তারা সাগরের পারে বসে নিশ্চিন্ত মনে ঢেউ গুনতে পারে, আবার যদি খেয়াল হয় প্রচণ্ড বেগে সাগরের বুকে এমন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, যাতে করে চোখে মুখে দেখতে পাবে না, এটুকু সময় অবধি তোমায় দেবে না।

অমল ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না; ঘাঁড় হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল। পবিত্র আবার বলিল, তাই বলছিলুম, জোর করে তোমরা ইন্‌ডিয়ায় কমিউনিজ্‌ম্ চালাতে যেও না; ইটালিতে তোমরা পারনি, জার্ম্মানি থেকে পালিয়ে এসেছো; এ দুটো দেশের গভর্ণমেণ্ট সে সময় জারের চাইতেও ছিল দুর্ব্বল। সেখানে পারনি, এখানেও পারবে না; বেশী টানাটানি করলে ছিঁড়ে যাবে—ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে বরণ করে আনবে! তাতেও আমি মানা করতুম না, যদি না সেটা অ্যানটি-ন্যাশনাল হতো; সেটা যে হবে ইংলিশ ফ্যাসিজ্‌ম্, আমাদের দেশের বুকের ওপরে বসে অবাধে স্বেচ্ছাচারিতা চালাবে, কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

রাত্রি নিঝুম, নিথর। কেবল লতিকা চেয়ারে বসিয়াছিল।

সহসা পবিত্র বলিয়া উঠিল, কমিউনিজ্‌ম্‌ তোমরা আনতে চাচ্ছ সব দেশে, একটা নিছক থিওরির ওপরে বেস করে; থিওরিতেও ভুল রয়েছে।

—সব বাজে কথা; কি ভুল তুমি পেয়েছ এতে? বলিয়া অমল পবিত্রের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

—একশো বছর আগে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো বের হয়েছিল—ইনডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের গোড়াতে; পৃথিবীর চেহারা আর কি সে রকম রয়েছে? বদলে যায়নি? নূতন নূতন কলকারখানা গড়ে উঠছিল, ছোট ছোট কটেজ ইন্‌ডাষ্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তাতে ফাইনান্‌সিয়াল্‌ লস য়ুরোপের কারও হয়নি; ছোট ছোট কারখানার মালিকরা বড় বড় কারখানার মজুর হয়ে পড়লো; কেন? এতে করে পয়সার দিক থেকে তাদের ভালই হয়েছিল, অবশ্য মর্য্যাদাও তারা হারিয়েছিল, একথা মানতেই হবে। সে কথা যাক! য়ুরোপের নাবিক জাহাজে চড়ে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল; খুঁজছিল কোথাও এক কাঠা নূতন জমি পাওয়া যায় কিনা। সে সব দেশে পাকা মাল বিক্রি করে কাঁচা মাল নিয়ে আসছিল, সোনা রূপোয় নিজেদের দেশ ভরে তুলছিল, এতে করে কারও অবস্থা খারাপ হয়নি, বিশেষ করে সে সব দেশের লোকদের যারা পাকা মাল তৈরী করে—বড় বড় কল-কারখানা আরও তাড়াতাড়ি গড়ে উঠছিল। এ রকম কি আর রয়েছে? পৃথিবীতে আর এক ছটাক নূতন মাটি খুঁজে বার করা যায় না।

বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অমলের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল; বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে করে কি হয়েছে? ধান ভানতে

শিবের গীত স্থরু করে দিলে যে। পবিত্র সে কথায় কান দিল না; ধীর ভাবে বলিতে লাগিল, কার্ল মার্কস হচ্ছেন গিয়ে সেই যুগের লোক। এসব দেখে শুনে তাঁর মনে হলো, ভারি অন্যায়! এক দল লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কল চালাবে, আর যারা অবস্থার স্থযোগ নিয়ে কলের মালিক হয়ে বসেছে, তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে আর ডিভিডেণ্ড পেয়ে পেয়ে মোটা হয়ে উঠবে! কিছুতেই এ হতে দেওয়া হবে না। হাতের কাজ যে করবে না, বড়লোক হবার অধিকার তার নেই; কাজ না করে ইচ্ছে করে বসে থাকলে, তাকে কিছু দেওয়া হবে না। এ থেকেই না এলো ক্লাস ওয়ারের আইডীয়া? আর এটাই হচ্ছে তোমাদের সব চেয়ে বড় কথা!

—এতে রং আইডীয়ার তুমি কি দেখলে? আব কাজ না করলেই যে কিছু পাবে না, এ কথা কমিউনিষ্ট কোনদিন বলেনি। ইচ্ছে করেও যে কাজ কববে না—অপরচুনিটি থাকলেও—তাকেও খেতে পরতে দেওয়া হবে।

—সে কথা আমি মেনে নিচ্ছি; কিন্তু সেটা তো ভিক্ষে—তোমরা বলবে ডোল; কথাটা ইংরেজীতে বললেও তার ষ্টিং কমে যায় না।

—ষ্টিং তো থাকবেই; দ্যাট'স্ ইন্টেনশনাল।

সহসা পবিত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল, ষ্টিং থাকবেই! কেন থাকবে? কত বড় অন্যায়! কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার তোমরা করছো! চাইলেই কি আজ কাজ পাওয়া যায়? দিচ্ছে কে তোমাকে? সব দেশ সোভিয়েট রাশিয়া নয়! সবে সে দেশে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্ম্ স্থরু হয়েছে! র‍্যাশনালিজেশন্ আরম্ভ হয়নি। বিলেত, আমেরিকা, জার্মানি এদেরও কি তোমরা রাশিয়ার দলে ফেলতে চাচ্ছ? এ সব কথা আমি বলতুম না, তোমরা যদি কমিউনিজ্ম্কে

একটা ইন্‌টারন্যাশনাল মুভমেণ্ট করে তুলতে না চাইতে। রাশিয়াতে তোমরা কি ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড করে তুলেছো! যারা নিজে থেকে কাজ করে রোজগার না করবে, তাদের তোমরা পারিয়া করে তুলছো, তাদের পলিটিকাল ফ্র্যান্‌চাইজ অবধি কেড়ে নিয়েছো। তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে। যাও একবার বিলেতে এ সব কথা বলতে, দেখবে তোমাদের তারা কি করে বসে—তুদিনও টিকতে দেবে না।

অমল হতভম্বের মত বলিয়া ফেলিল, কেন টিকবে না?

টেবিলে সজোরে করাঘাত করিয়া পবিত্র বলিল, কি করে টিকবে? কাজ চাইলেও যে লোক কাজ পাচ্ছে না। মেসিন্‌ বিলাতকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে যে। এক একটা কল, তু-দশ হাজার লোককে পথে বসাচ্ছে না?

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল, শ্লেষের সহিত কহিল, এটা যে ক্যাপিটালিজ্‌মের জন্য হয়েছে তা এখনও তোমার মাথা ঢুকছে না? অবাক করলে দেখছি।

পবিত্র নির্ম্মম ভাবে জবাব দিল, তোমার মাথা আমার চাইতে পরিষ্কার আমি জানি। চোখ ঠাওরে কথা বললেই হয় না; শুধু কি ক্যাপিটালিজ্‌মই দায়ী? ন্যাশনালিজেশন্‌? এ সব কথা তোমবা এখন মানতে চাইবে না। তোমাদের এত সাধের সোভিয়েট রাশিয়াতেও র‍্যাশনালিজেশন্‌ চালাতে হবে, নইলে তুদিনও আর টিকতে পারবে না।

তারপর সে সহাস্তে বলিল, একনমিষ্ট এসব কথা অনেক আগে থেকে ভেবে রেখেছে। পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেটা যে ভাবেই হোক না কেন—নতুন নতুন কল বের করে মজুর খাটাবার অথবা জিনিষপত্রের লেনদেনের স্থবিধে করে, আর যে

করেই হোক না কেন, শেষটায় গিয়ে দাঁড়ায়—কতকগুলো লোক আর কাজ পায় না। এরও একটা কারণ রয়েছে; আজকালকার সমাজে কাজের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে, যাতে করে যে কোন লোককে একটা কাজই করতে হয়। কথাটা হয়তো ভাল করে বোঝাতে পারলুম না; আমার কথা হচ্ছে, কাজ আমি বদলে ফেলতে পারি, আজ হয়তো মোটরগাড়ি চালাচ্ছি, কাল হয়তো মোটব মেকানিক হয়ে বসবো। একটার বেশী ছুটো কাজ আমাকে দিয়ে করাতে হলে, আর একজন লোকের রুটি আমায় মারতেই হবে। যা বলছিলাম, এ প্রগতি যে দিক থেকেই হোক না কেন, কোন না কোন লোককে শেষটায় কাজ কববার স্নযোগ থেকে বঞ্চিত করতেই হবে। ওই বঞ্চিতদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাবে; যাচ্ছেও তাই—প্রগতির তীব্রতা যত বেশী বাডবে. এদের সংখ্যাও বেডে যাবে—দশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে দুশো, দুশো থেকে দু ক্রোব—আরও বাড়বে, যত ব্যাপক ও তীব্র ভাবে র‍্যাশনালিজেশন্ ছড়িয়ে পডবে। এটাই হচ্ছে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় সমস্যা; একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে চলবে না, এর সঙ্গে লডাই করেও লাভ নেই—এটা হচ্ছে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল্ রেভলিউশনের ন্যাচারাল এভোলিউশন।

অমল কোন কথা বলিল না, উদাস ভাবে চাহিয়া রহিল।

পবিত্র আবেগের সহিত বলিল, ক্যাপিটালিষ্ট ষ্টেটের আর যত দোষ থাক না কেন, তোমাদের মত এখনও বলেনি, কাজ না করলে—কাজ করবার স্নবিধা পেয়ে বা না পেয়ে—কাজ যে করবে না, রাজনৈতিক অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে। যে বঞ্চিত, যে সর্ব্বহারা তাকে তুমি একেবারে পারিয়া করতে চাচ্ছ। শুধু তোমরা 'কুলাকি'দের কথা ভাবছো—এর পর তোমরা করতে চাইবে—সব দেশে সব বঞ্চিতদেরকে!

তুমি হয়তো বলবে, শুধু ফ্র্যান্‌চাইজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, সে যে পেটে খেতে পায় না? সব মানি। এখন তোমরা তাকে পেটে খেতে দিচ্ছ, কিন্তু এদ্দিন ধরে মানুষ যে অধিকার কামনা করে এসেছে, সেই পলিটিকাল ইকোয়ালিটি তোমরা ধ্বংস করে দিচ্ছ। এত বড় ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, সেটাকে কি তোমার পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে? কেন? আমি কাজ পাই না বলে কাজ করি না, পেলেও যদি আমার সে কাজ করতে ইচ্ছে না করে, শুধু গান গেয়ে হেসেখেলে বেড়াতে ইচ্ছে করে, মানুষের অধিকার থেকে কেন আমি বঞ্চিত হব? যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কত রক্তপাত হলো, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা পৃথিবীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল!

অমল গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; কোন প্রত্যুত্তর সে তখনকার মত খুঁজিয়া পাইল না।

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, অমলদা, আর ভেবে কি করবে? চা খেয়ে আবার না হয় স্বরু কর—তোমরা তো কেউ কাউকে ছাড়বে না।

অমল গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল, এটা কিছু নয়; একটু অ্যাড্‌জাষ্ট করে নিলেই হবে। ভেরি মাইনর কোশ্‌চেন! আর কি ডিফেক্ট তুমি পেয়েছ?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, না; আর কোন ডিফেক্ট আমি এখনও পাইনি; তবে, আমারও একটা অ্যাপ্রিহেন্‌শন রয়েছে।

—আমারও রয়েছে! এখন চা না খেলে আর হয়তো হয়ে উঠবে না; বলিয়া লতিকা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চায়ের টেবিলে নিরঞ্জন আসিয়া জুটিল ; অমলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, কিহে এখানেই ঘর বাঁধলে নাকি, বাড়ী যাওনি ?

অমল সহাস্যে উত্তর দিল, কি করে যাই বল ? আজকে এর শেষ করে নিই ; আজ ফুল ড্রেস ডিবেট, তুমি হবে প্রেসিডেণ্ট। কথা রইল, পবিত্র হেরে গেলে আমাদের পার্টিতে জয়েন্ করবে ; নইলে আমি ওর দলে যাব।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল, আমার দলই নেই।

—আজই সে দলের সৃষ্টি হবে, আমরা সবাই হব তার মেম্বার। গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া নিরঞ্জন কহিল, মিস্ গুপ্তা হবে উভয়-ভারতী।

—না, না, আপনিই হবেন প্রেসিডেণ্ট, এ ঝক্কি আমার পোষাবে না। বলিয়া লতিকা মুখ ভার করিয়া মাথা নাড়িল।

মিনিট খানেক পর নিরঞ্জন হাঁকিল, পবি, সুরু কর তোর কথা।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি আমায় বলতে হবে, আজ তোমাদের কি হয়েছে বল তো ?

নিরঞ্জন বিরক্তির সহিত জবাব দিল, রোজ রোজ তোদের দুজনের কথা কাটাকাটি আর ভাল লাগে না। অমলেরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোকে চাচ্ছে ওর দলে টেনে নিতে।

—আমি কেন গোড়াতে সুরু করবো ?

—কেন করবে না ? কমিউনিজ্‌ম্—এ সব ইজ্‌ম্ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এর এগেন্‌ষ্টে যে বলতে পারবে, আমি শুধু তারই কথা শুনবো। নে, দেরী করিস্‌নি শীগগির শেষ করে ফেল।

একটু চিন্তা করিয়া পবিত্র বলিল, সোসিয়ালিষ্টদের বেসিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ হচ্ছে—আইডিয়াল্ অব্ সার্ভিস। এই সেবার আদর্শ পৃথিবীতে আজ প্রথম বের হয়নি ;—বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য—এই সেদিনও রামকৃষ্ণও বিবেকানন্দ—মহামানব, এর মহিমা কীর্ত্তন করে গিয়েছেন ; এটা একেবারে নতুন কিছু নয়। তাঁরা কতগুলো লোককে ইন্‌ফ্লুয়েন্‌স্ করতে পেরেছেন ? যাঁদের করেছেন, তাঁরা এখনও সেবা-ধর্ম্ম পালন করছেন।—আর সবার কথা না বলাই ভাল। কমিউনিষ্ট সেই সেবাধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। এজন্যে সবার আগে দেখতে হবে তারা কি ব্যবস্থা করেছে। নিরঞ্জন গম্ভীর ভাবে কহিল, বেশ, বল কি ব্যবস্থা তারা করেছে ?

—এজন্যে রাশিয়ার পলিটিকাল অর্গানিজেশন্ ভাল করে অ্যানালাইজ্ করে দেখতে হবে। সোভিয়েট্ রাশিয়ার গভর্ণর্মেণ্ট হচ্ছে একটা পিরা-মিড্ ;—মাথাটা খুব উঁচু আর ছুঁচালো, আর তার বেসটা খুব চওডা।

—তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না যে। বলিয়া লতিকা জিজ্ঞাসু নেত্রে পবিত্রের দিকে চাহিল।

—এর মানে হচ্ছে, নীচের দিকে সাধারণ লোকদের ক্ষমতা খুব বেশী ; এ ক্ষমতা তার ডেলিগেট্ করেছে ওপরকার লোকদের। মাথা ছুঁচালো বলে একে বলা হয়—দি ডিকটেটরশিপ্ অব্ দি প্রোলে-টেরিয়েট্। বাইরে থেকে সবাই মনে করে সর্ব্বসাধারণের রাজত্ব চলেছে ;—ষ্টালিন্ আর কেউ নয়, সবার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন। একটু ভিতরে ঢুকলে দেখবে, এ ডিক্‌টেটরশিপ্ সবার নয়—শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির।

অমল বাধা দিয়া বলিল, এ তো দুদিনের জন্যে, এর পর আর ডিক্‌টেটরশিপের দরকার হবে না।

—সে দুদিন, কদ্দিন কে বলবে? এর ভিতরে সব সার্ভিস্ অর্গানাইজ্‌ড্‌:হয়ে যাবে; রাশিয়াতে বড় রকমের একটা কাষ্ট সিস্‌টেম্ গড়ে উঠবে; বলিয়া পবিত্র একটা চাপা নিশ্বাস লইল।

অমল বিস্ময়ে অভিভূত হইল; অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাষ্ট সিস্‌টেম্ গড়ে উঠবে মানে?

—প্ল্যাণ্ড একনমির সব চেয়ে বড় উদাহরণ পেয়েছি আমরা ভারতবর্ষে—জাতিভেদের ভিতর দিয়ে; সমাজে প্রত্যেক লোকের নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছিল।

—রাশিয়ার এ রকম হতে পাবে না; এ রকম কোন ব্যবস্থা সেখানে করা হয়নি; বলিয়া অমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পবিত্রের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—গোড়াতে আমাদের দেশেও করা হয়নি; কাষ্ট গোড়া থেকে হেরিডিটারি অকুপেশন্ বলে আমার মনে হয় না। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, ওয়েল প্ল্যাণ্ড সেক্‌শনাল অকুপেশন্, কো-অর্ডিনেটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার ইণ্ডিয়াতে যেমন ছিল, তেমন আর কোথাও দেখিনি। প্ল্যাণ্ড একনমি ওর চাইতে বেশী কিছু আর নয়?

—না।

—যেটা প্ল্যাণ্ড, সেটা গোড়াতে ফ্লেক্‌সিবল্ থাকলেও রিজিড্ হয়ে আসে—বিশেষ করে বাইরের চাপে যেটাকে সব সময় নড়চড় হতে দেওয়া হয় না। তোমার সঙ্গে মতে হয়তো মিলবে না, এটা হচ্ছে আমার ধারণা। সব সময় মানুষ চিন্তা করে, কাজ করে না—করতে পারে না, গোড়াতে ভেবে-চিন্তে করলেও পড়ে হয়ে পরে—অটোম্যাটিক্—মেকানিকাল, যাকে বলা চলতে পারে সংস্কারজাত কর্ম্ম। রাশিয়াতেও হয়তো একদিন না একদিন এ রকম হয়ে পড়বে, এটাই হচ্ছে আমার

অ্যাপ্রিহেন্‌শন্‌। নিছক সেবা সব লোক বেশী দিন করতে পারে না, যদি না তার পেছনে আর কোন তাগিদ থাকে।

অমল বলিয়া উঠিল, সে তাগিদ তো রয়েছে; পার্টি ডিসিপ্লিন্‌। পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, শুধু পার্টি ডিসিপ্লিন্‌ নয়; ওয়েজেস্‌ও বটে।

অমলের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে তিক্ত স্বরে বলিল, কাজ করে মাইনে পৃথিবীর সব লোকই তো নিচ্ছে।

—সে কি আর আমি জানি না! পার্টি যদি ভেঙে যায়, আজকের মত ডিসিপ্লিন্‌ কাল যদি না থাকে, তা হলে? সব গোলমাল হয়ে যাবে না? শুধু ফাইভ ইয়ার আর টেন্‌ ইয়ার প্ল্যানেই সব শেষ হল না।

তারপর সে সহাস্যে বলিল, মনে করো না এগুলোকে আমি ডিফেক্ট্‌ বলছি। আমার কথা হচ্ছে, এতে করে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। হয়তো নিছক কমিউনিজম্‌ দুনিয়ার শান্তি ও সমৃদ্ধির উপায় নাও হতে পারে।

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, মৃদু স্বরে বলিল, তোমাদের এসব ইজম্‌এর চাইতে গান্ধীজির মতটা অনেক সোজা, সবাই বুঝতে পারে। আমার মনে হয় তাতে করেই দুনিয়ার শান্তি হবে। তুমি বলছিলে না, মেশীন আজ মানুষকে কোণঠাসা করেছে? এসব দেখে শুনে গান্ধীজি বলছেন সবাইকে সূতো কাটতে—চরকা আর তকলি চালাতে।

মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পবিত্রের ইচ্ছা ছিল না, সে জন্য সে প্রথম হইতেই সাবধান হইয়া কথা বলিতেছিল। লতিকা কথা উঠাইতেই তাহার মুখ চোখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। মুখ কালো করিয়া সে জবাব দিল, মেশীন্‌কে বাদ দিলে মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা হবে। ইতিহাসের আদিতে মানুষ সূতো কাটতো হাত দিয়ে, প্রদীপের সল্‌তে তৈরী করার মত করে। কার্পাস-শিল্পের

প্রথম কল হচ্ছে তকৃলি। একবার ঘুরিয়ে দিলেই অনেকটা সুতো কাটা যায়। তকলির পর মানুষ আবিষ্কার করলে চরকাকে; চরকা টিকে রইল হাজার হাজার বছর—সেলাইএর কলের মত ঘরে ঘরে চরকা চলতো, পৃথিবীর সব দেশে। এর পর এলো স্পিনিং জেনি—তকৃলিরই ফার্দার ইম্প্রুভ্‌ড এডিশন্। ক্রমে আরও সব কল বের হলো। অবশ্য একথা মান্‌তেই হবে, পৃথিবীর আজকের অবস্থা দেখে মেশীনের ওপর রাগ খুবই স্বাভাবিক।

—তা হলে তুমি বলছো কেন, এতে করে মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা হবে? বলিয়া লতিকা তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—সৃষ্টির আনন্দে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে, কি করে তুমি একে রদ করবে? আর করতে পারলেও কি মানুষের মঙ্গল হতো? কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা শিল্পীকে সহ্য করতে হয়, এতেও কি সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে? কিছুতেই সে পিছ-পা হয় না। এই পিছিয়ে না যাওয়াই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

নিরঞ্জন গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, তুমি কমিউনিজ্‌ম্ সইতে পার না, ফ্যাসিষ্টদের কথা শুনলে আঁৎকে ওঠো, গান্ধীবাদকে হেসে উড়িয়ে দিলে; দেখছি যেমন আছে ঠিক তেমনটি থাক্ এটাই হচ্ছে তোমার মত। আমি জানতুম এ রকম একটা কিছু তুমি বলবে। চিরকাল তোমায় দেখে এসেছি, সোজা করে দুটো কথা বলতে কোন দিন শেখনি।

পবিত্র অপ্রতিভ হইল; উত্তর দিল, আমি ইচ্ছে করে তোমাদের ডিটেন্ করিনি।

নিরঞ্জন শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, তুমি যে রকম পড়েছ আর

ভেবেছ, এর চাইতে বড় রকমের একটা কিছু আমি অন্তত তোমার কাছ থেকে আশা করছিলুম। আচ্ছা বেশ, তাহলে তোমার মতে রুজ্‌ভেণ্টের একনমিক ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ হচ্ছে গিয়ে প্রপার সলিউশন্‌?

পবিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইল; কহিল, এ কথা তো আমি কোন দিনও তোমাদের বলিনি।

—না বললে কি হবে! ওই একটাই তো রয়েছে; আর সবগুলোকে যত খুশী নিন্দে করলে; এটার কথা কিছু বললে না?

—কী বলছো তুমি নিরু? একনমিক্ ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ সাপোর্ট করবো আমি?

—কেন? এতে দোষ কি? বলিয়া অমল মুখ টিপিয়া হাসিল।

লতিকা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তোমরা সবাই কথা কাটাকাটি করছো কেন? তারপর সে সস্নেহে পবিত্রের মুখের দিকে চাহিল; মৃদুস্বরে কহিল, সবাই শুন্‌তে চাচ্ছে তোমার কথা; বল না, কেন তুমি রুজভেণ্টকে সাপোর্ট করছো না? সব কথা খুলে বলতে এত হেজিটেট্ করছো যে? না বললে এরা তোমায় ছাড়বে না।

পবিত্র ধীর ভাবে বলিল, গোড়াতেই বলেছি মেশীনকে আমরা ছাড়তে পারবো না, আবার মুস্কিল হচ্ছে এখানটায়, মেশীন আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে না। এটা একটা সাময়িক বিরোধ—এদের মিলন চাই, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এত বড় একটা ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি; এর মূলে রয়েছে মেশীন এণ্ড ম্যান-এর বিরোধ। যন্ত্র প্রচুর জিনিষ তৈরী করছে; আর মানুষ—যাদের মেশীন কোণঠাসা করছে, তারা পাচ্ছে না কাজ, রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের, বাপ-দাদারও সঞ্চিত ধন নেই যা দিয়ে তারা কিনবে এসব জিনিষ। এতে পৃথিবীতে আজ দেখতে পাচ্ছি বিশাল প্রাচুর্য্যের ভেতরে

অসীম দারিদ্র্য। এ শুধু সম্ভব হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বর্ত্তমান ব্যবস্থার জন্যে। ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমিক্ ভাবে ভাঙন্ ধরেছে; রুজভেল্ট আর্টিফিশিয়াল রেস্‌পিরেশন্ দিয়ে একে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। হয়তো দু-এক দিন আরও টিকে থাকতে পারে; পরে এমন হয়ে উঠবে, যেটা এবারকার সবকটার চাইতে হবে হাজার গুণে মারাত্মক।

নিরঞ্জন চটিয়া উঠিল; বলিল, এসব কথা হাজার বার শুনেছি; এর চাইতে বেশী কিছু বলবার থাকে তো বল, নইলে আমরা অন্য কথা পাড়ি।

তাহার বিরক্তির কারণ বুঝিতে পবিত্রের বিলম্ব হইল না। ধন-বিজ্ঞানের নীরস তথ্যগুলি শুনিতে শুনিতে নিরঞ্জনের মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, না, এ ছাড়া আমার আর বলবার কিছু নেই।

লতিকা আহত হইল; সে আর পবিত্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। করুণ স্বরে কহিল, না না, তোমার কথা এখনও শেষ হয়নি, আমি জানি।

অতি কষ্টে পবিত্র একটু হাসিল, বলিল, তুমি কি করে জানলে শেষ হয়নি?

—জানি গো জানি, সে কথা তুমি জানতে চেয়ো না। আমি সব জানি। বলিয়া সতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নিরঞ্জন হাঁকিল, পবি, বল না লতিকা দেবী কি বলতে বলছে তোকে; শুধু শুধু দেরি করিসনি।

—বলতে যে ঢের সময় লাগবে।

—লাগুকগে, রোজ রোজ এ কথা আর ভাল লাগে না; আজই শেষ কর, তুইও বাঁচবি, আমরাও বাঁচবো।

৯

—যন্ত্র আর মানুষের লড়াই আর চলতে দেওয়া হবে না। যন্ত্র মানুষকে একেবারে কোণ-ঠাসা করেছে, মানুষ আর রোজগার করতে পারছে না। যারা যন্ত্রের মালিক তাদেরও আর সুখ নেই। কি করে সুখ হবে, শোয়াস্তি পাবে তারা? যন্ত্র ধন বৃদ্ধি করছে, কিন্তু চাহিদা কোথায়? কে কিন্‌বে? কি দিয়ে কিন্‌বে? দিন দিন বেকার বেড়ে যাচ্ছে। এত লোক বেকার বসে কেন? এর জন্য যন্ত্রই দায়ী। কিন্তু একে তো আমরা ছাড়তে পারি না, আমাদের সব সুখের মূলে রয়েছে যন্ত্রের আবিষ্কার সেই সত্য যুগ থেকে। আবিষ্কার করবার এই যে বৃত্তি, এটাই হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্বের প্রতীক, পশুর এ বৃত্তি থাকলেও আমাদের চাইতে ঢের কম।

লতিকার ভয় হইল, নিরঞ্জন হয়তো আবার চটিয়া উঠিবে, সে করুণ স্বরে কহিল, এসব কথা তো তুমি এর আগে বলেছ; এর সলিউশন—

—সলিউশন্‌ খুব সোজা, কিন্তু আমরা সে সব কবতে চাইব না; চারদিকে গোলমাল বেধে যাবে—রক্তারক্তি মারামারি—

নিরঞ্জন হাঁকিল, রক্তপাত যদি হয় হবে, তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ভূমিকা রেখে যা বলতে চাচ্ছিস্‌ বল না।

পবিত্র ধীর ভাবে বলিল, বৈজ্ঞানিক মনের আনন্দে গবেষণা করে, যন্ত্র আবিষ্কার করে; কোন খেয়াল তার নেই, এতে জগতের উপকার হবে, না, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের সমাজ কিন্তু সব সময় সেটাকে ভাল ভাবে খাটাতে পারছে না।

লতিকা অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—এক একটা কারখানায় এত জিনিষ তৈরী হতে পারে, যাতে করে হাজার হাজার লোকের ওয়ান্ট্‌ মীট্‌ করেও সারপ্লাস থেকে যায়। এরকম কারখানা আজ ঢের রয়েছে ; কিন্তু মানুষ কলগুলোকে দিয়ে সেভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছে না।

—নিচ্ছে না কেন ?

—কেন নেবে সে ? এতে কলওয়ালার লোকসান হয়ে যাবে, মাল বেরুবে অনেক, কেনবাব লোক কোথা ? এই কেনা আর বেচা সাধারণ মানুষেব ভেতর থেকে একেবারে তুলে দিতে হবে।

নিরঞ্জন বাধা দিল ; জিজ্ঞাসা করিল, তুলে দিলে সমাজ চলবে কি করে ?

—সমাজকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে ; নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে ; সে সমাজে মানুষের কাজ করবার দায়িত্ব থাকবে না।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, কাজ করবার দায়িত্ব থাকবে না !

—না। কাজ করবার সুযোগ নেই, দায়িত্ব থাকবে ;—এরকম অস্বাভাবিক অবস্থা আর একদিনও টিকিয়ে রাখা আমাদের ঠিক হবে না।

অমল এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল ; জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে সমাজ চলবে কি করে ?

—দায়িত্ব না থেকেও মানুষ কাজ করবে মনের আনন্দে। চুপ করে কেউ কোনদিন বসে থাকতে পারে না। সব সময় সে করবে খেলা। এখন তার খেলা করবার অধিকার নেই, গ্লানি রয়েছে। কাজ সে পায় না ; সমাজ তাকে খেতে পরতে দেয়, এটা তো ভিক্ষে। এতে

রয়েছে অপমানের গ্লানি ; যে গ্লানি সব দেশের বেকাররা প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছে। যে ভিক্ষুক, যে অনুগৃহীত জীব, প্রতি গ্রাসে যে অন্ন সে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিদারুণ দুঃসহ অপমান, আত্ম-অবিশ্বাস। কিন্তু এ নিদারুণ অপমান, এ মর্ম্মান্তিক গ্লানি কেন সে সইবে ? তার বিদ্যে রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, কাজ করবার ক্ষমতা রয়েছে ; পাচ্ছে না যে সে কাজ—সে যে কোনদিন কাজ পাবে না, পেতে পারে না, যন্ত্র যাকে কোণঠাসা করে রেখেছে, তাকে কেন এ অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে ?

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিটখানেক পর নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, এর কি ব্যবস্থা তুমি করবে ?

—কিছু করবো না আমি। শুধু মানুষকে একবার চোখ খুলে দেখতে বলবো—বলবো তাদের—পৃথিবীর বেকার সমস্যা, সমস্যা নয় ; এটা একটা স্বাভাবিক অবস্থা, যা চিরকাল থাকবে। এর মীমাংসা কাজ দিয়ে হবে না ; কাজ একে তুমি কোনদিন দিতে পারবে না—এত কাজ তোমার হাতে নেই। আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট হচ্ছে গিয়ে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্‌ রেভলিউশনের ন্যাচারল সন্‌ ; একে চিরদিনই ইল্‌লেজিটিমেট্‌ করে রাখলে চলবে না।

—তাহলে তুমি একে কি করতে চাচ্ছো ? লতিকা উৎসুকভাবে বলিয়া উঠিল।

—সমাজকে খোলাখুলিভাবে আজ বলতে হবে, কাজ কর আর না কর, তুমি সব পাবে, যা চাইবে সব পাবে, তোমায় অদেয় আমার কিছু থাকবে না। বলিয়া উত্তেজিতভাবে পবিত্র টেবিলে করাঘাত করিল।

নিরঞ্জন হতভম্বের ন্যায় চাহিয়া রহিল ; একটু পরে নিজেকে সংযত করিয়া নির্ম্মমভাবে কহিল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, ধরে

নিলুম সবাইকে সব দেওয়া সম্ভব ; কিন্তু কার কি দরকার, কে ঠিক করে দেবে ?

—ঠিক করবে সে নিজে। নিজে থেকে ঠিক না করলে কোন জিনিষের মূল্য থাকতে পারে না। কথাটা শুন্‌তে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে , না ? বহু মনীষী এ নিয়ে অনেক গবেষণা করে গিয়েছেন ; কিন্তু তখনও পৃথিবীর এ অবস্থা আসেনি ; আজ এসেছে।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে বুঝলে, আজ এসেছে ?

—এখন সব নূতন নূতন কল বের হয়েছে, যাতে করে আরও কম লোক লাগছে—বেকার বেড়ে উঠছে। এসব ফুল প্রুফ মেশীন চালাতে এক্সপার্ট হ্যাণ্ডের দরকাব নেই ; সবাই চালাতে পারে। এদের প্রডাকৃটিভিটি ঢের বেশী, আগে এবকম ছিল না। অনেক ছোট ছোট কল বের হয়েছে ; সেগুলো যেখানে সেখানে বসান যায় ;—আগেকার মত নয়—যেখানে একটা কারখানা বসাবে, তার চারপাশে আর সব কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে। এতে আজ কত সুবিধে হয়েছে।

নিরঞ্জন সন্দিগ্ধভাবে বলিল, কম লোক বেশী কাজ করতে পারে, অনেক জিনিষ তৈরী হচ্ছে, যা এব আগে হয়নি , রোজগার কবতে না হলেই যে লোক কাজ করবে না, তাও নয় ; মানুষ কাজ করবেই, কাজ করে বরং খুশী হবে—অভাবের তাড়নায় তাকে কাজ করতে হচ্ছে না—কাজ নয় খেলা—সবই মানলুম ; বুঝলুম না—পৃথিবী সুদ্ধ সব লোকের খাবার যোগাড় কোত্থেকে হবে ;—ল্যাণ্ড বেড়ে যাবে না নিশ্চয়ই—কল বাড়লেও।

—এ কথা সত্যি ; কিন্তু এরও ভেতরে দুটো কথা আছে। মানুষের অভাব এবং সে অভাব পূরণ করবার ইচ্ছে বহুমুখী ;—একটা নয়। শুধু খেতে পরতে পারলেই মানুষ সুখী হয় না, আরও অনেক জিনিষ

তার চাই। সব জিনিষ সব সময় খেতে সে চায় না, এক জিনিষ বার বার তার ভাল লাগে না। খাবার শক্তি এবং ইচ্ছারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা রয়েছে—যেটা সে করতে পারে না। এতে গরীব বড়লোকের কথা নেই; কিন্তু বড়লোক এর পেছনে টাকা খরচ করে অনেক বেশী। শুধু খাওয়া কেন, পরা? এরও একটা স্বাভাবিক সীমা রয়েছে, যেটা নির্ভর করে আবহাওয়া, সীজ্‌ন্‌ এবং যে পরে তার কাজকর্ম্মের সুবিধে-অসুবিধের ওপরে। বলিয়া পবিত্র অমলের মুখের দিকে চাহিল।

কেহ কোন কথা বলিল না। পবিত্র আবার আরম্ভ করিল, এ ছাড়া খাওয়া পরা আর থাকা নিজ নিজ রুচির উপর নির্ভর করে—এ সম্বন্ধে পরে বলছি।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, এত বলেও আবার পরে। আচ্ছা, বেশ শুনছি, বোরিং হলেও কথাগুলো আমার কাছে নূতন।

—থাকবার জায়গা? এরও নিদ্দিষ্ট সীমা আছে, মাথা বাঁচাবার জন্য, হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জন্য। সব ওয়ান্‌টের এক একটা ন্যাচারল লিমিট থাকলেও আমরা দেখছি ঠিক উলটো। যে যত বড়লোক, সে তত জিনিষ বেশী নষ্ট করে শুধু খাওয়ার পেছনে; পোষাক সে পরে নানারকম; বাড়ী তার প্রকাণ্ড, নিজে থাকে হয়তো এর এক কোণটিতে পড়ে। এ সব কেন করে সে?

লতিকা হাসিয়া বলিল, বড়মানুষি দেখাবার জন্য।

—ঠিক কথা! বড়মানুষি দেখাবার জন্য; আজকালকার সমাজে এমনি করে বড়মানুষি দেখিয়ে মানুষকে বড় হতে হয়।

নিরঞ্জন বাধা দিল; রাগ করিয়া বলিল, আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব না দিয়ে শুধু বাজে কথা বলছো। আমরা কি সব কচি খোকা যে গম্ভীরভাবে বলে যাচ্ছ!

পবিত্র সস্নেহে উত্তর দিল, জান বলেই না বলছি,—যে জানে না তাকে বলতে গেলে এতক্ষণ হয়তো মেরে বসতো। এতেই তোমায় জবাব দিচ্ছি।

তারপর সে গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, মানুষের এই যে, ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিংশন্—দশ জনের ভেতরে এক জন হওয়ার ইচ্ছে—এটা সব দেশে, সব সময়ে, সব লোকের মধ্যে রয়েছে। এটা রয়েছে বলেই না ফি বছর মাউণ্ট এভারেষ্টেতে উঠতে গিয়ে ক্লাইমবাবুরা প্রাণ দিচ্ছে; হেদুয়াতে এক নাগাড়ে সত্তর ঘণ্টা সাঁতার দিচ্ছে, এরোপ্লেনে উড়ে অ্যাটলান্টিক পার হচ্ছে। এ সব খেয়াল সবার নেই সাহস ও শক্তি নেই বলে, কিন্তু বড় হবার ইচ্ছে ভেতরে ভেতরে সবার রয়েছে। সেই ইচ্ছে চরিতার্থ করবার জন্য সাধারণ মানুষ একটা সোজা পথ আবিষ্কার করলে; সেটা হচ্ছে—যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করা; তারপর বড়মানুষি দেখান। শুধু টাকাওয়ালা হলেই হবে না, কৃপণকে সবাই ঘৃণা করে। তার থাকবে মস্ত বড় বাড়ী, নিজের না থাকলেও দুদিনের জন্য ভাড়া নেবে; পরবে সে রোজ নূতন নূতন পোষাক—ফ্যাশনদুরস্ত জামা কাপড়; সমাজের মাথা মাথা লোকদের নেমতন্ন করে খাওয়াবে—ভাল ভাল সিগার, দামী দামী মদ, তবেই না তার বড়মানুষি দেখান হবে—তার ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিংশন হবে স্যাটিসফায়েড্।

অমল এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল। সে বলিল, বেশ, এতে করে কি হলো?

—যে অধিকার আর সুযোগ আজকাল বড়লোকরা পাচ্ছে, সে সুযোগ আর অধিকার সবার থাকলে, বড়মানুষি দেখিয়ে দশ জনের এক জন হবার দিন চলে যাবে।

লতিকা একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল; সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি থাকবে না? কেন থাকবে না?

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, কেন থাকবে? কাজ না করেও সবাই যা চাইবে তাই যদি পায়—যেমন আজ কাজ না করে বড়লোকেরা পাচ্ছে—তাহলে তারা বডমানুষি দেখাবে কাকে? সবাই হয়ে উঠবে সংযমী, যার যেটুকু না হলে নয় সেটুকু সে চাইবে, এর বেশী চাইতে পারে না।

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, এ না হয় হলো; এতে করেও সবাই সব জিনিষ পেতে পারে না।

পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, এটা হচ্ছে ইন্‌ডাষ্ট্রি আর এগ্রিকালচারের র‍্যাশনালিজেশনের যুগ, একথা ভুললে চলবে কেন? গরু আর ঘোড়া দিয়ে চাষ আবাদের দিন চলে গিয়েছে। বীজ যা ছড়ানো হচ্ছে তাতে ফসল হচ্ছে এত বেশী করে, যা এর আগে কোনদিনও কেউ ভাবতে পারেনি। এক টুকরা জমিও আর ফেলে রাখা হয় না, সার দিয়ে তাকে এমন করে তোলে, যে সারা বছর তাতে চাষ-আবাদ হয়। আজ এত সব ফসলের দাম কমেছে, কেন? শুধু র‍্যাশনালিজেশনের জন্যে—ফসলের প্রাচুর্য্যে—যাতে করে পৃথিবীর সব লোককে পেট ভবে খাইয়েও অনেক থেকে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, এ না হয় মানলুম, কিন্তু এতে করে লোক বেড়ে যাবে যে?

—কেন বাড়বে? বলিয়া লতিকা সলজ্জভাবে চুপ করিল।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, একটু বাড়বে বইকি। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ছেলেমেয়ে হলে মানুষ করতে আর বেগ পেতে হবে না—আজকাল যেমন বি-এ, এম্-এ পাশ করেও কেউ আর বিয়ে করতে চায় না—সে ভয় আর থাকবে না।

—এর কি করবে তুমি? নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

পবিত্র সহজ সরলভাবে জবাব দিল, কিছুই করতে চাই না; সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক হয়ে যাবে?

—এতে করে সমাজের কোন লোকসান হবে না, সে ভয় তুমি করো না।

নিরঞ্জন মনে মনে চটিয়া উঠিল, বলিল, হেঁয়ালি রেখে সোজা করে বল না, কি করে কি হবে?

পবিত্র গম্ভীর ভাবে কহিল, এ কথা অস্বীকার করি কি করে—আসঙ্গ-লিপ্সা যৌবনের সহজাত ধর্ম্ম—তরুণ-তরুণী চাইছে মিলন।

লতিকাব চোখ মুখে কে যেন আবীর ছড়াইয়া দিল। পবিত্র তাহা লক্ষ্য করিল না; ধীর ভাবে বলিতে লাগিল, আজকের সমাজে তরুণ-তরুণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না, তাকে বসে বসে দিন গুণতে হচ্ছে,—এতে বাঙলার তরুণ-তরুণী হয়ে উঠেছে কামবিলাসী—কামোন্মাদ হবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে নানা কারণে। এ অস্বাভাবিক অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেব সবাই সহ্য করতে পারছে না—তাদের ভিতরে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কারও কারও বিচার-শক্তি লোপ পেয়ে একেবারে হয়ে গিয়েছে কর্ত্তাভজা, নিজের ব্যক্তিত্ব তারা হারিয়ে বসেছে। অবাধ মিলনের রাস্তা খোলা থাকলে সমাজের এ দুর্দ্দশা বেশী দিন আর থাকবে না।

নিরঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু—

—কিন্তু, এতে করে লোক বেড়ে যাবে? ভয় হচ্ছে, না? কিছু বাড়বে বই কি; যতটা ভাবছো ততটা নয়।

—নয় কেন?

—কি করে বাড়বে? মেয়েরা যে হয়ে পড়ছে স্বাধীন! মাতৃত্বের মহিমা তোমরা যতই কীর্ত্তন কর না কেন! একবার ভেবে দেখেছ কি? কতবার মেয়েরা মা হতে চায়?—একবার, দুবার, তিনবার—তার বেশী নয়। এরও একটা সীমা আছে, যার বেশী তারা আর সহ্য করতে পারে না। এ ভার বইবার শক্তি এবং কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা মেয়েদের কতটুকু রয়েছে পুরুষ আমরা কি করে বুঝবো? নতুন সমাজের মেয়েরা ফি বছর নতুন করে মা হতে নিশ্চয়ই চাইবে না; চাইলে অনেক সুযোগ সুবিধে ইচ্ছে করে তাদের হারাতে হবে। দুটো তিনটে ছেলেমেয়ে হলে তারা আর ছেলে চাইবে না; আজকের মত ব্রীডিং মেশীন্ হয়ে থাকতে তারা আব চাইবে না, তুমি নিশ্চয় জেনো। তারা হতে চাইবে মানুষ—শুধু মা নয়। যে সব ছেলেমেয়ে তাদের হবে তারও এ পৃথিবীতে আসবে দুতিন বছর পর পর।

লতিকা একেবারে তন্ময় হইয়া ছিল; পবিত্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, শিশুমৃত্যুর হার যাবে কমে, তাদের মারাও বেঁচে থাকবে অনেক কাল সুস্থ ও সবল হয়ে।

—এতে করে লোক যে আরও বেড়ে যাবে, শেষটায় এমন একটা ভয়ানক অবস্থা হবে,—মারামারি কাটাকাটি লেগে যাবে না? দেশের অবস্থা যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে—

—দেশ বলতে আজ আমার যা বুঝি কাল তা থাকবে না; মানুষ সব দেশে ছড়িয়ে পড়বে, ভাড়া লাগবে না।

—তা হলেও—

—তা হলেও লোক বাড়বার কমতি হবে না; একথা সত্যি। কিন্তু যে রেটে লোক বাড়বে, তার চাইতে বেশী করে বেড়ে যাবে সমাজের প্রডাকৃটিভ পাওয়ার; কলকারখানা জোর চলবে, মানুষ তার ইন্‌ভেন্‌টিভ

জিনীয়াস্‌কে এত করে বাড়িয়ে তুলবে যে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী আরও বেশী করে ধন-ধান্যে ফুলতে থাকবে। এই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, বড় লোকদের ছেলেমেয়ে গরিবদের চাইতে কম হয়, এ জন্য কনট্রাসেপটিভের দরকার করে না।

—কেন? লতিকা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—এটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বা নিয়ম, যাই তোমরা বল না কেন। এর কারণ আজ অবধি নির্দ্দিষ্ট হয়নি, অথচ কথাটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পবিত্র আরও বলিল, আমাদের এই পৃথিবীটাকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করলে দেখতে পাওয়া যায় এর বার আনা রকম জল আর বাকীটা ডাঙা। তবুও একথা জোর করে বলা চলে, ছেলেমেয়ে নিয়ে পৃথিবীব সব লোকেব জন্য গড-পডতায় আটচল্লিশ বিঘে করে জমি আছে।

লতিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

—মানে, পৃথিবীর সব লোককে সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে রাখতে পারলে এক একটি লোককে আট চল্লিশ বিঘে করে জমি দেওয়া যেত।

—সাহারা বা গোবিতে আটচল্লিশ কেন হাজার বিঘে পেলেও যেতে চাইবে না। নিরঞ্জন শ্লেষেব সহিত বলিয়া উঠিল।

—চাইবে না নিশ্চয়ই, সে কথা হচ্ছে না। শুধু সাহারা, গোবি কেন, মাউণ্ট এভারেষ্ট, গ্রীনল্যাণ্ড—এরা সবাই এ হিসেবের বাইরে। আবার এ কথাও সত্যি—আটচল্লিশ বিঘের সব জমি সমান নয়;—এর আধাআধি ধরলেও গড়-পড়তা চল্লিশ বিঘে তো বটেই। এ তো বড় কম কথা নয়।—এতে চাষ-আবাদ হতে পারে, মাইন রয়েছে, নিদেন

গোচারণের মাঠ এতে থাকবেই ; এ ছাড়া কতকগুলো জায়গায় কল-কারখানা বসান একেবারে অসম্ভব নয়। মোটের উপর দেখতে গেলে এদিক দিয়ে কোন গোল বাধেনি, আর শীগ্‌গির বাধবে বলেও আমার মনে হয় না।

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কোন দিক দিয়ে বাধবে শুনতে পারি কি ?

—বাধবে নয়, বেধেছে বল।

নিরঞ্জন মুখ যথাসম্ভব আরও গভীর করিয়া বলিযা ফেলিল, আই বেগ ইওর পার্ডন্ !

পবিত্র স্মিতহাস্যে জবাব দিল, নটা এম্‌পায়ার—এবা সবাই মিলে পৃথিবীর সিক্সটিসিক্স পারসেন্ট ল্যাণ্ড এরিয়া নিজেদেব ভেতরে ভাগ বাটোওয়ারা করে নিয়ে জুড়ে বসেছে।

—একশ ভাগের ছেষট্টি ভাগ ! লতিকা একেবারে হতভম্ব হইল।

তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র সস্নেহে বলিল, এটুকু শুনেই আঁৎকে উঠলে, এখনও যে "হবি কাষ্ঠাসন" শেষ হয় নি। এরা সিক্সটিসিক্স পার্সেণ্ট ল্যাণ্ড এরিয়ার মালিক হলেও এদেব সবার নিজেদের দেশের টোটাল ল্যাণ্ড এরিয়া হচ্ছে মাত্র ফোর্টিন্ পার্সেণ্ট।

—তার মানে ?

ওয়ার্লডের ল্যাণ্ড এরিয়ার ফোর্টিন পার্সেণ্ট হচ্ছে এদের নিজেদের দেশের টোটাল এরিয়া। আর শতকরা চোদ্দ ভাগ জমির উপর ঘর বেঁধে বাস করছে পৃথিবীব টোটাল পপুলেশনের টোয়নটি থ্রি পার্সেণ্ট লোক, আর বাকি সিক্সটিসিক্স পার্সেণ্টে বাস কচ্ছে সিক্সটিসিক্স পার্সেণ্ট অফ দি ওয়ার্লডস্ টোটাল পপুলেসন।

—ল্যাণ্ড এরিয়া একটা আর একটার ওয়ান্‌ফিফ্‌থ অথচ লোক-সংখ্যা একটা আর একটার চাইতে প্রায় ডবল। নিরঞ্জন অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল।

পবিত্র গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, এ থেকে এর সিগ্নিফিকেনস্‌ বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, হোম্‌ কান্‌ট্রির ডেন্‌সিটি অব পপুলেশন ডিপেণ্ডেন্সির চাইতে কত বেশী।

লতিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হলো?

অমল এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা সে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, পবিত্রকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ও কক্ষণো এর জন্য ইম্পিরিয়ালিজম্‌কে দায়ী কববে না।

পবিত্র শান্ত ভাবে উত্তব দিল, কেন করবো না? ইম্পিরিয়ালিষ্টরা চাইছে, তারা ঘবে বসে সুখ সুবিধে ভোগ করবে আর যারা পবাধীন তারা সবাই মাথাব ঘাম পাযে ফেলে পেটে না খেয়ে তাদের সব জিনিষ জোগাড করে দেবে। এব জন্য ইম্পিরিয়ালিজম্‌ যে দায়ী কোন সেন্‌ ম্যান অস্বীকাব করবে না।

অমল খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাব সব কথাই বুঝলুম, আসল কথাটা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি;—কাজ হবে কী করে?

—না বোঝবার কোন কারণ আমি দেখছি না। যতই ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি করে চেঁচাও না কেন, মানুষের দুটো দিক রয়েছ। একটা জায়গায় সব মানুষ এক; আবার আর একটা জায়গা আছে, যেখানে সবাই আলাদা—কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। ইংরেজিতে বলতে হলে ইউনিটি ইন্‌ ডাইভারসিটি—এটা হচ্ছে ঠিক তাই। এই ডাইভারসিটির মূলে রয়েছে ইণ্ডিভিডুয়াল পারসোনালিটি। সব মানুষ এক, কিন্তু সবাই কি এক রকমের? প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি, গায়ের জোর,

মনের ভাব কি এক? কোন তুজন মানুষ হুবহু এক হতে পারে না। সবাই চাইছে, নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দশ জনের ভেতরে একজন হতে। চোর ডাকাতের সর্দ্দার রয়েছে; জেলে গিয়ে দেখলুম, যে মানুষ খুন করে এসেছে তাকে কয়েদীরা বেশী করে মানে, এ রেস্পেক্ট তারা গাঁটকাটাকে দেখায় না।

—বেশ তো বলে যাচ্ছিলে, আমার বড্ড ভাল লাগচে তোমার কথাগুলো, থামলে কেন? বলিয়া লতিকা সতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পবিত্র আবার বলিতে আরম্ভ করিল, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের পর থেকে, আভিজাত্য বোধ অস্বীকার করতে গিয়ে মানুষ সমাজের একটা ভয়ানক রকম সর্ব্বনাশ করে বসেছে।

নিরঞ্জন গর্জ্জিয়া উঠিল, একথা তুমি কি করে বলছো?

—আভিজাত্য বোধ লোপ পায় নি; এ কোন দিন ধ্বংস হ'তে পারে না। জোর করে গলা টিপে মারতে গিয়ে, আমেরিকায়—অয়েল কিং, ষ্টিল কিং—রাজ্য নেই রাজা হয়ে বসেছে এরা। এদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

অমল একটু উৎসুক হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, এদের তুমি কি করতে চাচ্ছো?

—আমি কিছুই করতে চাচ্ছি না; আমি শুধু বলছি মানুষের এই সহজাত ভাবকে স্বীকার করে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে।

—সে সমাজের আইডিয়াল কি হবে? নিরঞ্জন অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—নতুন সমাজের আদর্শ হবে এই আভিজাত্য বোধকে সব সময় জাগিয়ে রাখা; শুধু জাগিয়ে রাখা নয়—এর উপরে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত

করা। সবাইকে দশ জনের একজন হবার সুযোগ দেওয়া। খাওয়া পরার কথা ভেবে ভেবে মানুষ আজ একেবাবে হয়রান হয়ে গিয়েছে। যার এসব ভাবতে হয় না, সে চুপ করে বসে নেই। সমাজের নানা জায়গায় সে নিজের অধিকার আর প্রতিষ্ঠা বিস্তার করছে। সে হচ্ছে মিনিষ্টার অথবা কাউন্সিলের মেম্বার। যে সেটা পাচ্ছে না, যে আসছে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে অথবা মিউনিসিপালিটিতে। এতেও যে নেই, সে ইউনিয়ানবোর্ডে ঢুকেছে। সে হয় তো আবার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে লোককে জেলে পাঠাচ্ছে। কোন জায়গায় দুপয়সা লাভ করবে বলে সে যায় না, যায় সে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে শুধু নাম কেনবার জন্যে, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে, দশ জনের ভেতরে একজন হবে বলে। হতে পারে, এদের ভেতবে দু-দশ জন আছে। এতে দু-পয়সা পাচ্ছে—কিন্তু সেটা তার মুল লক্ষ্য নয়। এই যে ডিজায়ার ফব ডিস্‌টিংশন্—এটা হচ্ছে মানুষের মনের সব চেয়ে বড না হোক—সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, সর্ব্ব কর্ম্ম প্রেরণার মুল, মানুষকে চুপ কবে বসে থাকতে দেয় না। সায়েন্টিষ্ট যে বসে বসে বিসার্চ করছে, তারও ঐ এক ভাব,—নিছক জ্ঞান লাভ তার আদর্শ হলেও—মুল প্রেরণা হচ্ছে, সে সব চেয়ে বড় সায়েন্টিষ্ট হবে।

পবিত্রের কথায় কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, এই যে বড ছোট ভাব, এরও একটা গণ্ডি বয়েছে ; কবি কবিদের ভেতরে বড, সায়েন্টিষ্ট সায়েন্স নিয়ে বড়, চোর চোরদের দলে বড় হতে চায়। নিজ নিজ দলের ভিতর বড় হওয়ার ইচ্ছেই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক মনোভাব। কবি আভিজাত্য নিয়ে সায়েন্টিষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে না।

—কেন উকিল আর ডাক্তারদের ভেতরে সব সময় ঝগড়া লেগেই আছে। কে বড়, কে ছোট, বলিয়া লতিকা হাসিয়া উঠিল।

—সে কথা সত্যি; কিন্তু এর মূলে রয়েছে আর্থিক আভিজাত্য যেটা নতুন সমাজে থাকবে না।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, এ না হয় হোলো, কতগুলো কাজ রয়েছে ধাঙ্গড়দের কাজ, এ আর কেউ করতে চাইবে না।

—করতে না চাওয়া খুবই স্বাভাবিক, কাজগুলো এখনও নোংরা। এ কাজও মানুষ করবে, করে যদি আনন্দ পায়, মাথা খাটাবার রাস্তা যদি তাতেও খোলা থাকে।

—এ কাজগুলো চিরকাল নোংরা থাকবে, লতিকা বলিয়া উঠিল।

—সত্যি কি তাই থাকবে, বলিয়া পবিত্র একটু হাসিল।

—কেন থাকবে না?

—জে. সি-ডস্-এর আর্টিক্লটা পড়ে দেখ, মিউনিসিপাল গেজেটে বের হয়েছে।

—তুই বল না তাতে কি লেখা আছে, কে আর পুরোনো ফাইল ঘাঁটছে বল? বলিয়া নিরঞ্জন হাই তুলিল।

—মিষ্টার ডসের ওপিনিয়ান হচ্ছে, এ কাজগুলো ভাল করে করতে হলেও চাই এ কাজ করে একটা স্বাভাবিক গর্ব্ব অনুভব করা। এ ছাড়া সায়েন্স এ দিকে অনেকটা প্রোগ্রেস করেছে—ভ্যাকুয়াম্ ক্লিন্জিং, স্যুয়ারেজ সিষ্টেম্, সেপটিক ট্যাঙ্ক—ক্রমে ক্রমে এদিকটার আরও উন্নতি হবে।

অমল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, কথাগুলো শুনতে বেশ, শেষটায় সবাই না হাত গুটিয়ে বসে থাকে। ঢের লোক রয়েছে যারা কোন কাজই কোন দিন করতে চাইবে না। তাদের বেলায় কি করবে?

ধীর ও গম্ভীরভাবে পবিত্র জবাব দিল, তারাও যা চাইবে তাই পাবে। নূতন সমাজে ভিক্ষে বলে কিছু থাকবে না। তুমি বলছো, কাজ করবে না ;—এ কক্ষনো হতে পারে না—একটা না একটা তারা কিছু করবেই করবে। একেবারে অকেজো যাদের তোমরা বল, সামাজিক জীবনে তাদেরও মূল্য রয়েছে। তারা গাইবে গান ; হয়তো কেউ আবার রুগীর সেবা করবে, কেউ হয়তো খেলবে লাঠি, আবার কেউ হয়তো মড়া কাঁধে নিয়ে "বল হরি হরিবোল" বলতে বলতে নিমতলায় যাবে ;—এ সবও কাজ, যার হয়তো আজকের সমাজে কোন আর্থিক মূল্য নেই। মানুষ কক্ষনো হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না ; যে কোন একটা না একটা কাজ তাকে করতেই হবে—নিজেকে অন্তত সুস্থ ও সবল রাখবার জন্যে ; এও যে না করবে, অন্তত সময় কাটাবার জন্য তাকে কিছু করতেই হবে। নিজ নিজ বুদ্ধি, শক্তি এবং মানসিক বৃত্তি অনুসারে স্বাভাবিকভাবে মানুষ নিজের জায়গা খুঁজে নেবে, সমাজের ভেতরে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে। আচ্ছা বেশ, ধরেই নিলুম তোমার কথা সত্যি, কতগুলো লোক চির কাল থাকবে, যারা হচ্ছে এত বড় অপদার্থ যে কোন কাজ তারা করবে না, তাতে কারই বা কি হবে? নূতন সমাজের কোন ক্ষতি তারা তো করতে পারবে না।

লতিকা একেবারে অবাক হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, কোন ক্ষতি তাতে হবে না?

—নিছক কুড়েমি করে আজ কোন লোক সমাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না। র‍্যাশনালিজেশন্ গলা টিপে অনেককে বেকার করেছে আবার এই র‍্যাশনালিজেশনের ভেতরেই এ সমস্যার সমাধান রয়েছে। নূতন সমাজ চলবে—কলকারখানার ওপরে—এতে বেশী

লোককে কাজ করতে হবে না। কতগুলো লোক সব দেশে সব সময়ে কাজ পায় না—এরাই সব কলকারখানা চালাবে, আর যারা রইবে, তারা যা খুশী তাই করবে, তাতে নূতন সমাজের কিছু এসে যাবে না।

নিরঞ্জন ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তুমি ক্যাপিটালিষ্ট্ র‍্যাশনালিজেশনের এত নিন্দে করছো কেন? এতেও তো আন্-এমপ্লয়মেণ্ট ডোলস্ রয়েছে।

পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, রয়েছে সত্যি। ক্যাপিটালিষ্ট সিস্‌টেম্ একেবারে সসেমিরা হয়ে পড়েছে যে। আজকের দিনে এ একেবারে অচল। ডোলস্ দিচ্ছে; এ টাকা আসছে কোত্থেকে?

—শুধু ডোল দেবে কেন? কাজও তো দিচ্ছে, বলিয়া নিরঞ্জন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, আমার কাছে দু-ই এক। যারা গরীব, যারা বেকার তাদের হয় ভিক্ষে দিচ্ছে, না হয় কাজ দিচ্ছে;—ফেমীনের সময় আমাদের দেশেও এরকম দেখেছি। এটা একটা টেম্‌পোরারি মেকশিফ্‌ট্ বইতো নয়,—কোন রকমে টিকিয়ে রাখা? এরকম করে বেশী দিন চলতে পাবে না; চলবে কি করে? কাজ দেবার জন্যে—রাস্তাঘাট তৈরী করা, নোংরা পল্লীগুলি পরিষ্কার—এ দুটোই দেখছি আজকের প্রোগ্রাম। এতে কি হবে? এ সব কাজের জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে। সব দেশের গভর্ণমেণ্ট আজ একেবারে দেউলিয়া—কোনরকম করে ঠাট বজায় রেখেছে; তাদের এ জন্যে টাকা ধার করতে হচ্ছে না বড়লোকদের কাছ থেকে? এর সুদ দিতে হচ্ছে না? সিংকিং ফাণ্ড নেই এর? যে সব কাজ হচ্ছে, তাতে গভর্ণমেণ্টের এমন দু পয়সা লাভ নেই যা দিয়ে টাকা শোধ দেবে। এর জন্য ট্যাক্স বসাতে হয়েছে, আগেকার চাইতে ঢের বেশী

ট্যাক্স বসেছে বিদেশী জিনিষের ওপরে ; গরীব লোকদের এতে বেশী দাম দিয়ে সে সব জিনিষ কিনতে হচ্ছে না ? গভর্ণমেণ্ট বাঁ হাত দিয়ে যে টাকা ভিক্ষে দিচ্ছে, ডান হাত দিয়ে সেটা কেড়ে নিচ্ছে না ?

লতিকা সলজ্জভাবে বলিয়া উঠিল, একটা কথা হয়তো তুমি ভাল করে ভেবে দেখনি—

পবিত্র সস্নেহে কহিল, বলতে বলতে থেমে গেলে যে ? বলনা, কি কথা আমি ভেবে দেখিনি।

—কুলি মজুরদের তুমি চেন না ; শুনেছি, ওরা নাকি বদলোক—টাকা পেলেই মদ খায়, বলিয়া লতিকা সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

—হাঁ, এটা একটা কথা বটে !

তারপর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, যে নূতন সমাজের কথা বলছি, এটা দু-একদিনের ভিতরে গড়ে উঠবে না, অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে—দু এক ফোঁটা রক্তপাত যে হবে না, এমন নয়। নূতন সমাজ গড়ে ওঠবার আগে বড রকমের একটা গোলমাল বেধে যাবে, যাতে কুলি মজুররা অনেকটা সংযত হয়ে উঠবে। দেখছ না, সোভিয়েট রাশিয়ার লোকদের ?

অমল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, ধনিকরা তাদের সুখ সুবিধে ছেড়ে দেবে কেন ?

—ছেড়ে দিতেই হবে যে তাদের। তারাও যে সবাই মরতে বসেছে—তোমার ক্লাস-ওয়ারের জন্য বসে নেই ; ক্লাস-ওয়ারের আর দরকার হবে না।

নিরঞ্জন বিরক্ত হইয়া বলিল, কি সব বাজে কথা বলছো, রুজ-ভেল্ট কি সব কাণ্ড করে বসেছেন ! এর পর তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে মনে করছো ? কিছুতেই করবে না।

পবিত্র ধীরভাবে জবাব দিল, মানবে না আমি জানি। এখন মানবে না, পরে মানবে; যখন এর চাইতেও কঠিন অবস্থা এসে পড়বে। এবারের ক্রাইসিসে সবাই মুসড়ে গেছে, বুঝতে পাচ্ছে না, কোথা দিয়ে কি হোলো। এর পর যে সঙ্কট আসছে—বেশী দেরীও আর নেই—সেটা সব ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দেবে। সবাই তখন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠবে, নূতন সমাজকে সাদরে বরণ করে নেবে।

অমল মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, সেটা যে কমিউনিষ্টিক্ হবে না তোমায় কে বললে?

—কেউ বলেনি; এটা হচ্ছে আমার ধারণা—যে ধারণার মূলে রয়েছে ধনশক্তির ঘাত প্রতিঘাতের ওপরে অমোঘ বিশ্বাস।

লতিকা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই; অমল আর পবিত্রের ভিতরে একটা দ্বন্দ্বের সূচনা দেখিয়া, কথাটা ঘুরাইবার জন্য বলিল, কি করে বুঝলে আর একটা ক্রাইসিস শীগ্‌গির আসছে যেটা আরও বড়, আরও ভয়ঙ্কর?

পবিত্র উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিল, পৃথিবীর ধুরন্ধররা সবাই জানে। কোথা থেকে কি হচ্ছে তারা সবাই জানে, তাবা জানে কলকাবখানার এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে, যাতে সব জিনিষ এত বেশী বেশী তৈরী হচ্ছে, যে আগেকার মত দাম উঠতে পারে না; তারা জানে, কলকারখানার জন্যেই দিন দিন এত বেশী করে লোক বেকার হয়ে বসে রয়েছে; তারা জানে, প্রডাকশন আর ডিসট্রিবিউশনের ভেতরে আগেকার মত মিল নেই—বেকার লোক বেশী হওয়াতে জিনিষ কেনবার লোক দিন দিন কমে যাচ্ছে,—তাতে জিনিষের দাম আরও পড়ে যাচ্ছে; জিনিষের দাম নেই বলে দেনদাররা সুদ আসল কিছু দিতে পারছে না।

—সুদ দিতে পারছে না কেন? লতিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কি করে দেবে বল? যে সময় দেনা করেছিল, তখন পাটের দাম ছিল, নটাকা দশটাকা, এখন হয়েছে—দেড়টাকা দুটাকা; শুধবে কি দিয়ে? পাট বিক্রী করে, তেল নুন কিনবে, না দেনাশোধ করবে? একি কখনও কেউ করে, না পারে? জমির খাজনা দিতে হবে না? নটাকা দেনার জন্য আগেকার দিনে এক মণ পাট বিক্রী করলেই হতো, এখন তাকে ছমণ পাট বিক্রী করতে হবে না? সবাই জানে, এ দেনা আর কোনদিন শোধ হবে না, মহাজন কিন্তু আশা ছাড়েনি। সব দেশের চারদিকে এত উঁচু করে ট্যারিফ ওয়াল দিয়েছে, এক দেশের মাল আর এক দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমেরিকা আর য়ুরোপের গোল রয়েই গেল;—আমেরিকা এক পয়সাও ছাড়তে চাইছে না। ছাড়বে কি করে? মহাজন আসল ছেড়ে দেবে তো সুদ ছাড়বে না। আমেরিকা চাচ্ছে সোনা;—য়ুরোপ দেবে কোত্থেকে? সোনা না নিয়ে জিনিষ নিলে আমেরিকার লোকসান—বাইরেকার জিনিষ এসে ভিতরকার বাজার ছেয়ে ফেলবে—এ ঠেকাবার জন্যেই না আমেরিকা ট্যারিফ বসিয়েছে? আবার যারা দেনার জন্যে মাল দেবে, তাদের কাছ থেকে আমেরিকাকে বেশী করে মাল নিতে হবে,—নইলে তারা আমেরিকার তুলো কিনবে কি দিয়ে? কারবারের লেন্‌দেন যা চলে এসেছে, তার চাইতে বেশী মাল আমেরিকাকে নিতে হবে, নইলে য়ুরোপ দেনা শুধবে কি করে? আমেরিকা কি রাজি হবে? হতে পারে না। আমেরিকা সোনা নিতে চায় নিক;—সেটাকে ব্যবসায় খাটাতে হবে—তা যদি করে আর ভাবতে হবে না; য়ুরোপের সোনা আবার ঘরে ফিরে আসবে।

—কেন আসছে না তাহলে? লতিকা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

—কি করে আসবে? আমেরিকা সে ভাবে টাকা খাটাতে পারে না;—খাটালে সে দেশে জিনিষের দাম হুহু করে বেড়ে যাবে—বিদেশ থেকে মাল এসে আমেরিকার বাজার ছেয়ে ফেলবে যে! টাকা বেশী দিন হাতে থাকলে হাত সুড়সুড় করতে থাকে! ওরা তো আমাদের দেশের বড লোকদের মত নয়, যে মেয়ে মানুষ আর মদের পেছনে টাকা ঢালবে;—ষ্টক্ মার্কেটে সারকুলেশন্ সুরু করে দেবে;—আবার সেকেণ্ড ওয়াল ষ্ট্রীট্ ক্রাশ হয়ে পৃথিবীকে তোলপাড় করে তুলবে না?

তারপর পবিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হাঁ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব চেষ্টা করছেন বটে, তাঁকে প্রশংসা করতেই হবে আমাদের। আমেরিকা গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাস্পেণ্ড করার পর থেকে, জিনিষ পত্রের দর বাড়তে সুরু করেছে; মজুত কাঁচা মালও খানিকটা কেটেছে—সে দেশের কমার্স আর ইন্ডাষ্ট্রির খানিকটা উন্নতি হয়েছে বই কি। ভুষি মালও কিছু কাটছে, দাম কমে যাবার জন্যে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডস্—পার্টলি ফিনিশ্ড্, হোললি ফিনিশ্ড্-ও কিছু কিছু করে কমে এসেছে। কিন্তু এ থেকে আর কতটা উন্নতির আশা করতে পারি আমরা?

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, এটাই কি কম হলো মনে করছো?

পবিত্র হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; জোরে টেবিলে করাঘাত করিয়া কহিল, কি বলছিস্ তুই, নিরু! একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। এর ভেতরে য়ুরোপে সাজ সাজ রব উঠেছে;—নাৎসিরা ওঁৎ পেতে রয়েছে, সুবিধে পেলেই ফ্রান্সের ওপর লাফিয়ে পড়বে; জাপান ধরাকে সরা জ্ঞান করছে না? লড়াইয়ের সময় দূরে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের অবস্থা ভাল করেছে বলে, একেবারে আঙুল ফুলে কলা গাছ আর কি! ইটালি আবিসিনিয়ার টুঁটি চেপে ধরে মহা তম্বি লাগিয়েছে।

আমাদের মহাপ্রভুরাও কম নন—মুখে সব সময় ডিস্‌আরমামেণ্ট বুলি আওড়াচ্ছেন—এদিকে বড় বড় ক্যাপিটাল-শিপ তৈরী করবার চেষ্টা হচ্ছে। ক্যাপিটালিষ্ট কান্‌ট্রিরা জানে লড়াই না হলে ক্রাইসিস্‌ থেকে তারা বের হতে পারবে না। রুজভেল্ট যেটুকু উন্নতি করেছেন সেটাকে ক্যাপিটালিষ্ট ওয়েতে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য চারদিক থেকে ভয়ানক রকমের তোড়জোড় হচ্ছে না ?

লতিকা বাধা দিয়া বলিল, তোমাব কথা মোটেই বুঝতে পারছি না। পবিত্র অধীর ভাবে বলিতে লাগিল, চারদিক থেকে প্ল্যানিং প্ল্যানিং একটা রব উঠেছে। যেন প্ল্যানিং আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। প্ল্যানিং মানে কি ? ন্যাশনাল ইকনমিক প্ল্যানিং হচ্ছে, সব দিক থেকে নিজের দেশকে বড় করা—এতে অন্য দেশগুলো মরুক আর বাঁচুক, পৃথিবী রসাতলে যাক—কার কি ক্ষতি! যত সব পাগলামি। পৃথিবীতে হিংসা আর স্বার্থপরতার স্রোত বইবে। যার জন্য এত বড একটা লড়াই হয়ে গেল—এখনও কুড়ি বছর হয়নি, শেষ হয়েছে—এরই ভিতরে চার দিক থেকে আর একটা লডাই বাধাবাব ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্র করছে কারা ? যত সব ধনিক আর বড় লোক। তারা ভাবছে, আমার কি ক্ষতি হবে ? আমি তো আরাম কেদারায় বসে থাকবো। এ সুখ ভোগ তাকে এবারে করতে হবে না।

লতিকার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল ; সে করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করিল, এ থেকে কি রক্ষা পাওয়া যায় না ?

—যাবে কি করে ? এটা হচ্ছে, এজ অব প্লেন্‌টি ,—সব জিনিষ এ যুগে বেশী করে তৈরী হচ্ছে, আর হবে। ক্যাপিটালিষ্টরা চাচ্ছে গলা টিপে এটাকে এজ অব স্কেয়ারসিটি করতে। তারা চাচ্ছে যাতে জিনিষ কম তৈরী হয়, তারা দুপয়সা বেশী করে পায়। সায়েন্‌টিস্‌ট

লাভ লোকসানের ধার ধারে না ;—মনের আনন্দে নতুন নতুন কল বের করছে—এজ অব প্লেন্‌টিকে আরও এগিয়ে আনছে। পুরানো সমাজের বুকে ভাঙন ধরেছে ; চারদিক থেকে জোড়াতাড়া দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছে। মুমূর্ষু যে, তাকে সূচিকাভরণ দিয়ে আর কদ্দিন টিকিয়ে রাখবে ? পুরানো জরাজীর্ণ সমাজ মরবেই মরবে ;—দুদিন আগে আর দুদিন পরে।

১০

অমল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, অনেক কথাই তো হলো ; এবারে বল তো, তোমার নতুন সমাজের চেহারা কেমন দেখতে ?

তাহার কথার সুর পবিত্রের ভাল লাগিল না ; বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নতুন সমাজ কি রকম ?

—কেন ? নতুন ইউটোপিয়া। এ রকম তো আজ আর নতুন হচ্ছে না ? যার যা খুশী বলে যাচ্ছে ; তুমিই বা বলবে না কেন ?

—যা খুশী তাই বলছি আমি ? পবিত্র অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—যা খুশী তাই বলনি ? কাকে তুমি বাদ দিলে ? মস্ত বড় দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছ যে। মুখে বললেই হয় না ;—চেষ্টা করেছ কোন দিন ? করলে এ আইডল্ ড্রীম্ তোমায় পেয়ে বসতো না। নিজেও কিছু করবে না, আর যে কেউ কিছু করে এ ইচ্ছেও তোমার নেই ;—বসে বসে চুল-চেরা তর্ক।

বিরক্তিতে অমলের মন বিষাইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার আরও অনেক কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল—কিন্তু পারিল না ;—তখনও সে পবিত্রের সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয় নাই।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, তুমি বড্ড ভুল করছো অমল, কোন কাজ করবার ইচ্ছে বা ক্ষমতা আমার নেই। কাজ করবে, তুমি আর নিরু, লতিকাও কাজের মেয়ে ;—আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না—বসে বসে কুড়েমি করবো।

—আমায় আবার টানছো কেন ? আমাকে দিয়ে কোন কাজটাজ হবে না, গোড়া থেকেই বলে রাখছি। বলিয়া লতিকা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জন হাঁকিল, কথা কাটাকাটি করে রাত ভোর করিস্‌নি পবি, আমরা এখনও তোর নিউ অর্ডারের হদিস পাইনি।

পবিত্র আড়মোড়া ভাঙিল, বলিল, আজ আর পারছি না ; আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

লতিকা কি যেন বলিতে চাহিল, নিরঞ্জন বাধা দিয়া হাঁকিল, নাউ অর নেভার। গলা শুকিয়ে গেছে, ভিজিয়ে নে না—বয়, চার কাপ চা।

লতিকা শঙ্কিত ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কহিল, তোমরা আজ রাত ভোর করবে দেখছি, আমার আর বসে থাকলে চলবে না—দেখিগে, ওদিককার কি ব্যবস্থা হলো।

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কোন হাঙ্গামা তোমায় করতে হবে না আজ, বয়কে চাংওয়ায় পাঠিয়ে দাও—ডিনার নিয়ে আসুক।

—এত রাতে কি ডিনার পাবে ?

—যা পাবে তাই আনবে,—প্রন কাটলেট্, চপ—যা পাবে তাই নিয়ে আসবে। আর, আর,—সে সব কি তোমার এখানে—বলিয়া নিরঞ্জন লতিকার মুখের দিকে চাহিল।

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল না, ওসব এখানে চলবে না। তোমরা বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না—সেই বিকেল থেকে বসে আছো। আমি বাড়ীতে খেয়ে নিচ্ছি।

নিরঞ্জন মুখ ভার করিয়া বলিল, না, সবাই এক টেবিলে খাব, তুমি বয়কে শীগগির করে পাঠিয়ে দাও—একটু পা চালিয়ে যাক্।

চা আসিল।

পেয়ালায় ঠোঁট ঠেকাইয়া নিরঞ্জন হাঁকিল, পবি, আর কেন?

পবিত্র মৃদু স্বরে কহিল, আজই বলতে হবে? এখনও যে ডেফিনিট শেপ নেয়নি আমার মনে।

—কবিত্ব রেখে, যা তোর মনে হচ্ছে বল না বাপু—অ্যাপলজি ঢের হয়েছে। আমরা আর সবুর করতে পারবো না। বলতে স্বরু করলে, আর একখানা মহাভারত হয়ে উঠবে—কোন কথা গুছিয়ে বলতে তুই শিখিস্‌নি, শুধু শুধু ফেনিয়ে একটা ছোট কথাকে বড় করে তোলা হচ্ছে তোর হ্যাবিট্, মরলেও যাবে না। বলিয়া নিরঞ্জন পুনরায় চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করিল।

পবিত্র আরম্ভ করিল, ষ্টেট আর সোসাইটি। রাষ্ট্র মানুষের কাছে স্বাভাবিক কিনা জানি না, কিন্তু সমাজ না থাকলে মানুষ একদিনও টিকতে পারে না—রবিন্‌সন ক্রুসোর কথা ভাবলে, সব সময় একথাটাই মনে হয়। রাষ্ট্রের শক্তি আজ খুবই বেড়ে উঠেছে, মানুষকে একেবারে খেলার পুতুল করে ফেলেছে—তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে ষ্টেট্ আজ মুখ ফিরে তাকায় না। শুধু এ জন্যে কমিউনিজম্ আর ফ্যাসিজম্ এর

কোনটাই আমার সহ্য হয় না। এব চাইতে ডেমোক্র্যাসি ঢের ভাল, কিন্তু এ যুগে ডেমোক্র্যাসি একেবারে অচল।

লতিকাব ইচ্ছা হইল, একবাব জিজ্ঞাসা কবে, কেন ডেমোক্র্যাসি অচল। কথা বলিলেই কথা বাড়িবে ভাবিয়া সে আর প্রশ্ন করিল না। পবিত্র তাহা লক্ষ্য করিল, বলিল, কোন কথা বলতে চাচ্ছ কি? লতিকাব চোখ মুখেব চেহাবা কেমন যেন হইয়া গেল, সে অস্ফুট কণ্ঠে জানাইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিতে চায় না।

পবিত্র বলিতে লাগিল, মানুষ আব সমাজেব গোল মিটাতে হবে। সোসিয়ালিষ্ট আব ফ্যাসিষ্ট ষ্টেটকে বড্ড বড কবে তুলেছে, আবাব অ্যানাবকিষ্ট একে একেবাব আমল দিতে চাচ্ছে না। ষ্টেটেবই আজ জয় জয়কাব, কিন্তু বেশী দিন এ চলবে না। আমি ভাবছি—একটা ন্যাচাবল বিলেশনশিপেব কথা।

নিবঞ্জন উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ন্যাচাবল বিলেশন কি বকম?

—সমাজও থাকবে, মানুষও বাঁচবে, কেউ কাউকে চেপে মাবতে পাববে না।

—সে কথাই তো এতক্ষণ শুনতে চাচ্ছি। ভূমিকা বেখে আসল কথাটা বল না।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, এত তাডা দিলে বলবো কি কবে? তাব পব সে আবার আবম্ভ কবিল, মানুষ দল বেঁধে থাকতে চায়—অভ্যস্থ বলে নয়—দল বেঁধে না থাকলে তাব একদিনও চলে না। দুএকজন সন্ন্যাসী হয়তো বয়েছেন—তাঁদেব না হয ছেডেই দিলুম—তাঁবাও কোন না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। দল বেঁধে থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলে, এব নামকরণ আমি কবতে চাচ্ছি—সঙ্ঘ। আমাব মতকে আমি বলবো সঙ্ঘবাদ।

অমল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, ওঃ! সিন্‌ডিক্যালিজমের কথা বলছ। ইভন্ গিল্ড সোসিয়ালিজম্ ইজ ডেড অ্যাজ মাটন্।

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, যতটা ভাবছো ততটা এখনও হয়নি। ফ্যাসিজমের ইকনমিক্ সাইড সিণ্ডিক্যালিজম্ বই কি? সে কথা হচ্ছে না। আমি ফাঙ্কশনাল সিন্‌ডিক্যালিজমের কথা বলছি না, রিজিঅনাল সিণ্ডিক্যালিজমের কথা—তা না হলে এর নতুন করে নাম রাখবার দরকার হতো না।

অমল একটু অপ্রতিভ হইল, মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, বেশ যা বলছিলে বল।

পবিত্র আবার সুরু করিল, এক একটা জায়গা জুড়ে এক একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠবে ;—প্রতিষ্ঠা নয়—গড়ে উঠবে আপনা আপনি স্বাভাবিক ভাবে ; বাইরে থেকে কেউ এসে একে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

—বেশ ; তারপর ?

—যে কোন-লোক যতটুকু সময়ের জন্যে সঙ্ঘের সীমানার ভেতরে এসে পড়বে, সেটুকু সময়ের জন্য সে হবে সঙ্ঘের সভ্য। কোন কাজ করবার দায়িত্ব তার থাকবে না ; যে জিনিষ তার দরকার হবে সঙ্ঘের কাছে চাইলেই পাবে।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এসব জিনিষ-পত্রের মালিক কে হবে? ল্যাণ্ড, ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টস্ অব্ প্রডাকশনের মালিক কি হবে সঙ্ঘ ?

—না, কেউ এর মালিক থাকবে না।

—সঙ্ঘও নয় ?

—না। সম্পত্তি কার ? এ নিয়ে যত গোলমাল সুরু হয় ; মানুষ বলছে, তার ; সমাজ বা রাষ্ট্র বলছে, আমার। এই সম্পত্তিজ্ঞান থেকেই যত সব বাধা-নিষেধের সৃষ্টি হয়েছে ;—আইন-কানুন, শাসন ও শোষণের কথা মানুষের মনে গজিয়ে উঠেছে। নতুন সমাজে এসব কিছু আর থাকবে না।

নিরঞ্জনের মনে গভীর সন্দেহের উদয় হইল ; সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সমাজে শৃঙ্খলা থাকবে কি করে ? জিনিষপত্রই বা কে তৈরী করবে ?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, কাজের কথা বলছি ; সমাজ-শৃঙ্খলার কথা পরে বলবো। মানুষ মনের আনন্দে কাজ করবে, তাতে সব জিনিষ তৈরী হবে। মানুষ মনের আনন্দে পরস্পরেব সেবা করবে। এ সব করবে সে ভিতরকার আভিজাত্য-বোধ থেকে, দশ জনের ভিতরে এক জন হবে বলে ;—বাইবের শাসন অথবা পেটের দায়ে নয়—মনের স্ফূর্ত্তিতে, ভিতবকাব তাগিদে।

লতিকা সলজ্জভাবে বলিল, এ সব কি কবে হবে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

পবিত্র সস্নেহে বলিল, বেশ এক্‌জাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—তাই দাও, নইলে আমাব সব গুলিয়ে যাবে। বলিয়া লতিকা তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

পবিত্র বলিতে লাগিল, মনে কর বাঙলার এক একটা ইউনিয়ান বোর্ড এক একটা সঙ্ঘ, এর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানা রয়েছে। এর ভিতরকার কোন ধন-সম্পত্তির কেউ মালিক থাকবে না, এমন কি ইউনিয়ান বোর্ডও নয়।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে সঙ্ঘের দরকার কি ?

—দরকার আছে বইকি। সঙ্ঘ মালিক না হতে পারে, কিন্তু সব জিনিষের একটা বিধি-ব্যবস্থা করতে হবে না? সঙ্ঘ হচ্ছে একটা অরগ্যানিজেশন্, যেটা এ সব বিধি ব্যবস্থা করবে। ষ্টেটও একটা অর্গ্যানিজেশন্ বই তো নয়! শুধু তফাৎ এটুকু—ষ্টেট মনে করছে সেই সব, আর যা কিছু আছে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়—তারা সব ষ্টেটকে নির্ব্বিচারে মানবে; নইলে ষ্টেট তাদের সাজা দেবে। সঙ্ঘের এ ক্ষমতা বা অধিকার থাকবে না।

—বেশ তো; এতে কি হলো? কাজ চলবে কি করে?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, সঙ্ঘের সভ্যদেরও ওই এক কথা, কাজ হবে কি করে? তারা সবাই বলাবলি করে, তর্ক করে, ঝগড়া করে; এদের ভিতরে কয়েক জন রয়েছে অমলের মত কাজ-পাগলা; এরকম দুজন একজন নয়—পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি, আরও কত! দুচার কথা বলে তারা কাজের মোটামুটি একটা প্ল্যান্ করে, কাজ সুরু করে দেয়। আর সবাই কথা কাটাকাটি করে হয়রান হয়ে পড়ে, এদের দেখে কাজ সুরু করে—যার যা খুশী সেই কাজ করে, চুপ করে কেউ বসে থাকে না;—কেউ লাঙল নিয়ে চাষ করে, কেউ সেলাই করে জুতো, কেউ আবার মড়া কাঁধে করে নদীর ধারে যায়।

লতিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, যারা আমার মত কুড়ের বাদশা তারা কি করে?

—বসে বসে গল্প করে, গান গায়, নাচে, হাসে, ঠাট্টা করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

অমল গম্ভীরভাবে হাঁকিল, এদের খেতে পরতে দেবে কে?

—কেন, সঙ্ঘ!

—সঙ্ঘ সঙ্ঘ, শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। দেবে

কোত্থেকে? বলিয়া অমল টেবিলের উপর জোরে করাঘাত করিল।

পবিত্র জবাব দিল, কেজো লোকরা দেখে সবাই বসে নেই—কিন্তু কাজের চাইতে অকাজ হচ্ছে বেশী—শুধু হাসি, ঠাট্টা আর গল্প। কেজো লোকেরা তো আর এসব পারে না—গল্প শুনতে আসে, খুশী হয়ে ফিরে যায়।

লতিকা হাসিয়া উঠিল, বলিল, গল্প করতে পারে না?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তুমি তো বরাবর সে কথাই শুনিয়ে এসেছ।

লতিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে আর কোন কথা বলিল না।

—কেজো লোকরা ভাবে, দূর ছাই, আমিও না হয় বসে বসে গল্প করি,—ভুদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকিগে—এত খাটতে আর পারি না। হয়তো তারা সত্যি সত্যি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এদের ভিতরে যারা মাথাওয়ালা অথচ কাজ-পাগলা, তারা বসে বসে ভাবে, অনেক নতুন কল বেব হয়েছে, একটা বসাতে পারলে বেশ হয়—আর গায়ে খাটতে পারি না। ভুদিন বাদে একটা কল বসে, তারপর আর একটা—পর পর কত কল বসায় তাব ঠিক নেই।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, এত কল বসবে, ক্যাপিটাল পাবে কোত্থেকে?

—পরে বলছি। গোড়াতে কলের কথা তাদের মনে হয় না; ভাল ভাল বীজ বেছে বের করে ভূঁইয়ে ফেলে, ফলন বেশী হয়; আশেপাশের সজ্ঘ থেকে, দূরেব সজ্ঘ থেকে নতুন নতুন বীজ এনে ভাল করে চাষ আবাদ কবে। চাষ করতে গিয়ে তারা দেখে, এ গরু দিয়ে ভাল চাষ হয় না;—চাষ তো নয় মাটিতে দাগ কাটা। এতটুকু ভুধে

আর চলে না, সবাই খেতে চায় দুধ। নানা জায়গা থেকে ষ্টাড্ বুল এনে ব্রীড্ করে—বছর দুই পরে সে ষাঁড় ভারী লাঙল টানে; গাই বেশী করে দুধ দেয়—তা থেকে হয় ছানা, মাখন, ঘি—খেয়ে সবাই ষ্টাউট্ এণ্ড ষ্ট্রং হয়।

শ্বাসরোধ করিয়া লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

—এতেও এরা খুশী হয় না। এদ্দিন পেট ভরে খায়নি, খেয়ে দেয়ে তাদের গায়ে জোর হয়, আনন্দে মন নেচে ওঠে। এত কাজ, মোটেই সময় পায় না কাজ-পাগলা লোকগুলো।

—তারা তখন কি করে?

—তারা বসে বসে ভাবে আর দেখে, মানুষ খেতে পাচ্ছে পেট ভরে, কিন্তু গাই বাছুরদের খাওয়ার জোগাড় এখনও হয়নি। এসবের ব্যবস্থা তারা করে।

—কি করে করবে?

—নেপিয়ার ঘাস্ লাগায়, গিনি গ্রাস্ লাগায়;—ফডার কাঁচা রাখবার জন্য সাইলাস্ তৈরী করে। এত করেও তারা খুশী হয় না;—মাটিতে নতুন নতুন সার দেয়—ভাল ভাল সার—ফলন আরও বাড়ে; খেয়ে শেষ করতে পারে না সঙ্ঘের সবাই মিলে। তাদের সবার গায়ে জোর হয়; মন নেচে ওঠে; কিন্তু তখনও তারা সময় পায় না ফূর্তি করবার—হাতে যে বড্ড বেশী কাজ তাদের।

—তাহলে আর তারা কি করবে? লতিকা ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—তারা কলের লাঙল এনে মাইলকে মাইল চাষ করে ফেলে; তারা ছোট ছোট কারখানা বসায়—ধান ছেটে চাল তৈরী করে, জমির সরষে দিয়ে তেল তৈরী করে; হাড়গুলো বাইরে নিয়ে যেতে

দেয় না—পিষে গুঁড়ো করে জমিতে ছড়িয়ে দেয়, কল দিয়ে জমিতে জল সেচে, এসব মাঝে মাঝে ভেঙে যায়—মেরামত করবার জন্য কারখানা গড়ে ওঠে।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কববে কে?

—সঙ্ঘ।

—কল কিনবে কে?

—সঙ্ঘ। সঙ্ঘেব লোকবা নয়।

—কার কাছ থেকে কিনবে?

—যে সব সঙ্ঘ কল তৈরী করছে, তাদের কাছ থেকে।

—টাকা পাবে কোত্থেকে?

—মাটি ফুঁড়ে বের হবে টাকা। সঙ্ঘের মাটিতে ফলবে সোনা; সবাই খেয়ে দেয়ে যেটা বাঁচবে সেটাই হবে সঙ্ঘের মূলধন। বাঙলার হাটে মাঠে সোনারূপো বিক্রি হচ্ছে না? এখনও অনেক রয়েছে—তাই দিয়ে কিনবে।

নিরঞ্জন বিরক্ত হইয়া বলিল, সে সোনা তো আর সঙ্ঘের নয়; সে যে গাঁয়ের লোকদের।

—মাটিতে পুঁতে রেখে তারা আর কি করবে? টাকা দিয়ে তো কোন জিনিষ কিন্‌তে পাবে না; কেনার দরকারই বা হবে কেন? তারা যে যা চাইবে তাই পাবে। ঘরের সোনারূপো সঙ্ঘের হাতে এনে তুলে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হবে।

—সেগুলো থাকবে কোথায়?

—একটু সবুর কর, পরে বলছি।

অমল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, জমিদারদের তুমি কি করবে?

—কিছু করবো না।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, এর সলিউশন্ তুমি এখনও করতে পারনি, পারবে না জানি।

পবিত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, জবাব দিল, কেন পারবো না? জমিদার কি করে দেখেছি তো—খাজনা আদায় করে গভর্ণমেণ্টকে রেভিনিউ দেয়। যেটা ব্যালান্স থাকে তা দিয়ে ফুর্ত্তি করে—এ আর কে না জানে? সঙ্ঘ জমিদারকে বলবে—কোর্ট অব ওয়ার্ডসে আর দিচ্ছ কেন? রেভিনিউ আমি দিচ্ছি, তোমার কি চাই বল—আমি তোমায় সব দেব। হ্যাঁ, একটা কথা—তুমি সঙ্ঘের বাইরে যেতে পারবে না, বাইরে গিয়েছ কি তোমার সব বন্ধ করে দেবে।

লতিকা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এর বেলায় এত কড়াকড়ি কেন? এটা কি ভাল হবে?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, না করে যে চলে না। নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—একেবারে ভেস্তে যাবে যে। গাঁ ছেড়ে সহরে গিয়ে থেকে এরা যে আমাদের বড্ড লোকসান করেছে, গাঁয়ে এমন একজন নেই যার কথা কেউ মানবে। সঙ্ঘের গোড়াতে এদের যে আমাদের খুব দরকার—টু বি লিডার্স অব মেন। তার ওপর এরা বাইরে গিয়ে থাকলে গাঁয়ের ইকনমিক্ লস্ হয় যে বড্ড।

লতিকা প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, যারা সঙ্ঘের ভেতরে থাকবে, তারা সঙ্ঘের বাইরে জিনিষ নিয়ে যেতে পারবে না?

—পারবে বই কি। কেন পারবে না?

—তাহলে জমিদারই বা বাইরে থেকে পাবে না কেন সব জিনিষ?

পবিত্র থতমত ভাবে জবাব দিল, এক্সচেঞ্জ অব গুডস্ যে হবে সঙ্ঘে সঙ্ঘে; সঙ্ঘ আর ইন্ডিভিডুয়াল ম্যানের ভেতরে জিনিষ কেনা-বেচা হবে না।

অমলের মুখে চোখে বিজয়ীর আনন্দ। সে সহাস্যে বলিয়া উঠিল, তাতে কি হয়েছে? তোমার ডক্‌ট্রিন্ এ জায়গায় একেবারে সাইলেণ্ট; কোন জবাব আর তোমার নেই। মাই হার্টি থ্যাঙ্কস্ টু ইউ, লতি!

পবিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইল; ফ্যাল ফ্যাল করিয়া লতিকা আর অমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমল সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কথা বুঝতে পারছো না?

পবিত্র অপ্রতিভ ভাবে জানাইল, সে আর কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছে না।

অমল সস্নেহে কহিল, মনে কর, রামপুর আর রসুলপুর দুটো সঙ্ঘ, পাশাপাশি বা দূরে দূরে—তোমার যা খুশী। তুমি বললে রামপুর আর বসুলপুরের ভেতরে এক্সচেঞ্জ অব গুডস্ হবে; রামপুর আর রসুলপুরের লোকেদের ভেতরে জিনিষ বেচা-কেনা হতে পারবে না। ঠিক কি না?

পবিত্র ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—রামপুবের লোক রসুলপুরে গিয়ে থাকতে পারে?

—পারে।

—বামপুরের লোক রসুলপুরে যাবাব সময় তার জিনিষপত্র নিয়ে যেতে পারবে?

—পারবে; কোন বাধা আমি দেব না।

—তাহলে রসুলপুরের লোককে রসুলপুরে বসে থেকে রামপুর থেকে জিনিষ নিতে দেবে না কেন? আমাদের কথা এবারে বুঝেছো?

পবিত্র সে কথার কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে চিন্তা কবিতে লাগিল।

বয় হোটেল হইতে ফিরিয়া আসিল।

লতিকা টেবিল সাজাইয়া পবিত্রের পাশে আসিয়া বসিল, সস্নেহে বলিল, এখনও বসে বসে ভাবছো! খাবে চল, রাত অনেক হয়েছে। তোমরাও উঠে এসো, দেরী করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পবিত্র চোখ চাহিয়া বলিল, এ রেস্‌ট্রিক্‌শনও আর থাকবে না। রেস্‌ট্রিক্‌শন্ থাকবে শুধু একটা জায়গায়।

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল, সেটা শুন্‌তে পারি কি?

লতিকার কান্না আসিবার উপক্রম হইল; করুণ স্বরে বলিল, অমলদা, দোহাই তোমার! আর ওঁকে ঘাঁটিয়ো না। এবারে তোমরা সবাই খাবে চল।

অমল মনে মনে বিরক্ত হইল; তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, যাচ্ছি। কি হে পবিত্র, বলবে না আমাদের কথাটা?

পবিত্র একবার লতিকার মুখের দিকে চাহিল; তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, বলবো বই কি! এক সঙ্ঘের লোক আর এক সঙ্ঘের থেকে সব জিনিষই পাবে, পাবে না শুধু সে সব জিনিষ, যেগুলো তার নিজের সঙ্ঘে তৈরী হচ্ছে—সেগুলো সে চাইবেও না।

অমল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন পাবে না?

লতিকা হতাশ হইয়া বলিয়া ফেলিল, আবার তুমি সুরু করলে, অমলদা! ওঁর কি খিদে তেষ্টার খেয়াল আছে?

অমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল; সহাস্যে বলিল, চল যাচ্ছি।

১১

—একখানা ডিস কম হচ্ছে যে! তুমি বসবে না? অমল জিজ্ঞাসা করিল।

—তোমরা খেয়ে নাও না; আমার জন্যে ভেব না। লতিকা সহাস্যে জবাব দিল।

—এও কি হয়! বয়, বয়, আর একটা ডিস্।

—না, না, ডিস্ আনবার দরকার নেই। বলিয়া লতিকা বয়কে ডিস্ আনিতে নিষেধ করিল।

নিরঞ্জন মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, ওঃ! এতটা জানতুম না।

লতিকার চোখে মুখে কে যেন আবীর ছড়াইয়া দিল; থতমত ভাবে বলিয়া ফেলিল, এক জায়গায় বসে খাইনি, উনি খান সকাল সাড়ে নটায়, এগাবটায় অফিস। আর আমার হাতের কাজ শেষ হতে, ঘর গোছাতে অনেক বেলা হয়ে যায়—এতক্ষণ তো ওঁকে বসিয়ে রাখতে পারি না।

নিরঞ্জন আবার হাসিল।

—রাতে অবশ্য দুজনে খেতে পারি; খাই না ইচ্ছে করে—আমিই হয়তো সব খেয়ে ফেলবো, আর উনি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন।

পবিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এ রেস্‌ট্রিকশন্‌ও আর থাকবে না। সকলে চমকিয়া উঠিল।

—কি রেস্‌ট্রিক্‌শন্ রে পবি? দুজনে এক জায়গায় বসে খাবার? বলিয়া নিরঞ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পবিত্র অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, অ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ড-লর্ডদের।

অমল আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সেও নিরঞ্জনের সহিত যোগ দিল।

ক্ষোভে ও দুঃখে লতিকা যেন কেমন হইয়া গেল; কহিল, একটা কথা ওঁর মাথায় ঢুকলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়; বসে বসে কি মাথামুণ্ড ভাবেন ঠিক নেই, একেবারে হুঁস থাকে না! মানুষ তো কুকুর বেড়ালও পোষে!

নিরঞ্জন গম্ভীর ভাবে বলিল, তা বটে।

লতিকা আর সহ্য করিতে পারিল না; বলিল, এসব লোকের—

—বলতে বলতে থেমে গেলে যে? নিরঞ্জন অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

রাগে গর গর করিতে করিতে লতিকা মনে মনে বলিল, এসব লোকদের স্ত্রীরা কেন মরে? এরাই আবার বিয়ে কবতে চায় না!

তারপর সে ধীর ভাবে কহিল, আমি আর কি বলবো বলুন? ছেলেবেলা থেকে তো ওঁকে দেখে এসেছেন।

—হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে? এরই ভেতরে তোমার খাওয়া হয়ে গেল? লতিকা সস্নেহে পবিত্রকে তাড়া দিল।

ধমক খাইয়া পবিত্র তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। লতিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—আর একটু আস্তে। বেশ, এবারে বল, কি বলতে চাচ্ছিলে। খাবে আর বলবে। ওদের এখনও শেষ হয়নি।

অমল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, অ্যাবসেন্‌টিদের সম্বন্ধে কি বলতে যাচ্ছিলে?

পবিত্র লতিকাব মুখের দিকে চাহিল। বাগেব ভান করিয়া লতিকা বলিল, খাবে আর বলবে, হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, বুঝলে?

পবিত্র ঘাড নাড়িয়া জানাইল, এ হুকুম সে অমান্য করিবে না। তারপর ধীরভাবে বলিল, অ্যাবসেন্‌টিদেব বেলায় এ কড়াকড়ি বেশী দিন কবতে হবে না।

কেন?

—সঙ্ঘ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, অ্যাবসেন্‌টি যেখানে থাকবে, সেখান থেকেই সব জিনিষ পাবে—বাইরে থেকে কোন জিনিষ নেবাব তার দরকার হবে না। জাঁকজমক করে থাকার দিন চলে যাবে; এতে করে তো কেউ আব দশ জনের ভেতরে এক জন হতে পারবে না?

লতিকা হাসিয়া বলিল, এই তো বেশ হচ্ছে—খাচ্ছ আর গল্প করছো। তাবপর সে সস্নেহে জিজ্ঞাসা কবিল, জাঁকজমক করে থাকা কেন আব চলবে না? আমি সব সময়ে ভাল ভাল কাপড় আর গয়না পবে বসে থাকবো।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, কিছুতেই তুমি পাববে না।

লতিকা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, নিশ্চয়ই পাববো, তুমি দেখে নিও।

নিরঞ্জন সহাস্যে বলিল, পারবে বইকি, খুব পারবে, পবির সাধ্যি আছে ঠেকিয়ে রাখে!

পবিত্র উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, কি করে পারবে? যে জিনিষ চাইলেই সবাই পাবে, তাব কি আর কদর থাকবে? না, কেউ জাঁক-জমক করে থাকতে পারে? সোসাইটির কাল্‌চার বেড়ে গেল, আমরা সবাই চাই, ডিস্‌টিঙ্কটিভ ড্রেস্‌, ডিস্‌টিঙ্কটিভ্‌ ফুড আর রেসিডেন্স। এক রকম জিনিষ কেউ আর তখন চায় না, ভাল লাগে না বলে। চারদিক থেকে সব জিনিষের উন্নতি হতে থাকে। চাইলেই সবাই পাবে

বলে মানুষ শুধু ততটুকু নেবে যতটুকু তার দরকার। সঞ্চয় করবে না, নষ্ট করবে না।

অমল বাধা দিয়া বলিল, সঞ্চয় না করলে মূলধন পাবে কোত্থেকে ?

চোখ বড় করিয়া পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সোভিয়েট রাশিয়া পাচ্ছে কোত্থেকে ? ক্যাপিটালিষ্ট সোসাইটিতে থেকে থেকে সবাই ভাবছে, সেভিং থেকে ক্যাপিটাল গড়ে ওঠে।

নিরঞ্জন অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নইলে মূলধন আর কাকে বলে ? সঞ্চয় করেই তো হয় ?

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, বাইরে থেকে ও রকমই মনে হয়, কিন্তু আসল ব্যাপারটা ও রকম নয়। মূলধন হচ্ছে ধন—ওয়েলথ। এর চীফ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে গিয়ে সেটা প্রি-এক্‌জিস্‌টিং, গোড়া থেকে ছিল ; যেটা কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা হয়েছে। যে কোন জিনিষই মূলধন হতে পাবে যদি সেটাকে কাজে লাগান যায় ; যদি সেটাকে ব্যক্তিগত সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার না করে কেবল ধন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সনাতন সত্যকে সবাই আজ ভুলে বসে আছে, আর সেই গোড়াকার ধনকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে এসেছে। আসল মূলধন কবে গেছে মরে, আর তার ভূত পৃথিবীর বুক আঁকড়ে ধরে সবাইকে শাসন আর শোষণ করছে।

নিরঞ্জন হাঁকিল, হেঁয়ালি রেখে সোজা করে বল।

—দশ বছর আগে ম্যান্‌চেষ্টারে যে কল ব্যবহার হয়েছিল, সেটা কি এখনও রয়েছে ? মরে ভূত হয়ে যায়নি ?

অপ্রতিভ ভাবে নিরঞ্জন জবাব দিল, হয়তো গেছে।

—হয়তো নয়, আলবৎ গেছে। কিন্তু তার ভূত এখনও রয়েছে, চিরকাল থাকতে চাইছে।

—ভূত ভূত করছো! ভূতটা কে?

—ভূত হচ্ছে, শেয়ারস্ক্রিপ্ট, ষ্টক্স্, ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড, অ্যাবসোলেসেন্স ফাণ্ড, রিজার্ভ ফাণ্ড। পৃথিবীতে আজ এই সব ভূতের রাজত্ব চলেছে।

অমল কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, পবিত্র বাধা দিয়া কহিল, শেয়ার আর ষ্টকের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম; গোড়াতে সেগুলোর টাকা দিয়ে কল কেনা হয়েছিল। সে সব কল কি আর দাঁড়িয়ে আছে, উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যায়নি? আর সব ভূতগুলো? সেগুলো তো সেই কল আর মজুরদের মিলনের ফল; কলওয়ালারাই কি এর একমাত্র মালিক? জমিয়ে জমিয়ে মূলধন গড়ে ওঠে, এটা একটা নিছক বাজে কথা হলেও সেটা ক্যাপিটালের প্রধান অঙ্গ নয়। গোড়াতে যা বলছিলাম, সেটাই হচ্ছে গিয়ে খাঁটি কথা—ক্যাপিটাল ইজ্ দ্যাট্ প্রি-একজিস্টিং ওয়েলথ হুইচ ইজ্ ইয়ুজ্ড ফর দি পারপাস্ অব প্রডাক্শন।

কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সব ইউনিয়ান বোর্ডের কথা বললে; যে সব জায়গায় কলকারখানা আছে, চাষ-আবাদের সুবিধে নেই, ধর এই আমাদের কলকাতা—এখানে কি করে সঙ্ঘ গড়ে উঠবে?

পবিত্র গম্ভীরভাবে জবাব দিল, এতে বিশেষ কোন অসুবিধে আমি দেখছি না। যেখানে ইউনিয়ান বোর্ড বা ভিলেজ কমিটি রয়েছে সেখানে যেমন সঙ্ঘ গড়ে উঠবে, যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে সেখানেও তেমনি গড়ে উঠবে।

—কিন্তু যেখানে কলকারখানা নেই, চাষ-আবাদেরও সুবিধে নেই—

—সেখানে যদি মাইন অথবা ফরেষ্ট থাকে সেখানেও সঙ্ঘ গড়ে উঠবে; আর যদি সেটা ডেজার্ট হয় লোক থাকবে না, চলে আসবে সেখান থেকে।

—তাতে করে কি ভাল হবে?

—কেন হবে না? কলকাতায় দশ বারো লাখ লোক, কলকারখানা বোম্বের চাইতে কম,—বেশীর ভাগ লোক এখানে চাকরী অথবা ব্যবসা করে। নতুন সমাজে এ রকম কেনা-বেচা উঠে যাবে, তারা সব বসে বসে কি করবে? তাদের নতুন নতুন কারখানা খুলতে হবে না? কারখানা যদি বসাতেই হয়, যেখানে সব চেয়ে সুবিধে সেখানেই বসাবে—কলকাতাতেই যে বসাতে হবে এব কোন মানে নেই, এখানে সুবিধে হলে এখানেই বসাবে।

লতিকা বিস্ময়ে অভিভূত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, দোকান থাকবে না? জিনিষ কিনব কোত্থেকে?

—দোকান থাকবে বই কি! বড় বড দোকান, খুব ভাল করে সাজান। সেখান থেকেই তো তুমি পছন্দ করে জিনিষ নেবে, দাম তোমায় দিতে হবে না। বলিয়া পবিত্র উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া উঠিল।

লতিকা মৃদুস্বরে বলিল, এবারে তোমরা উঠে চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর আঁধার করে ফেল গে; আমি চট্ করে খেয়ে নিচ্ছি।

অমল হাসিয়া বলিল, না, না, এও কি হয়? তুমি খেয়ে নাও, আমরা পবিত্রের গল্প শুনছি।

নিরঞ্জন হাঁকিল, গল্প! পবি কি গল্প করতে পাবে?

—গল্প বই কি! নিছক আষাঢ়ে গল্প শুনছিলুম। বলিয়া অমল মুখ টিপিয়া হাসিল।

নিরঞ্জন হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

লতিকা দুইজনের মাঝখানে পড়িল; তীব্র স্বরে বলিল, যাও, সবাই মুখ ধুয়ে এস গে। আমায় আর তিষ্ঠতে দেবে না দেখছি! একটু চোখের আড়াল হলে তোমরা সবাই লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসবে। এত গলায় গলায় ভাবই বা কেন, আর কুরুক্ষেত্রের লড়াই বা কেন? এঁটো মুখে আর বসে থেক না। আঁচিয়ে ভাল ছেলের মত সবাই আমার পাশে এসে বস। বাথরুমে গিয়ে হাতাহাতি করো না যেন। বলিতে বলিতে লতিকা হাসিয়া ফেলিল।

বাথরুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলে অবাক হইয়া দেখিল, লতিকার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

অমল তিরস্কারের স্বরে বলিল, তুমি বড্ড কম খাও, এত কম খেয়ে কাজ করবে কি করে? পবি, তুমি দেখ না কেন?

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, ওঁকেই কে দেখে তার ঠিক নেই। যাও ও ঘরে বস গে; বয় চুরুট আর দেশলাই রেখে এসেছে। সবাই চুপটি করে বসে থাকবে—জাষ্ট লাইক গুড বয়েজ্। আমি এই এলুম বলে।

লতিকা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১২

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া অমল বলিল, তোমার কথা শীগগির শেষ কর পবিত্র, রাত অনেক হয়েছে। বাড়ী ফিরতে হবে না?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, তোমায় কে আর ধবে রেখেছে বল? ইচ্ছে করলেই যেতে পার—আমার কথা শেষ হয়েছে।

তারপব জেরাব পালা।

অমল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, নতুন সমাজে মিডিয়াম অব এক্সচেঞ্জ কি হবে? ব্যাঙ্কগুলো থাকবে, না যাবে?

—ব্যাঙ্ক থাকবে বই কি! চেহারা বদলে যাবে। গোল্ড হবে মিডিয়াম অব এক্সচেঞ্জ। সোনা চিবকাল থাকবে, ক্ষয় হয় না। এর ওপরে সবাব নজর এখনও বয়েছে। গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফিবে এল বলে।

—বেশ। ব্যাঙ্কগুলোব চেহাবা কি বকম দেখতে হবে? এও একটা সজ্ঘ?

—না, একটু সবুব কব,—একটা কথা এখনও বলা হয়নি। সজ্ঘগুলোর ভেতরে সব সময়ে সেণ্ট্রিপিটাল ফোর্স জমে উঠবে; এগুলোকে বাইরে ছুটকে ফেলতে চাইবে। এতে তো সমাজ গডে উঠতে পারে না। ভেতরের দিকে টেনে ধরবার ফোর্স চাই।

—এ সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স কোথেকে পাবে তুমি? এর জন্যে চাই ডিক্‌টেটারশিপ।

—তোমাব এ কথা আমি মানি না। আমি বলবো; সব রুর‍্যাল সজ্ঘ থেকে হবে জেলা সজ্ঘ; জেলা সজ্ঘের রিপ্রেজেন্‌টেটিভ নিয়ে হবে প্রাদেশিক সজ্ঘ, এদের রিপ্রেজেন্‌টেটিভ নিয়ে হবে সেণ্ট্রাল সজ্ঘ; সে থেকে হবে ইন্‌টারন্যাশনাল সজ্ঘ। জেলা সজ্ঘ থেকে পর পর আর সবগুলোকে সজ্ঘ বললে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু কি করবো, একটা কিছু নাম এদের দিতেই হবে।

—কি করে ইলেক্‌শন্ হবে?

—ইলেক্‌শন্! মাপ কর ভাই; ও নাম তুমি আর করো না।

নিরঞ্জন অবাক হইল; ভাবিল পবিত্রের মাথা খারাপ হইয়াছে। সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, ইলেক্‌শন শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠলে যে?

—সত্যিই ভাই মাথা খারাপ হয়ে যায়! ইলেক্‌শন্, ইলেক্‌শন্ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

—এর সাব্‌ষ্টিটিউট তুমি কি দিচ্ছ?

—সাব্‌ষ্টিটিউট! কোন দরকার আছে কি? স্বাভাবিক ভাবে সব গড়ে উঠবে।

টেবিলে সজোরে করাঘাত করিয়া নিরঞ্জন গর্জ্জিয়া উঠিল, স্বাভাবিক! এটা একটা কথার কথা। কি করে হবে খুলে বল না;—এই করেই তো এত রাত করেছিস।

—আমাদের দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম; বিলেতের ভোটার, তারাই কি সব বোঝে? বুঝবে কি করে? হুজুগে পড়ে সবাই ভোট দিয়ে আসে।

নিরঞ্জন একেবারে হতাশ হইল, কোন কথা না বলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

পবিত্রের ঘাড়ে হাত রাখিয়া লতিকা সস্নেহে কহিল, এর বদলে তুমি কি কবতে চাচ্ছ, আমাদের বুঝিয়ে বলবে না? তোমার মনের কথা আমরা বুঝব কি করে?

পবিত্র উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল, কেন? গাঁয়ের কে মোড়ল, এ কি ভোট নিয়ে ঠিক হয়? আসল যে সঙ্ঘ—গাঁয়ের সঙ্ঘ যাকে আমরা বলছি—এখানে যারা কাজ করবে, নিজের গুণ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠাবান হয়ে উঠবে, তারাই হচ্ছে সেখানকার ন্যাচারাল লীডার; তাদের ভেতরে যে সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে বড়—যে আপনা থেকে

উঁচুতে উঠেছে—সে আসবে জেলা সঙ্ঘে; সেখান থেকে তেমনি আর একজন আসবে প্রভিন্‌সে, প্রভিন্‌স্‌ থেকে সেণ্ট্রালে—তার থেকে ইন্‌টারন্যাশনালে; ভোট কেন নেওয়া হবে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

নিরঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিল, ভোট না নিলে এসব ঠিক করবে কে?

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, তোমাদের গোড়াতেই বলেছি, সবাই কাজ করবে মনের আনন্দে;—সমাজে নিজ নিজ জায়গা বেছে নেবে। বেছে নিলেই হয় না, সেটাকে রাখবার মত শক্তি, বুদ্ধি, বড় মন, এসব না থাকলে ওপরে উঠবে কি করে? তাকে টেনে নীচে নামিয়ে দেবে না সবাই? ঝগড়া মারামারি করে নয়, আপনা আপনি সে কেটে পড়বে। ভোটের ব্যাপার থাকলে সে চুপটি করে বসে থাকবে ওঁৎ পেতে—নেকৃষ্ট ইলেক্‌শন্‌ অবধি। ভোটের দুদিন আগে থেকে হৈচৈ সুরু করে দেবে; সবার চোখে ধূলো দিয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসবে। কিন্তু যাকে রোজকার রোজ কাজ দেখিয়ে বড় হতে হয়, তার তো চোখে ধুলো দেখার জো নেই। দেখছো না আমাদের ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড আর মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা? যারা ধড়িবাজ তারাই এতে ঢুকতে পারে—কাজের লোকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তা ছাড়া, সঙ্ঘগুলো তো কোন আইন্‌ পাস করবে না যে ভোট দিয়ে লোক পাঠাতে হবে।

অমল হতভম্বের মত বলিয়া উঠিল, আইন পাস করবে না?

—না, আইনের যে আর দরকার হবে না। চুরি-ডাকাতি থাকবে না; কেন আর চুরি করবে? চাইলেই যখন পাচ্ছে।

নিরঞ্জন কি যেন বলিতেছিল; পবিত্র তাহাকে সে সুযোগ দিল না, হাত নাড়িয়া বলিল, খুন, জখম, মারামারি—এর বেশীর ভাগ সম্পত্তি

নিয়েই হয়। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা ; সম্পত্তি নেই, তা নিয়ে আবার লড়াই !

নিবঞ্জন মুহূর্ত্তেব জন্য লতিকার দিকে চাহিল ; মৃদুস্বরে বলিল, কিন্তু—

পবিত্র বাধা দিয়া কহিল, সে কথাও কি আর ভাবিনি ? মেয়ে-চুরির কথা বলছো ? এ নিয়ে খুন জখমও হতে পারে ; অসম্ভব নয়। আইন দিয়ে কি এ বন্ধ করা যায় ? দেখছো না বাঙলায় মেয়ে-চুরির বহর ? সাজা কি এদের কম হচ্ছে ? মেয়েদিগের আব একটু ষ্ট্রং কব , আর জোর পাবলিক এজিটেশন্ কর, দেখবে দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্ঘের মেয়েবা খেয়ে দেয়ে হবে ষ্ট্রং—এগোয় কার সাধ্য তাদের সামনে। ইলোপমেণ্ট হলে তো সুখেব কথা। সব চেয়ে বড কথা হচ্ছে, এ সব ব্যাপাব একদিনে হয় না—অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয , দল বেঁধে যে দু একটা হয়, তাও আগে থেকে টের পাওয়া যায়। আমাদেব মেয়েদেব বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এসব আব থাকবে না, যেমনি টেব পাবে, অমনি জোব গলায় বলবে তাবা, কে তাদেব পেছনে লেগেছে—কাব ইন্‌টেন্‌শন্ তারা পছন্দ করছে না। চারদিক থেকে এমন হৈচৈ সবাই করে উঠবে, বাছাধন পালাতে আব পথ পাবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া লতিকার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

অমল গম্ভীর ভাবে বলিল, আইন না করলে সবাই সঙ্ঘের হুকুম মানবে কেন ? কি করে কাজ হবে ?

—এতে মুস্কিল তো আমি কিছু দেখছি না। সবাই সব কথার আলোচনা কববে—যার ইচ্ছে নেই বা শক্তি নেই সে করবে না কাজ। একটার বেশী মত হবে ; যে মতে লোক বেশী হবে তারাই করবে

কাজ—মাইনরিটির ওপরে জোর জুলুম চলবে না। বিহাইণ্ড দি ব্যালট, দেয়ারস্ দি বুলেট একথা নিশ্চয়ই মান? তাহলে আমার কথাতে খুঁৎ ধরছো কেন?

তাহার কথা শেষ না হইতে অমল বলিয়া উঠিল, এমন লোক সব সময় থাকবে, যারা মত দেবার বেলায় মত দেবে কাজের বেলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

—থাকবে বই কি। গোড়াতে খুব বেশী করে থাকবে, পরে কমে আসবে।

—কমে আসবে কেন?

—কংগ্রেসকে দেখেই টের পাচ্ছ; আগে কত লোক এসে মোড়লী করত, এখন কি আর তাদের টিকি দেখতে পাওয়া যায়? এ হতেই হবে যে; মুখে আর কত দিন মোড়লী করবে? নিজেরও লজ্জা করে, সমাজও সহ্য করতে পারে না। একদিন না একদিন কেটে পড়তেই হবে।

নিরঞ্জন বাধা দিল; বলিল, কংগ্রেসে যে জেলের ভয় রয়েছে?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, জেলের ঝক্কিও তো বড় কম নয়? ঝক্কি ঘাড়ে নেব না মুখে মুখে মোড়লী করবো, মানুষ বেশী দিন এ সহ্য করতে পারে না। না হয় তোমাদের কথা মেনেই নিলুম। মেশীন তো রয়েছে; একে চালাবার মত দুদশটা লোক সব সময় পাওয়া যাবে।

আর একটা চুরুট ধরাইয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্ঘ কি ইকনমিকালি সেল্ফ সাফিসিয়েণ্ট?

পবিত্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি। এটা কি সেল্ফ সাফিসিয়েনসির যুগ? একটা গোটা দেশ যা করতে পারে না, ছোট একটা সঙ্ঘ কি করে তা করবে?

তারপর সে ধীরভাবে কহিল, ব্যাপার অনেকটা এ রকম—রামপুর রসুলপুর আর বিষ্টুপুর—এ তিনটে হচ্ছে সঙ্ঘ। রামপুর সঙ্ঘে পাট চাষ হয়, রসুলপুর সঙ্ঘে চটকল, আর চাল হয় বিষ্টুপুরে। রামপুর বেচছে পাট রসুলপুরকে; আবার বসুলপুর বিক্রী করবে গানিব্যাগ বিষ্টুপুরকে, সেখান থেকে বস্তাবন্দী হয়ে আসবে চাল রামপুরে। মানুষ মানুষকে কোন জিনিষ বিক্রী করবে না; কারবাব চলবে সঙ্ঘে সঙ্ঘে।

নিরঞ্জন অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে টাকা লাগবে না?

—সে কথাই এখন বলছি। পাট যে সময় জন্মায় সে সময় ধান হয় না; তেমনি তুলার গাছের শীষ যখন গজিয়ে উঠবে, সে সময় হয় তো খাবার গম নেই, তারা সবাই কি খাবে?

—এতে কি হলো?

—সব জিনিষ এক সময় হয় না, সব জিনিষ সব সময় তৈরী হয় না বলে চাই ব্যাঙ্ক।

—ব্যাঙ্ক? ব্যাঙ্ক কেন?

—নইলে পাটের সঙ্ঘের লোকরা এতদিন বাঁচবে কি করে? পাট হতে, ভিজতে, বেচতে পাঁচ ছ মাস কেটে যাবে, এর ভেতরে তাদের চাল কিনে খেতে হবে না?

—হবে বই কি।

—কি দিয়ে কিনবে তাবা?

—টাকা দিয়ে।

—টাকা কোত্থেকে পাবে?

নিরঞ্জন নিরুত্তর।

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, টাকা পাবে ব্যাঙ্ক থেকে। সব সঙ্ঘের ব্যাঙ্কে হিসাব থাকবে,—ব্যাঙ্ক আবার বেশী থাকলে চলবে না। মাঘ

মাসে রামপুর ধান কিনতে চাচ্ছে, পাট কিন্তু তখনও ভাল গজায়নি, সবে বীজ ফেলেছে। বিষ্টুপুর অবশ্য চাল দিতে চাইছে;—কিন্তু কিনবে কি দিয়ে? রামপুর ব্যাঙ্ককে গিয়ে জানালে সব কথা;—অমনি অ্যাকাউণ্ট ট্রান্সফার হল—বিষ্টুপুর থেকে চাল চলে গেল রামপুরে। টাকা কেউ চোখে দেখতে পেলে না। দুদিন বাদে সবাই টাকার কথা ভুলে গেল।

নিরঞ্জন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, টাকা না হয় নাই দেখলে; গয়নাও কি পরতে পাবে না?

—কেন পরবে না? নিশ্চয়ই পরবে। নিজের সঙ্ঘের কাছে চাইলেই পাবে। ভারি গয়না এখনই উঠে গেছে; দুদিন পরে আরও যাবে। এর পর হয়তো মেয়েরা গয়নাই পরতে চাইবে না—ইট্ বিইং দি সিম্বল্ অব বারবারিজম।

—সঙ্ঘ কোত্থেকে সোনা পাবে?

—কেন? ব্যাঙ্ক থেকে। আচ্ছা আর একটু খুলে বলছি। গোলকুণ্ডার সঙ্ঘ সোনা নিয়ে হাজির হবে ব্যাঙ্কের কাছে; ব্যাঙ্ক সেটা জমা করে নেবে গোলকুণ্ডার হিসেবে, কয়েকদিন পর গোলকুণ্ডা এসে বলবে, ময়দা কিনেছি;—ব্যাঙ্ক গোলকুণ্ডার হিসেবে লিখবে খরচ, ময়দার সঙ্ঘের হিসেবে লিখবে জমা। এমনি করে সঙ্ঘে সঙ্ঘে কেনা বেচা চলবে। রসুলপুর যদি তার লোকদের জন্যে কিনতে চায় সোনা, তাকে যেতে হবে হয় গোলকুণ্ডার কাছে, নয়, ব্যাঙ্কের কাছে;—আবার বুক্ ট্রান্স্ফার। এমনি বুক ট্রান্স্ফার আজও হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের দরুন।

অমল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক তো করছো; এটা কি ষ্টেট ব্যাঙ্ক?

পবিত্র সোৎসাহে বলিল, অত শত বুঝি না আমি। যেটা আমার দেশসঙ্ঘ সেটা আমাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, যেটা পৃথিবীসঙ্ঘ, সেটা হচ্ছে ওয়ার্লড্‌স্‌ ব্যাঙ্ক। তেমনি প্রভিন্‌শিয়াল আব জেলা ব্যাঙ্ক। একটার উপরে আর একটা, এতে কত স্থবিধা হবে।

নিবঞ্জন অবাক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, আর কি স্থবিধা হবে এতে? পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, পৃথিবীতে এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে কিছুই এক রকম হয় না, হয়তো লোক থাকে না বলে। একটু স্থবিধে পেলে, সে সব জায়গায় ভাল ভাল জিনিষ তৈরী হতে পারে, কত পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, খোলা মাঠ, হাজা জমি, মাইন—

—সেগুলির কি হবে?

—সে কথাই এখন বলছি। কতগুলো লোক সব সময় সব দেশে জন্মাবে, যাবা নতুন কিছু একটা কবতে চাইবে, একঘেয়ে কাজ, একঘেয়ে বসে থাকতে তাদেব কক্ষনো ভাল লাগে না। তাবা এক জোট হয়ে ব্যাঙ্ককে ধববে, বলবে, আমবা নতুন কিছু একটা কবতে চাচ্ছি, তুমি আমাদেব হেল্‌প কববে কি? ব্যাঙ্ক হেসে জিজ্ঞেস কবে, তোমরা কোন্‌ সঙ্ঘ? তাবা একটু থমকে দাঁড়ায়, ভাবে, তাইতো কোনও নাম তো এখন ঠিক কবা হয়নি। ফস্‌ কবে বলে ফেলে, আমরা হচ্ছি জীবনপুব সঙ্ঘ।

লতিকা মাথা ঝাঁকিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, তাবপর কি হলো?

—ব্যাঙ্ক হেসে বলে, বাঃ, খাসা নাম তোমাদেব, কি করতে হবে আমাকে? জীবনপুব এক নিশ্বাসে অনেক কিছু বলে ফেলে—কল চাই, খাবাব চাই, পববাব পোষাক চাই, মাথা বাখবাব ঘব চাই—আরও কত কথা, বলে শেষ করা যায় না।

লতিকা বিস্ময়ে অভিভূত হইল; বলিয়া উঠিল, এত সব জিনিষ! এ দিয়ে তারা কি করবে?

পবিত্র সস্নেহে কহিল, চাই বই কি! নইলে চলবে কেন? কল না হলে কাজ হবে কি করে? এদ্দিন কি তারা না খেয়ে থাকবে? কাপড় পরবে না? রাতের বেলায় ঘুমোতে হবে না?

লতিকা অপ্রতিভ হইল; জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাঙ্ক কি বললে?

—ব্যাঙ্ক হেসে বলে, বেশ তো; আমার কাছে এসেছ কেন? যেখান থেকে যা পাওয়া যায় নিয়ে নাওগে। জীবনপুর ভাবে, ব্যাঙ্ক হয়তো ঠাট্টা করছে; থতমত খেয়ে বলে, শুধু হাতে আমাদের দেবে কেন? চোখ বড় বড় করে ব্যাঙ্ক বলে, শুধু হাতে! শুধু হাতে কে বললে? তোমাদের শক্তি রয়েছে, সাহস রয়েছে, উৎসাহ আছে;—এই কি যথেষ্ট নয়? আমার নাম করে বের হয়ে পড়গে, আর দাঁড়িয়ে থেক না।

রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্ঘরা কি বললে?

—কোন কথা বললে না; জীবনপুর যা চাইলে সব দিয়ে দিলে। তার পর ব্যাঙ্ককে জানালে। জীবনপুর লিখলে, সব জিনিষ তারা পেয়েছে। ব্যাঙ্ক একটা নিউ অ্যাকাউণ্ট ওপ্‌ন্ করলে জীবনপুরের নামে; ডেবিটের ঘরে সব জমা করে নিলে, আর আর সঙ্ঘের হিসেবে লিখলে ক্রেডিট। বছরের শেষে সবার হিসেব কাটাকাটি করে ব্যাঙ্ক দেখলে, কারও কাছে কারও পাওনা নেই, প্রত্যেকের হিসেব অ্যাড্‌জাষ্ট হয়ে গেছে। এমনি করে পৃথিবীর ধন বৃদ্ধি হতে থাকবে।

অমল মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, খুব তো বলে যাচ্ছো। জীবনপুর ফেল মারলে—

—ফেল মারলেও কোন লোকসান নেই।

—লোকসান নেই? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি।

পবিত্র অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, ফেল মারবার কথা আসছে কোত্থেকে? লাভ লোকসানের কথা এতে নেই। জীবনপুর সঙ্ঘ গড়ে না উঠলেও এদের খেতে পরতে দিতে হত না? যাদের ওখানে গিয়ে উঠত সঙ্ঘকে সব কিছুই তাদের দিতে হত যে! নতুন একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠলে পুরোনো সঙ্ঘদের ঝক্কি কমে যাবে না? তারা বরং এতে খুশীই হবে। তার ওপরে ব্যাঙ্ক তো আর এমনি এমনি কথা দেবে না। সব মাথাওয়ালা লোক রয়েছে সেখানে, কাজ করে করে একেবারে ঘুঘু হয়ে বসে আছে। আর যদি ফেলই হয়, তাতেই বা কি; এদের জন্য পৃথিবীর সব সঙ্ঘ রেস্‌পন্‌সিবল রয়েছে যে!

অমল আর একটা চুরুট ধরাইল। আধ পোড়া সিগারটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নিরঞ্জন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ঘুমে লতিকার চোখ জড়াইয়া আসিয়াছে, সে দুই তিন বার হাই তুলিল। এমনি ভাবে মিনিট দশেক কাটিল।

হাই তুলিয়া পবিত্র বলিল, আর কেন? ঢের রাত হয়েছে,—তোমাদের ঘুম পায়নি এখনো?

নিরঞ্জন ও লতিকা তাহার কথা সায় দিল। অমল তখনও নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। চোখ মুখের চেহারায় আক্রোশের ভাব সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চুরুটের ধোঁয়ার খেলা দেখিতে দেখিতে অমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বেশ, সে নয় হলো,—রেল, ষ্টীমার, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, এ সবগুলো তো একটা সঙ্ঘের ব্যাপার নয়, এদের কি করবে?

পবিত্র সহাস্যে বলিল, আজ তুমি আমায় ছাড়বে না দেখছি! ওপরকার সঙ্ঘ এ নিয়ে আলোচনা করবে, নীচেকার সঙ্ঘের মত

চাইবে। যে সঙ্ঘের ভেতর দিয়ে লাইন যাবে, যেখানে ডাকঘর বসবে সে সব জায়গার লোকদের মত নিয়ে সব ঠিক করবে।

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, এ তো এখনও হচ্ছে।

—তখনও হবে। যারা এতে মত দেবে তারা কাজে লেগে যাবে, যাদের মত নেই তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

অমল জোরে টেবিলে করাঘাত করিল; গর্জ্জিয়া উঠিল, যত সব বাজে কথা! এ তোমায় কে জিজ্ঞেস করছে? ক্যাপিটাল কোত্থেকে পাবে?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, ক্যাপিটাল? ভ্যাট প্রি-এক্‌জিস্টিং ওয়েল্‌থ? এ তো রয়েইছে। যে সঙ্ঘের ভেতরে এঞ্জিনের কারখানা রয়েছে সেখান থেকে নেবে এঞ্জিন, যেখানে রেল তৈরী হচ্ছে, সেখান থেকে নেবে রেল; যেখানে যেটা পাওয়া যায় সেখান থেকে সব নেবে। দিজ আর অল প্রি-একজিস্‌টিং ওয়েল্‌থস্‌। তার পর আবার সেই আগেকার মত বুক ট্রান্সফার।

মাথা নাড়িয়া অমল কহিল, গোড়াতে একটা কি দুটো সঙ্ঘ ইণ্টারেস্‌টেড ছিল, এখন যে হবে অনেকগুলো?

—অনেকগুলো হলে অনেকবার বুক ট্রান্সফার হবে।

অমল হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিল, গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বলিল, শুধু এটুকুই নয়। সব সঙ্ঘ মিলে মিশে কাজ করছে বলে, কোন লোককে আর ভাড়া দিতে হবে না, তারা এমনি ট্রেনে চেপে যেখানে খুশী যেতে পারবে। জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াবে, এরোপ্লেনে আকাশে উড়বে।

লতিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ভারি মজা হবে দেখছি! তার পর সে হঠাৎ চুপ করিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, না বড্ড মুস্কিল হবে।

চোখ বড় করিয়া পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, মুস্কিল হবে কেন ?

—সবাই গাড়ীতে চেপে বসলে মুস্কিল হবে না ?

পবিত্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লতিকাও অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, হাসছ যে বড্ড ?

—হাসব না ? এখন তো ফি রবিবারে ট্রামে অল ডে ফেয়ার রয়েছে। কটা লোক সকাল সন্ধ্যে টেঙস্ টেঙস্ করে ঘুরে বেড়ায় ? সব ডিজায়ারের একটা ন্যাচারাল লিমিট রয়েছে, যেটা স্যাটিস্‌ফায়েড হতে বেশী দেরী হয় না। হাঁ, একথা ঠিক, এখনকার চাইতে ট্রেন বেশী করতে হবে, মালগাড়ীও ঢের বাড়বে, তাতেও ক্রেট লাগবে না। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, দূরের লোককে কাছে টেনে এনে পৃথিবীর সব মানুষকে এক করে ফেলবে।

নিরঞ্জন সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ষ্টেশন ষ্টাফকে না হয় ছেড়েই দিলুম ; কিন্তু যারা ট্রেনে করে ঘুরে বেড়াবে, গার্ড, ড্রাইভার—এরাও কি মাইনে পাবে না ?

—এরা কেন মাইনে চাইবে ? যেখানে গাড়ী দাঁড়াবে, সেখানে খাবে, থাকবে, যে জিনিষ দরকার হবে নেবে ; আর যেখানে তাদের বাড়ী, ফ্যামিলি রয়েছে, সেখানে বসেই তো সব পাবে।

লতিকা বাধা দিয়া বলিল, চাইলেই পাবে, তুমি বার বার বলছ, কার কাছে চাইবে ? জিনিষ পছন্দ করে নিতে হবে না আমাকে ?

—তোমায় আর বলতে হবে না, আমিই সব বলছি। সঙ্ঘের ভেতরে থাকবে বড় বড় দোকান, এক একটা মিউজিয়মের মত। তার ম্যানেজার থাকবে, সেলস্‌ম্যান থাকবে। তাদের গিয়ে বলবে,

জিনিষ দেখতে চাইবে, তারা সবাই দেখাবে তোমায়—পছন্দ হলে নিয়ে আসবে, দাম দিতে হবে না।

—আমি যেটা চাই সেটা সেখানে না থাকলে ?

—অর্ডার দিয়ে আসবে, এখন যেমন দিচ্ছ ; তারা তোমায় আনিয়ে দেবে অন্য জায়গা থেকে। নইলে তৈরী করে দেবে।

—এতেও যদি না পাওয়া যায় ?

—পাবে না সেটা। পাওয়া না গেলে দেবে কোত্থেকে ? লাখ টাকার মালিকও আজ সব জিনিষ পায় না। এরও একটা ন্যাচারল লিমিটেশন রয়েছে। হয়তো একটা জিনিষ রয়েছে, আর পাওয়া যাচ্ছে না। যে সব্বার আগে চেয়েছে সে পাবে ; সে যদি না নেয় আর এক জনকে দেবে। এতে মন খারাপ করবার কিছু নেই। তুমি বরং নতুন ডিজাইন দিয়ে আসবে। সেটা তোমায় তারা দিতে চেষ্টা করবে, পেলে ভালই, নইলে তোমায় ওয়েট করতে হবে বই কি ! বলিয়া পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল।

অমলের আর সহ্য হইল না, তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, বড্ড যে জোর গলা করে বলা হচ্ছিল, কমিউনিজম্ কাষ্ট সিস্টেম এনে ফেলবে, কেন, নতুন সমাজে সে ভয় নেই ?

লতিকা মর্ম্মাহত হইল, কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, অমলদা, তুমি ও ভাবে কথা বলছ কেন ?

অমল তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিল, মুখ কালো করিয়া কহিল, কেন, কি হয়েছে ? বলেছি বেশ করেছি। সব ডক্‌ট্রিনেই কিছু ভুলচুক থাকবেই থাকবে। ও মনে করছে, বসে বসে বেদ আওড়াচ্ছে। কেন, ভুল এতে নেই ?

পবিত্র সহজ ভাবে জবাব দিল, কোন ভুল নেই, আমি বলিনি।

কতকগুলো কথা আমরা মেনে নিয়েছি, ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিঙ্কশন্‌, প্রোগ্রেসিভ স্পিরিট ; এমন দিনও আসতে পারে, যখন আভিজাত্যবোধ লোপ পাবে—মেটিরিয়াল প্রস্‌পারিটি আর ভাল লাগবে না।

—কথাটাকে এ ভাবে চাপা দিলে চলবে ? অমল গর্জ্জিয়া উঠিল।

পবিত্র হতভম্বের মত অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মৃদুস্বরে বলিল, কোন কথা চাপা দিতে আমি চাইনি, আমি শুধু বলেছি, কমিউনিজম্‌ থেকে নতুন করে একটা কাষ্ট সিস্‌টেম্‌ আসতে পারে। এ রকম কোন ভয় সঙ্ঘবাদে নেই।

অমল তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, নেই কেন ? প্রত্যেকটা সঙ্ঘের ভেতরে ডিস্‌টিঙ্কটিভ সেল্‌ফ ইন্‌টারেস্‌ট ডেভালপ করবে না ?

পবিত্র সহাস্যে জবাব দিল, করবে বই কি। আমি তো তাই চাচ্ছি, নইলে কাজ হবে কেন ? তা বলে সঙ্ঘ কোন দিন কাষ্ট হতে পারে না।

—আলবৎ হবে, কমিউনিজম থেকে কাষ্ট হলে, সঙ্ঘ থেকেও হবে। বলিয়া অমল সজোরে টেবিলের উপর করাঘাত করিল।

পবিত্র দুই তিন মিনিট ভাবিল ; বলিল, তুমি হয়তো আমায় ভুল বুঝেছ অমল। কমিউনিজম্‌, ফ্যাসিজম্‌, দুটোর ভেতরেই নিউ কাষ্ট সিষ্টেমের সীড জারমিনেট করছে। কমিউনিজম্‌ আজ ক্যাপিটালিস্‌ট আর প্রোলেটারিয়াটদের ভেতরকার ক্লাস ডিস্‌টিঙ্কশন্‌ ডেস্‌ট্রয় করে তাদের ক্লাসলেস করতে চাচ্ছে, আন্‌ডার দি ডিকটেটরশিপ অব দি প্রোলেটারিয়াট ; কিন্তু এও কি তোমরা ভেবে দেখেছ, এক দিন আসবে—যে দিন এ ক্লাস ডিস্‌টিঙ্কশন্‌ না থাকলেও নতুন করে আবার সাব ক্লাসের সৃষ্টি হবে, শুধু স্বার্থ নিয়ে ?

লতিকা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এ থেকে কি আবার নতুন করে ক্লাস ওয়ার সুরু হবে ?

—হবে বই কি। এক একটা কারখানায় অনেকগুলো করে লোক কাজ করে—ডিভিশন অব লেবার নেই। কোন কাজ শক্ত, কোন কাজ সোজা, কোন কাজ করতে মাথার দরকার হয়, আবার কোনটা শুধু হাত পা নেড়ে কল চালালেই চলে। এতে মাইনের কম বেশী হবে না? কমিউনিজমে যে ওয়েজ সিস্‌টেম রয়ে গেল। কেউ হয় তো খুব চতুর, হাত পাকিয়ে ফেলেছে, সে সবাইকে টপকে ওপরে উঠতে থাকবে। যারা পারবে না, তারা সবাই তো নীচে পড়ে থাকবে। কাজের ওপরে মাইনে, লোকের ওপরে নয়। নীচে পড়ে থাকলেও তারা ভাববে, এতে তাদের চলে না—ডিস্‌স্যাটিস্‌ফ্যাকশন্ বেড়ে যাবে। ক্যাপিটালিস্‌ট না থাকলে কি হবে? নতুন করে সেক্‌শনাল ওয়ার বাধবে না?

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, এসব কথা বোঝা গেল। কিন্তু আরমি, নেভি? এসব থাকবে, না তুলে দেবে?

পবিত্র ম্লান হাসিয়া বলিল, তোমরা আজ আমায় ছাড়বে না দেখছি, চারদিক থেকে জেরা স্রুরু করে দিয়েছ।

—ট্রান্‌জিশন পিরিয়ড,—আজকের সমাজ থেকে নতুন সমাজে যেতে আরমি, নেভি চাই বই কি? ল এণ্ড অর্ডার—পীস্ মেন্‌টেন করতে হবে না? তারপর আর দরকার হবে না।

—কেন?

—স্বার্থ নিয়েই তো লড়াই বাধে। এতবড় যে লড়াইটা হয়ে গেল, কেন? ক্যাপিটালিস্‌ট ইম্‌পিরিয়ালিজমের জন্যে নয় কি? ক্যাপিটালিজম থাকবে না; ইম্‌পিরিয়ালিজমের কথা কেউ ভাবে না, তবুও লড়াই হবে?

—ফ্রন্‌টিয়ার ট্রাইবরা তো রয়েছে; তারা প্লেনে এসে হানা দেবেই।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, তারা শান্ত শিষ্ট হয়ে, চুপটি করে বসে থাকবে।

লতিকা মাথা ঝাঁকিয়া কহিল, না গো না, এত ভাল তারা কোনদিন হবে না।

—মহা মুস্কিলে ফেললে দেখছি। এতক্ষণ বেশ ছিলুম। এবাবে পিয়োর ইকনমিকস্—থিওবি অব ভ্যালু এণ্ড প্রাইস্। এসব তোমাদের কি কবে বোঝাব?

লতিকা একেবাবে বাঁকাইয়া বসিল, মুখ ভার কবিয়া বলিল, তুমি সব সময় আমায় এভাবে বল, আমার বুঝি একটুও বুদ্ধি নেই?

—বুদ্ধি নেই কে বললে? অনেক নতুন কথা বলতে হবে যে।

লতিকা গুম্ হইয়া বসিয়া বহিল, তাহাকে আব বিবক্ত করিল না।

কয়েক মিনিট পবে পবিত্র আরম্ভ কবিল, টাকা দিয়ে জিনিষ কিনি, দর ঠিক কবি। টাকা আব জিনিষ ছড়ান বয়েছে, ছড়ান টাকা কমে গিয়ে জিনিষ একইভাবে থাকলে দব শস্তা হয়, আবার টাকা বেশী, জিনিষ কম হলে দর বাড়ে। এবাব চাল আর কাপড়েব কথা, চালের দর কম, কাপড়েব দর বেশী, কেন? টাকা কিন্তু একই ভাবে ছড়ান রয়েছে। একটা জিনিষের দর বেশী আর একটার কম, এ শুধু টাকাব জন্য নয়।

লতিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তোমাব কথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। এবাব বল, এতে কি হলো।

—একটা জিনিষের দব বেশী, আর একটার কম, এর কারণ অনেক। কোনটায় ক্যাপিটাল বেশী, কোনটায় কম, ক্যাপিটালেব সুদ হয়তো একটায় কম আব একটায় বেশী, জমিব খাজনা এক নয়, ডিমাণ্ড আর সাপ্লাই দুটোতে তফাৎ থাকে, বেচবাব সময় দুটো আলাদা, ওয়েটিং

পিরিয়ড্ এক নয়; মজুর আর কর্ম্মচারীদের মাইনে কক্ষনো এক হতে পারে না—কাজ বুঝে মাইনে, ওভার হেড চার্জ্জেস, ডিপ্রিসিয়েশন্, অ্যাবশোলেসেনস্, প্রফিট, ট্যাক্স, ট্যারিফ—নানারকম ট্রেড রেস্‌ট্রিকশনের জন্য দুটো জিনিষের দরের তফাৎ হয়।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এতে কি হয়েছে? ট্রাইবাল পিপ্‌ল্‌দের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক রয়েছে? তুই খেই হারিয়ে আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিস্।

পবিত্র সে কথায় কান দিল না; বলিল, নতুন সমাজে এর অনেক কিছুই অকেজো হয়ে যাবে। ব্যাঙ্ক দেবে ক্যাপিটাল সঙ্ঘকে; এর সুদ লাগবে না। জমির খাজনা নেই; ডিমাণ্ড আর সাপ্লাই সব সময়ে থাকবে এক রকম—মানে অলোয়েজ এ্যাড্‌জাসটেড,—অ্যান্ এভার ইনক্রিজিং ডিমাণ্ড এণ্ড এভার ইন্‌ক্রিজিং সাপ্লাই। প্রাইস আর ভ্যালু সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, একটা জিনিষ তৈরী করতে হলে মানুষকে কতটা খাটতে হয়, কতক্ষণ খাটতে হয়, আর কি রকমের খাটুনি সেটা? মানুষের পাঁচটা আঙুল সমান নয়; খাটুনিও তেমনি—প্রত্যেকটা জিনিষের বেলায় আলাদা,—সময় আলাদা, ধরন আলাদা, জোর আলাদা। এতে খাটুনির প্রাইস আর ভ্যালু আলাদা, জিনিষের দরও আলাদা হয়ে পড়ে। এছাড়া অবশ্য সাপ্লাই আর ডিমাণ্ডের কথা রয়েছে;—মাল তৈরী হয়েছে, কেনবার লোক নেই, কেনবার লোক রয়েছে মাল তৈরী হয়নি।

লতিকা সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, এসব তো সত্যি কথা; বুঝবো না কেন?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, এবারে একটা মজার কথা বলবো, খুব ভাল করে মন দিয়ে শোন—খেই হারিয়ে ফেল না।

লতিকা সহাস্যে জবাব দিল, তুমি বুঝিয়ে বলতে পারলে আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো ; তুমি দেখে নিও।

—আচ্ছা বেশ, মনে কর দু দল লোক টাগ অব ওয়ার করছে। দড়িটার দুটো দিকের কোন একটা লোকের গায়ের জোর আর এক দলের কোন লোকের সমান নয়। অথচ দু দলই খুব জোরে দড়িটাকে টানতে লাগলো ; কেউ কাউকে হঠাতে পারলে না। এটা কি একটা অসম্ভব কথা ?

আবেগেব সহিত লতিকা বলিয়া উঠিল, অসম্ভব কেন হবে ?

পবিত্র গম্ভীরভাবে বলিল, দুটো সঙ্ঘ রয়েছে ; একটা হচ্ছে কাপড় আর একটাতে ধান। কাপড়ের কলে কাজ করছে দুশো লোক আর জমি চাষ করছে দু হাজার। কিন্তু এটা কি একেবারে অসম্ভব কথা—দু দলের অ্যাভারেজ লেবার কখনো এক হতে পারে না ? এই অ্যাভারেজ লেবার দিয়ে আমাদের নতুন সমাজে প্রাইস আর ভ্যালু ঠিক হবে।

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলিল, এটা একটা এক্‌সেপ্‌শনাল কেস।

—যেটাকে তুমি বলছো এক্‌সেপ্‌শনাল, নতুন সমাজে সেটা হবে ইউনিভারসাল।

নিরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে অবিশ্বাসের হাসি। লতিকারও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি করে হবে ?

—কেন হবে না ? গোড়াতেই আমি বলেছি, সব রেস্‌ট্রিকশন অকেজো হয়ে যাবে।

—এ তো আমরা মেনেই নিয়েছি।

—ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল লেবার আর ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিসট্‌—যা ন্যাচারাল—খুব অ্যাকটিভ ; এদের সঙ্গে চাষীদের তুলনা হতে পারে না। নতুন সমাজের গোড়াতে ইনডাষ্ট্রিয়াল কান্‌ট্রিরা ওয়েল-টু-ডু থাকবে বইকি ; সে সব দেশে

লোক গিয়ে জুটবে—গাড়ীভাড়া লাগবে না—সবাই খেতে পরতে পাবে। ইনডাষ্ট্রিয়ালিস্টরা দেখবে ঠিক তেমনটি আর নেই; তারাও আবার এসে জুটবে সে সব দেশে যারা লেস্ সিভিলাইজড, লেস্ ইনডাষ্ট্রিয়া-লাইজড্। সেখানে গিয়ে তাদের অবস্থা একটু ভাল হলে তারা দেখবে—নেটিভদের চোখ ফুটে গেছে—এরাও আবার সব জিনিষ চাইছে। সেখান থেকে আবাব এক দল বেরিয়ে পড়ে নতুন জায়গায় আস্তানা নেবে। এমনি করে সব সঙ্ঘের অ্যাভারেজ লেবার ভ্যালু এক হয়ে পড়বে, ডিমাণ্ড আর সাপ্লাই হবে ইকোয়াল। আর তাতে প্রত্যেক জিনিষের দাম হয়ে উঠবে প্রোপরশনেটলি ইকোয়াল।

লতিকা অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা কবিল, প্রোপরশনেটলি ইকোয়াল মানে?

—জুটের দর আর গানিব্যাগেব দর কক্ষনো এক হতে পারে না। কিন্তু পাটের সঙ্ঘ আর চটকলেব সঙ্ঘ তাদেব লোক সংখ্যার অনুপাতে হবে ইকোয়ালি বিচ। বিলেত ধনী আর বাঙলার লোক খেতে পায় না, এ আর থাকবে না। যে দেশ বেশী ধনী হয়ে উঠবে, সে দেশে সব লোক ছুটে যাবে, এতে করে যে দেশ গরীব সে দেশের লোক কমে যাওয়াতে সে দেশ প্রোপবশনেটলি রিচ হয়ে উঠবে। এতে করে ফ্রনটিয়ার ট্রাইবদের কি আর প্লেনে এসে হানা দিতে ইচ্ছে করবে? তারা হানা দেয় কেন? গরীব বলে, খেতে পরতে পায় না বলে। নিছক পাগলামি তারা করে না।

নিরঞ্জন অন্যমনস্কভাবে কহিল, তুমি বলছিলে ট্যাক্স থাকবে না, কেন?

—কি করে থাকবে? কে ট্যাক্স দেবে? মানুষ তো আর রোজগার করবে না। সঙ্ঘ? কেন ট্যাক্স দেবে? সব কাজ কি করে হবে

আমি গোড়াতেই বলেছি। ট্যারিফ? ইমপসিবল। সোভিয়েট রাশিয়াতে কেন ট্যারিফ ওয়াল্ নেই, অমলকে জিজ্ঞেস কর।

অমল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, সঙ্ঘবাদ ন্যাশনাল না ইনটারন্যাশনাল?

—ন্যাশনাল হলেও লোকসান নেই। রাশিয়ার সেকেণ্ড ইনটার-ন্যাশনাল এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে—ন্যাশনাল মুভমেণ্ট। থার্ড ইনটার-ন্যাশনালের জোর আর দেখছি না—ট্রট্স্কিকে তাড়িয়ে সবাই ঘরমুখো হয়েছে। সঙ্ঘবাদ গোড়াতে হবে ন্যাশনাল, পরে সেটা সব দেশে ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য এক ফোঁটা রক্তপাতও আমরা করবো না। কোথা থেকে সুরু হবে, কে জানে?

নিরঞ্জন কি যেন বলিতে গেল, পবিত্র বাধা দিয়া বলিল, আজ আর নয়, কথা বলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

লতিকা করুণ নয়নে পবিত্রের দিকে চাহিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল, বেশ তো, আজ আর কোন কথা নাই বা বললে। নিরঞ্জনবাবু না হয় কাল জিজ্ঞেস করবেন।

নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইল, হাসিয়া বলিল, একটা কথা, না হয় কালই জিজ্ঞেস করবো।

পবিত্র ম্লান হাসিয়া কহিল, শুধু একটা কথা? বলেই ফেল না, কাল আবার কেন?

—হাঁ, শুধু একটা কথা। তুমি বলছিলে, রক্তপাত হবে না, কিন্তু ক্যাপিটালিস্টরা কি ছেড়ে দেবে?

—ছেড়ে না দিয়ে মড়া কোলে করে তো বসে থাকতে পারে না! ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি একেবারে অচল। ফ্যাসিজম্ও বেশী দিন টিকবে না। কমিউনিজ্ম চালালে ক্যাপিটালিস্ট মরবে—একটি

বড লোকও টিকে থাকতে পারবে না—দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেবে না? তাকে কাজ কবে যেতে হবে যে। আর নতুন সমাজে এসব কোন হাঙ্গামাই নেই; আজ যে বড়লোক, কালও সে বড়লোক থাকবে—যা চাইবে তাই পাবে। এর বেশী সে আর কি আশা করতে পারে বল?

অমল চুরুটেব ধোঁয়া ছাডিয়া ভাবিল, সে বড়লোক, এটাই হচ্ছে গিয়ে ধনীর সব চেয়ে বড ডিস্‌টিঙ্কটিভ ফীচাব, এটা কি সহজে সে ছেডে দেবে?

গভীর রাত্রি। পবিত্র ক্লান্ত; তাহাকে আর ঘাঁটাইতে অমলের ইচ্ছা হইল না। সে গভীর মনযোগের সহিত ধোঁয়ার খেলা দেখিতে লাগিল।

মাতৃত্ব

১

রবিবার।

ছুটির দিন। লতিকার অনেক কাজ; সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত, বাড়ীর জঞ্জাল আর আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে, ঘর গোছায়, টেবিল সাজায়, বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় বদলায়, এবং ইহারই ফাঁকে এক একবার পবিত্রকে দেখিয়া যায়।

অমল আর পার্ক সার্কাসে আসে নাই। পবিত্রকে চিঠি লিখিয়াছে, তোমার কথাগুলো অনেকবার ভাল করে ভেবে দেখেছি; যুক্তির অভাব দেখিনি। কমিউনিজমের নিন্দে করেছ, এরও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তোমার সঙ্ঘবাদ মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যেটা স্বাভাবিক সেটাই যে মানুষ সব সময় মেনে নেবে, এর কোন মানে নেই। ক্যাপিটালিস্ট্, এজ অব প্লেন্‌টিকে এজ অব স্কার্‌সিটি করতে চাইছে, নিজে বাঁচবে বলে; মানুষের কথা ভাবছে না,—মানুষের সুখ দুঃখের কথা সে কোন দিন ভাবেনি। সেল্‌ফ অ্যাগ্রাণ্ডাইজমেণ্ট হচ্ছে তাদের শাস্ত্রের সব চেয়ে বড় কথা; মরতে মরতেও পুরোনো সমাজকে আঁকড়ে বসে থাকবে;—জানে সে সব, কিন্তু মানতে চাইবে না। আমাদের শাস্ত্রে যাদের জ্ঞান-পাপী বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে তারা। মানুষের একটা সহজাত স্বার্থবুদ্ধি রয়েছে, সেটাকে পেরিয়ে একটা ইন্‌টেলেকচুয়াল জিম্‌নাস্‌টিক করে—কসরৎ

করে আর একটা সত্যকে সে মেনে নিতে চায় না। এই সহজাত স্বার্থবুদ্ধি হ্যাজ দি ফুলেষ্ট স্কোপ ইন্ প্রেজেন্ট ডে ইকনমিক্ ন্যাশনালিজম্। একে বাধা দিতে হলে, ক্লাস ওয়ার অ্যাবসলিউট্‌লি এসেন্‌শিয়াল্। রেভলিউশনের ছবি সব সময় তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠলেও তুমি হচ্ছো বাই নেচার অ্যান এভলিউশনিষ্ট। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি; তুমি ভাবছো, ক্যাপিটালিস্‌ট সোসাইটি আপনা আপনি ভেঙে পড়বে; মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে বাহাদুরি করার দরকার কি? বাহাদুরি করা এটা নয়; যেটা মরবে, মরতে মরতেও প্যারালাইজড্ হয়ে থেকে সেটা নিজেও ভোগে, আর পাঁচজনকেও ভোগায়। এটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হবে, নইলে আরও বেশী করে ভোগাবে।

ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিঙ্কশনকে তুমি নিউ অর্ডার অব সোসাইটির মোটিভ্ পাওয়ার বলে ঠিক করেছ। এতে আমার আপত্তি নেই, আমি মেনে নিচ্ছি, এতে করে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু আর একটা কথা ভেবে দেখেছ কি? বড়লোক যে, সে যে সত্যি সত্যি বড়লোক, আর পাঁচ জনের চাইতে তার যে অবস্থা ভাল,—এই যে ভ্যানিটি, এটা কি বড়লোকের ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিঙ্কশন্ স্যাটিস্‌ফাই করে না? একথা মেনে নিলে, কি করে বলি, বড়লোক তার প্রিভিলেজড্ পজিশন্ ইন্ সোসাইটি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে? এর জন্যও চাই ক্লাস ওয়ার।

এবারে আমাদের দেশের কথা বলছি। আমরা হচ্ছি ষোল আনার উপর আঠার আনা প্যাসিভিষ্ট; শুতে পেলে বসতে চাই না। আত্মশ্লাঘা বলে কিছু আমাদের নেই,—থাকলেও "লাখে না মিলল এক"! এ অবস্থায় ডিজায়ার ফর ডিস্‌টিঙ্কশন আমাদের পক্ষে কতটা

কার্য্যকরী হবে, গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার। আজ বিকেলে আমি কানপুর যাচ্ছি, দিন পনর পরে ফিরবো। এর পর একদিন তুজনে বসে তুটো ডকট্রিন্‌এর প্রস্‌ এণ্ড কন্‌স্‌ ভাল করে ডিস্‌কাস করবার ইচ্ছে রইল। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম চাই; সেটাও ভেবে ঠিক করতে হবে।

চিঠির শেষে পি. এস. দিয়া লিখিয়াছে, তোমার ডকট্রিনে কমিউনিটি ইন্‌ দি ইন্‌ডিভিডুয়াল অ্যাণ্ড ইন্‌ডিভিডুয়াল ইন দি কমিউনিটি ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে।

নিবঞ্জনও অনেক দিন এ বাড়ীমুখো হয় নাই।

আড্ডা আর বসে না। পবিত্র আর লতিকা। পবিত্র পড়ে আপন মনে; লতিকা তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বসিয়া থাকিতে থাকিতে হয়রান হয়।

অমলের গাড়ীতে আরও তুইবাব লতিকা লাভ্‌লক্‌ প্লেসে গিয়াছে; চিত্রা তখন সেখানে ছিল। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে; তুজনেই মনেব কথা বলে না, এত কাছে অথচ কত দূরে! নিরুপমা কথা বলে, গল্প কবে,—কিন্তু আগেকার মত নয়—নীরস ভদ্রতা। লতিকাব আব বালীগঞ্জেব নাম করে না; বুকের ভিতরটা তাব যেন কেমন কবে।

দ্বিপ্রহরের আহারের পব লতিকা পবিত্রের গা ঘেঁসিয়া বসিল; তাহার হাত লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

এমনি ভাবে পাঁচ সাত মিনিট কাটিল। পবিত্রের বুকে মাথা রাখিয়া আদরেব স্বরে বলিল, বসে বসে এখন কি করবে?

—কি আর করবো? বসে থাকবো। বলিয়া পবিত্র ম্লান হাসিল। লতিকা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইল।

ভাদ্র মাস; ভয়ানক গুমোট গরম কিছুতেই ঘুম আসিল না।

—নাঃ, এভাবে আর বসে থাকতে পারছি না।

লতিকা আবার পবিত্রের নিকট আসিল, দেখিল, একখানা কাগজে সে যেন কি আঁকিতেছে।

—কি আঁকছো?

পবিত্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুঠার মধ্যে পূরিল; স্মিত হাস্যে বলিল, দেখে ফেলেছ? এখন না, পরে বলবো, যদি ঠিক হয়।

—না, এখনই দেখাতে হবে।

পবিত্র সেখানা লতিকার হাতে দিল।

—কি এখানা? কার কুলজি?

—বাঙলার।

—বাঙলার কুলজি! কত খেয়ালই না তোমার হয়! এ দিয়ে কি হবে?

—কি করে বলবো?

—বেশ যা হোক! বিকেলে কি করবে? ঘরে বসে থাকবে?

—আগে বিকেল হোক। দাও আমায় কাগজখানা। লতিকা সেখানা টেবিলের উপর রাখিল।

—চুপ করে বসে রইলে যে?

—তুমি বসে রয়েছ যে। সব গুলিয়ে দিলে।

—বেশ হয়েছে, এবারে গল্প কর।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, কি গল্প করবো? ভূতের?

—ভূতের গল্প তোমাব চাইতে আমি ভাল বলতে পারি।

—তাহলে তুমিই বল, আমি শুনছি।

—না না, ভূতের গল্প আর ভাল লাগে না। সামনে কি আসছে তাই বল।

—ক্ষেপেছ! তার চেয়ে তুমি ববং দু কাপ চা করে নিয়ে এস।

—এখনও চারটে বাজেনি। এই তো ভাত খেয়ে উঠলে।

পবিত্র আবার মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো তোমায়; নইলে সময় কাটাবে কি করে?

লতিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি সব সময় আমায় টুকবে! ঘরে বসে বই আমিও পড়তে পাবি। কেন পড়বো? যা হবে না, হতে পাবে না, তা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা গরম করতে আমি চাই না। সেদিন রাত দুপুব অবধি বকলে, কাব ঘুম হয়নি? সাবা বাত পাশে বসে কে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল? অমলদা না নিবঞ্জনবাবু?

পবিত্র লতিকাকে কাছে টানিয়া আনিল, সস্নেহে বলিল, আজ যেটা হয়নি, সেটা যে কোনও দিন হবে না, ভাবছো কেন?

মুখ কালো করিয়া লতিকা জবাব দিল, কেন ভাববো না? আব যদিই বা হয তাতে আমার কি? এত দূরেব কথা নিয়ে আমাব মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। তোমরা যেমন কেউ ঘরের খবর বাখবে না, দুনিয়ার কথা ভেবে মাথা গবম কববে, একটু অমত হলে অমনি হাতাহাতি মারামারি সুরু করে দেবে!

—আমি হাতাহাতি করেছি?

—না করলে কি হলো, তর্ক কবতে তোমবা কেউ কম নও। অমলদা ছুটে পালাল যে?

—পালায়নি।

—পালান আর কাকে বলে? তোমরা সবাই জুটেছ বেশ!

নিরঞ্জনবাবু, ঘরেতে স্ত্রী রয়েছে, তাকে একলাটি ফেলে রেখে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়ান। গল্প আর তর্ক করতে পারলে সেখানে একেবারে জমে যান, দুনিয়ার কোন কথা আর মনে থাকে না। স্ত্রী বেচারা পথ চেয়ে বসে বসে রাত ভোর ঝিমুচ্ছে, এ হুসও তাঁর নেই।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, যাক্ বাঁচলুম! ঝাঁজটা তাহলে নিরুর উপরে গিয়ে পড়েছে; যাক্ বাঁচলুম।

লতিকা এবার সত্যই রাগিল; বলিল, তুমিও একটি চীজ! কেউ কম নও। এক একজন মূর্ত্তিমান থিওরি! হয় অনর্গল বকে যাবে, না হয় কাঠ হয়ে বসে থাকবে।

পবিত্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, মাথা শুধু আমারই গরম হয়, না?

বড় বড় চোখ পবিত্রের চোখের উপর রাখিয়া লতিকা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মাথা খারাপ হয়েছে, আমার?

—না, আমারই ভুল হয়েছে। খুবই সুস্থ অবস্থা।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল।

—সব তাতেই ঠাট্টা।

লতিকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, হন্ হন্ করিয়া নিজেব ঘরের দিকে গেল।

পবিত্র তাহার পিছন পিছন ছুটিল।

২

বিকাল সাড়ে চারটা।

চা খাওয়া শেষ হইয়াছে।

পবিত্রকে বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে দেখিয়া লতিকা শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এত রোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

পবিত্র ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, নিরুর ওখানে যাচ্ছি, অনেক দিন গৌরী আর মণ্টুকে দেখিনি।

লতিকার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল; তিক্তস্বরে বলিল, যাচ্ছ যাও। দাঁড়িয়ে রইলে যে?

পবিত্র ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধ করিল; করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কেন? তুমি কোথাও বের হবে?

—না।

—তাহলে ওরকম করে উঠলে যে?

—কি আবার করলুম? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! যেতে চাও যাও, কে তোমায় ধরে রেখেছে?

পবিত্র থতমত ভাবে বলিয়া ফেলিল, মাধুরী এখানে আসে না, বলে কি—

—কেন বাজে কথা বলে দেরী করছো? এ কথা কি আমি কোন দিন বলেছি?

পবিত্র হতভম্বের মত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

লতিকার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল, কেন এমন হয়? সে পবিত্রের পাশে গিয়া দাঁড়াইল; আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, রাগ করেছ? তুমি

আজকাল একটুতেই রেগে ওঠ। ওঠ, যাও লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, মেজাজটা কেন জানি না আমার দিন দিনই বিশ্রী হচ্ছে। যাও একবার গিয়ে তাদের দেখে এস গে। অনেক দিন খোঁজ নেওয়া হয়নি; নিরঞ্জনবাবুও আর এদিক মাড়ান না।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পবিত্র বলিল, আজ থাক, আর একদিন দেখে আসব এখন; চল, দুজনে টকি দেখে আসিগে।

লতিকা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল; তীব্র কণ্ঠে কহিল, কেন যাবে না? তাদের তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না? তোমার বোনের ছেলে মেয়েদের?

করবে না কেন? করে বই কি। আজ না হয় নাই গেলুম, নিরু হয়তো এর ভেতরে এসে পড়তে পারে।

—তুমি যাচ্ছ না শুধু আমার ওপর রাগ করে।

পবিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

—তোমার ওপরে রাগ করেছি? আমি?

—করলে তো বেঁচে যেতুম।

পবিত্র কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কি হয়েছে?

—কি আর হবে? এমনি বলছি। যাও আর বসে থেকো না। শীগগির করে ফিরে এসো, বেশী রাত করো না—সাড়ে নটার শোতে নিউ এম্পায়ারে যাব এখন।

পবিত্র স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল।

—উঠবে না তুমি? মণ্টুদের দেখতে যাবে না?

—না।

লতিকার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

—কেন যাবে না ? সব তাতেই তোমার একগুয়েমি।

—কেন তুমি ও কথা বললে ?

—কি বললুম আমি ? লতিকা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

মুখ কালো করিয়া পবিত্র জবাব দিল, আমি কি কবলে তুমি বেঁচে যাও।

লতিকা হাসিয়া উঠিল ; বলিল, বেফাঁস কথা কি কেউ বলে না ? তুমি না বললেও আমি রীজ্‌ন দিয়ে কথা বলতে শিখিনি।

—কথা বেফাঁস হতে পারে, কিন্তু সেটা সত্যি।

ইহার পর উভয়ে কিছুক্ষণেব জন্য চুপ করিয়া রহিল।

লতিকার আর সহ্য হইল না, নিরুপায় হইয়া বলিল, রোজ রোজ তুমি গিয়ে তাদের দেখে আসবে ; আমায় একটিবারও দেখালে না, এদেরও না, তোমাব বোনেব ছেলেদেরও না। আমার আব দেখতে ইচ্ছে করে না, না ?

ম্লান হাসিয়া পবিত্র জবাব দিল, দেখাবার ইচ্ছে কি আমারও হয় না ? ভুলে যাই যে।

লতিকা মনে মনে বলিল, এ ভুল তোমার চিবকাল হবে।

পবিত্র ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, একদিন মাধুরীকে নেমন্তন্ন করলে হয় না ?

—তোমার ইচ্ছে হয় করো, মাধুরী তোমার বন্ধুব গিন্নী।

—আর তোমার ?

—আমাব আবার কে ? সেজন্যে ভাবতে হবে না তোমাব—আমি সব ঠিক করে রেখে যাব এখন।

—সেটা ভাল দেখাবে না।

—না দেখালে কি করছি বল ; এর বেশী আমায় আর কিছু করতে বলো না—আমি পারবো না।

পবিত্র কোন কথা বলিল না। কি যেন ভাবিতে লাগিল।

লতিকা অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে বের হবে না আজ ? ঘরে বসে থাকবে ?

পবিত্র নিরুত্তর।

লতিকা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সারা দিন তো ঘরে বসে কাটালে, না হয় একবার পার্কে ঘুরে এস।

—আর তুমি ? তুমি কি করবে ?

—আমি আবার কি করবো ?

—বাইরে বেরুবে না ?

—না।

—কেন ? নিউ এম্পায়ারে যাবে না ? এখনো ঢের সময় রয়েছে।

—না।

—সবই না ! এরকম হয়ে গেলে কি করে ?

—না হয়ে আর করছি কি ? তুমি তো আমার কথা রাখলে না।

পবিত্র অবাক হইল ; বলিয়া উঠিল, তোমার কথা রাখিনি ? আমি ?

মুখ কালো করিয়া লতিকা জবাব দিল, ছোট খাট কথা কে আর না রাখে ? গোড়াতে ঠিক রয়েছ, একচুলও এদিক ওদিক হয়নি।

লতিকার হাত ধরিয়া পবিত্র পাশে বসাইল ; সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথা তোমার আমি রাখিনি ?

হতাশ ভাবে লতিকা জবাব দিল, যে কথা বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গেছি, জানি আমি তুমি রাখবে না। লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে তবুও আমি বলেছি, আর কতবার বলবো ?

নিদারুণ দুঃখে পবিত্র কহিল, পুরুষ নারীকে যা দিতে পারে, কোনটাই তোমায় আমার অদেয় নেই। একটা দিক আমার একেবারে নেই। এ তো আমি গোড়া থেকে বলে এসেছি, এদ্দিনও কি তুমি বুঝতে পারনি ?

লতিকা মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করিল, সে তো আমি আজ অবধি চাইনি। এ নিয়ে ঝগড়াও করিনি কোন দিন।

—তা হলে কেন সব সময় মন গুমরে বসে থাক ? মানুষ কি যা চায় সব পায় ? পায় না।

—আকাশের চাঁদ ধবে দিতে আমি তোমায় বলিনি। তোমার সব কথা তুমি বাখনি—খেলাপ কবেছ তোমার কথা, এখনও বুঝতে পারছ না ? এব চাইতে বড় দুঃখ, বড় লোকসান আমার আর নেই। বলিয়া লতিকা পবিত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পবিত্র মর্ম্মাহত হইল, হতভম্বের ন্যায় বলিয়া উঠিল, কথার খেলাপ কবেছি, আমি ? তাতে তোমাব সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ হয়েছে ?

পবিত্রেব বুকে মুখ লুকাইয়া লতিকা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, তোমাব সব কথা বেখেছ ? বলনি তুমি—এখানে চলে আসবার আগে, বৌদির সামনে, আমি সব পাব, পাব না শুধু একটি জিনিষ ? তুমি কি আমায় সব দিয়েছ ?

—দিইনি ?

—এতেই সব দেওয়া হয়ে গেল ? তুমি পুরুষ !

—আমি তোমায় সব দিইনি ? কি বলছো, লতি ? তোমার কোন কথা আজ আমি বুঝতে পারছি না।

—পারবে কি করে ? তুমি যে বেটাছেলে, তোমাব কাছে এ জঞ্জাল যে ভাল লাগবে না ? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, নাবী আমি,

এটা আমার স্বাধিকার; মাথা খুঁড়ে মরলেও এ অধিকার তুমি পাবে না? এত খোসামোদ তোমায় আমি করতুম না; ইচ্ছে করলেই তোমায় ফাঁকি দিতে পারি, দিইনি, তোমায় হারাব বলে।

পবিত্র এতক্ষণ পর আলোর সন্ধান পাইল; সেই আলোকে সূচীভেদ্য তমিস্রার সৃষ্টি হইলে সে একেবারে অন্ধ হইয়া গেল।

লতিকা নির্ম্মম ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কথার খেলাপ করনি তুমি?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পবিত্র অস্ফুট ধ্বনি করিল, করেছি; শুধু তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে! হা—হা—হা।

লতিকা নির্ম্মম।

—এ বিষ! তীব্র হলাহল! তোমায় কি করে হাতে তুলে দেব?

—এ বিষের জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে মরবো। দাও তুমি আমায় সে তীব্র কালকূট; আমি হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলবো।

—এ বিষ আমি নিজে খেতে পারি না—

—তা আমি জানি; শিবের মত শক্তি, নীলকণ্ঠ হবার সাহস তোমার এখনও হয়নি।

—শিব আমি! এ কালকূট আমার কিছু করতে পারবে না, পুরুষকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে মুহূর্ত্তের জন্য;—কিন্তু নারীর মৃত্যু অনিবার্য্য, কেউ রুখতে পারে না।

—ভুল, সব ভুল। এটা থিওরি নয়—যুক্তি তর্কের স্থান এতে নেই;—দাও তুমি সেই বিষ আমার হাতে তুলে। নইলে, সবাইকে ডেকে বলবো, তুমি তোমার কথা রাখতে পারনি—ভুলিয়ে ঘর থেকে বের করে এনে তুমি আমায় পথে বসিয়েছ।

৩

লতিকা কাঁদিয়া ফেলিল ; বলিল, ওগো তুমি থাম, আমি আর শুনতে পারছি না।

—না, তোমায় শুনতেই হবে ; আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। পবিত্র নির্মমভাবে বলিয়া উঠিল।

দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে গিয়া লতিকা থমকিয়া গেল ; তাহার দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রু বহিতে লাগিল। অসহ্য যাতনায় সে অধীর—অথচ নিশ্চল, নিথর।

—তরুবালা যেন কি রকম হয়ে গেল ; মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরুচ্ছিল না—একেবারে নিস্তব্ধ। আমার হাত চেপে ধরে রেখেছিল, উঠতে দেয়নি। দুই চোখে তার কি করুণ মিনতি ;—এখনও ভাসছে। নিরু কেঁদে উঠল, বললে, আর বলো না তুমি। নিদারুণ দুঃখে সে একটু হাসলে ;—মনে হলো, তার আবার জ্ঞান হয়েছে। এর পরে সে আমায় কি বললে, জান? বলিয়া পবিত্র লতিকার দিকে একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

লতিকা কোন কথা বলিল না ; শুনিবার আগ্রহ তাহার আর নাই ; তাহাকে যে বাধা দিবে এ শক্তিও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

—সে আমায় যা বললে, কোন মেয়ে কোনদিন তা ভাবতে পাবে না ; স্বপ্নে সে কেঁদে উঠবে। তরু বললে, আমার ছেলে যদি আজ মরে একটুও দুঃখ হবে না আমার।

লতিকা অস্ফুট ধ্বনি করিল।

পবিত্র গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, কিন্তু তরুবালা মা। বুকের

ভেতরটা তার খাঁ খাঁ করতে লাগলো। সে কেঁদে উঠলো—এ রকম মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ আমি আর কখন শুনিনি! আমায় জড়িয়ে ধরে বলে উঠল,—আমি যা বললুম—সব মিথ্যে—সে চিরকাল বেঁচে থাকুক, এ আশীর্ব্বাদ তাকে করুন; তাকে গিয়ে বলুন আপনি, তার মা আঁতুড়ঘরে মরেছে—সে যা শুনেছে সব মিথ্যে।

তার পর পবিত্র নির্ম্মমভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এখনো কি তোমার মা হবার সখ যায়নি? এর পরেও কি তুমি বলতে চাচ্ছো—আমার কথা আমি রাখিনি?

লতিকা পবিত্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল; চোখের জলে বুক ভিজিয়া গেল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

পবিত্র অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিল, তোমার দুঃখ কি আমি বুঝি না? কিন্তু কি করবো? মা হবার ইচ্ছে তোমার স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক হচ্ছে বিয়ে, আজকের সমাজে।

বুকে মুখ লুকাইয়া লতিকা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে? বিয়ের ওপর সবাই জোর দিচ্ছে কেন?

—কেন দেবে না? দেওয়াই তো হচ্ছে স্বাভাবিক। আমাদের দুজনের এভাবে থাকা—সমাজ মেনে নেবে কেন? মেনে নিতে পারে না।

লতিকা কোন কথা বলিল না, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

পবিত্র জোরে একটা শ্বাস লইল; বলিল, নতুন সমাজ গড়ে না ওঠা অবধি, এ দুঃখ তোমায় পেতেই হবে। তুমি ভাবছো কেন? এ সমাজে দোষ কি? দোষ কিছুই নয়;—কিন্তু সেটা যে হবে আন্‌ন্যাচারাল।

লতিকা হঠাৎ উঠিয়া বসিল; তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কে বললে

আন্ন্যাচারাল? জোর করে সবাই একথা বলছে। বিয়ে হচ্ছে একটা কুসংস্কার।

পবিত্র শান্তভাবে উত্তর দিল, হতে পারে একটা কুসংস্কার। কিন্তু এ সংস্কারকে অস্বাভাবিক বলবো কি করে? আজকের সমাজে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক।

—এ সংস্কার ধ্বংস করতে হবে।

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল।

লতিকা জ্বলিয়া উঠিল।

—হাসলে যে বড্ড? ভয় পাচ্ছ?

—ভয়? ভয় কাকে বলে আমি আজ অবধি জানি না। তাই বলে যেটা স্বাভাবিক তার সঙ্গে লড়াইও করবো না।

লতিকার মন চঞ্চল হইল, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, আমাদের এ ভাবে থাকাটা—

—একে একেবারে অস্বাভাবিক বলবে কি করে? স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, সমাজ এ সব গায়ে মাখে না—যতদিন না জীব সৃষ্টি হয়।

লতিকা আহত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেকে সমাজ সহ্য করতে পারে না কেন?

—কেন সহ্য করবে? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কথাটা শুনলে অনেকে নাক সিট্‌কায়, কিন্তু এটা একেবারে খাঁটি কথা, এতে সমাজের মনের ভাব খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজ বলছে, ছেলে চাও—বিয়ে কর। আমার আওতায় থেকে, যেটা স্বাভাবিক সেটাকে বোধ করে, আমার নিয়মকে তোমায় মানতে হবে, নইলে এমন সাজা দেব, বুক কেঁপে উঠবে।

লতিকা মর্ম্মাহত হইল।

—বড্ড নিষ্ঠুর সমাজ।

—নিষ্ঠুর নয়, বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হচ্ছে।

কাঁদ কাঁদ ভাবে লতিকা বলিল, কেন আমায় ভয় দেখাচ্ছ? কেন? কেন সমাজ আমার কথা ভাবছে না?

পবিত্র এ কথার জবাব দিল না; ধীরভাবে বলিল, প্রজাপতি ব্রহ্মার আদি সৃষ্টিতে শাস্ত্র ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না, সমাজ ছিল না, রাজা ছিল না; দম্পতি জীবনে স্ত্রী-পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার ছিল সমান; এ স্বেচ্ছাচারিতার স্বরূপ ছিল নিষ্পাপ; রাগ, দ্বেষ, এদের স্থান এতে ছিল না; মাতৃত্বের অবমাননা ছিল না—লাঞ্ছনা ছিল না।

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, মাতৃত্বের লাঞ্ছনা ছিল না? বিয়ে কি তখন হতো না?

—বিয়ের কথা সে যুগে কেউ মনে করতে পারেনি। কেন মনে করবে? সে যুগে ধন ছিল—সম্পত্তি ছিল না; ধন ছিল—সঞ্চয় ছিল না; সঞ্চিত ধন থাকলেও—উত্তরাধিকারী ছিল না; সম্পত্তি না থাকলে, উত্তরাধিকারী না থাকলে—বংশ থাকে না; বংশের যে সে যুগে দরকার হতো না; বিয়ে কেন থাকবে? নরনারীর অবাধ মিলনের রাস্তা ছিল খোলা; এ ছিল প্রকৃত সত্যযুগ।

লতিকার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল; অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আজকের যুগ কি করে এলো?

—এ যুগ এসেছে অনেক পরে। আত্মপরিতৃপ্তির সে যুগ বেশী দিন স্থায়ী হলো না। মানুষ হয়ে গেল অনেক, ধন হয়ে গেল কম; দেখা দিল সম্পত্তিবাদ। সম্পত্তিবাদও পুরোপুরি অধিকার বিস্তার করতে পারেনি তখনো,—জোর করে দখল রাখাই হলো গিয়ে মানুষের

সামাজিক জীবনের উন্মেষণ। ছোট বড় সব জিনিষের ওপরে পুরুষ অধিকার বিস্তার করতে লাগলো—নারীকেও বাদ দিলে না। কিন্তু তখনও নারীর স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে কমে যায়নি। সত্যযুগের পর এলো মুহূর্ত্ত সতীত্বের যুগ।

—মুহূর্ত্ত সতীত্বের যুগ?

—হাঁ, মুহূর্ত্ত সতীত্বের যুগ। সুন্দরী রম্ভা চলেছে যৌবনভরে মনোনীত পুরুষের সঙ্গে অভিসার উদ্দেশ্যে; পথে পড়লো, অশেষ শাস্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণতনয় লঙ্কেশ্বর রাবণ;—দশানন কত সাধ্য সাধনা করলে—তরুণী রম্ভার মন গলে গেল—কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে বললে, আজ নয়। আজ আমি অন্যের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করে বের হয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিলে, আর একদিন সে লঙ্কেশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ করবে। পাষণ্ড নিবৃত্ত হলো না—বল প্রয়োগ করলে। দিলে বালা অভিশাপ—রক্ষা পেল সীতার সতীত্ব।

লতিকা নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

—এর পর এলো একটা যুগ, যে যুগে পুরুষ নারীর উপর এমন একটা অধিকার বিস্তার করলে—যেটা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার—কেনা-বেচার সম্বন্ধ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে পাঞ্চালীকে পণ করলেন—রাজ্য, বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে। ও যুগে আমরা একটা কথা শুনেছি—ক্ষেত্র যার পুত্র তার। সতীত্বের এত বাঁধ তখনও হয়নি।

লতিকা অবাক হইল; বলিল, বিয়ে ছিল—সতীত্বের বাঁধ ছিল না।

—এটা হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে। সে যুগে বংশে প্রাধান্য ছিল—সমাজ ছিল গোষ্ঠির, সম্পত্তি ছিল গোষ্ঠির—বাঙলার বাইরে এখনও রয়েছে। বিয়ে ছিল—সন্তান হতো বংশের। বংশরক্ষার জন্য

নারীর সতীত্ব বর্জ্জন করা অশোভন ছিল না। কুন্তীর তিন পুত্র—যাদের জনক দেবতা—পিতা মহারাজ পাণ্ডু।

পবিত্র লতিকার দিকে চাহিল; সে কোন কথা বলিল না।

—ইন্‌ষ্টিটিউশন অব প্রাইভেট প্রপারটি নেই—বিয়ে হলেও সতীত্বের কড়াকড়ি থাকে না—জনককে জানবার কোন দরকার নেই—দাসীপুত্রও গোষ্ঠিতে স্থান পায়।

লতিকা বাধা দিল, বলিল, আজ সতীত্ব নিয়ে এত কঠিন বিধি-নিষেধ দেখছি কেন? বাঙলার বাইরে গোষ্ঠিই সম্পত্তির মালিক, বাঙলার বাইরের হিন্দুনারী অসতী নয়।

—একথা সত্যি। কিন্তু সেখানেও ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অব প্রাইভেট প্রপারটি রয়েছে—যেটা সে নিজে রোজগার করে, সেটা তার ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি; ছেলেই তার উত্তরাধিকারী।

তারপর পবিত্র বলিল, আজকালকার সমাজে গোষ্ঠির প্রাধান্য অনেক কমে গিয়েছে—কমিউনাল প্রপার্টি নেই বললেই হয়। যারা যত বেশী সিভিলাইজড্ তাদের ভেতরে তত বেশী করে সতীত্বের কড়াকড়ি—এ নিয়ে লাঠালাঠি।

—তুমি বড্ড ভুল করছ। বলিয়া লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

—ভুল আমি মোটেই করিনি। বিলেত আর আমেরিকার ডিভোর্স কেসগুলো দেখে তোমার একথা মনে হচ্ছে। আমরা অসতী স্ত্রীকে ত্যাগ করি, কিন্তু তাকে ডিভোর্স করতে পারি না—স্ত্রী পুরুষ কেউ পারে না; হিন্দু সমাজ ডিভোর্স করতে দেয় না, বলে, স্ত্রী অসতী হলেও তোমার—একে ফেলবে কি করে? সাহেবরা অসতী স্ত্রীকে একেবারে সহ্য করতে পারে না—ডিভোর্স তাকে করবেই করবে। কেন? সম্পত্তি যে তার নিজের—পরপুরুষের ছেলেকে কি করে সে

সম্পত্তি ভোগ করতে দেবে—উত্তরাধিকারী হতে দেবে? কম্-প্যানিয়নেট্ ম্যারেজ্—ঈজি ডিভোর্স—সবই শুন্‌চি। বিয়ে একেবারে তুলে দাও, কটা লোক বলছে সে সব দেশে? ইসাডোরা ডান্‌কান্, প্যাঙ্কহার্স্ট, এঁরা কথাটা তুলেছিলেন বটে; কিন্তু ঐ অবধি। অবশ্য ডিভোর্স করার অনেক সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে।

লতিকা কি যেন বলিতেছিল, পবিত্র বাধা দিল; কহিল, ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অব প্রাইভেট প্রপারটি থাকবে—বিয়ে থাকবে না—এ একটা অসম্ভব কথা।

লতিকার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

—সোভিয়েট রাশিয়া বিয়ে তুলে দিচ্ছে, এখনও একেবারে তুলে দিতে পারেনি, বিলিফ্ ইন্ প্রাইভেট প্রপার্টি এখনও সে দেশে রয়েছে। পাকা কমিউনিষ্ট হলে বিয়ে আর থাকবে না। বিয়ের যে আর দরকার নেই। কে চাইবে জানতে, ছেলে কার? মাতৃপরিচয়ই যথেষ্ট। তারও কোন দরকার নেই—সম্পত্তি ভোগদখলের কথা যে আর নেই।

পবিত্র কহিল, মা হবার অধিকার—নারীর স্বাধিকার; তোমার এ কথা হাজারবার সত্যি। এটা তার জন্মগত অধিকার হলেও, নারীর এ অধিকার এখনও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হচ্ছে।

—আর কি দুঃখ তাকে পেতে হচ্ছে?

—ক'বার ছেলে হবে—এ কে ঠিক করবে?

—বিয়ের পর আর এ কথা উঠতে পারে না।

—কেন?

—একটু আগে তুমি বললে না—ছেলের মা হতে চাও তো বিয়ে কর?

পবিত্র সহাস্যে উত্তর দিল, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি; ক'বার ছেলে হবে—নারী যদি নিজে সেটা ঠিক করতে না পারে,—কি করে বলবো মা হবার স্বাধিকার তার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

লতিকা পবিত্রের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

—মুখে স্বাধিকার বললে হবে কেন? কি দেখছি আমরা চারদিকে? ফি বছব মা হয়ে হয়ে নিজেদের তারা ধ্বংস করছে না? এটাকে কি স্বাধিকার বলবো? মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম পরিণতি, পরম তৃপ্তি—একথা সত্য কি না একমাত্র নারীই বলতে পারে। সত্যি হলেও এ পরিণতি, এ তৃপ্তি নারী চায় কি না—নারী নিজেই ঠিক করবে। পুরুষকে কোন কথা বলতে দেওয়া হবে না; এ হলেই না বলতে পারি এটা হচ্ছে নারীর স্বাধিকার।

লতিকা দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কি তুমি বলতে চাচ্ছ, মা হবার অধিকার আমার নেই?

—আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে; এটা যে তোমার স্বাধিকাব। কিন্তু সমাজ তো এখনও সে কথা মেনে নেয়নি।

লতিকার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা কবিল, কেন মেনে নেবে না?

—কি করে মেনে নেবে? সমাজ যে গোষ্ঠির উপবে দাঁড়িয়ে, ব্যক্তির স্থান অনেক নীচুতে। শুধু এই নয়, নারীর এ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক বাধা রয়েছে।

—কি বাধা তোমায় বলতে হবে। বলিয়া লতিকা সামনে ঝুঁকিয়া বসিল।

—ইচ্ছে করলেই নারী মা হতে পারত না, পুরুষের সাহায্য

তাকে স্বীকার করে নিতেই হতো। এখন অবশ্যই এ নিয়ে তাকে আর ভাবতে হবে না।

লতিকা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

পবিত্র গম্ভীর ভাবে বলিল, সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে লজ্জা করলে কি চলে? যত দিন বিজ্ঞান এ পন্থাব আবিষ্কাব কবতে পাবেনি, মেয়েদের অবস্থা বেশী কবে পরাধীন ছিল না কি?

লতিকা অস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিল, ছিল—কিন্তু—

—আমি বুঝতে পেরেছি; শুধু সেদিক দিয়েও নয়। যাক্, যে কথা বলছিলুম। বিয়ে করেও সব মেয়েরা মা হয় না।

—কেন হয় না?

পবিত্র একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল।

—ইচ্ছে কবলেই কি সব মেয়ে যখন তখন মা হতে পারে?

লতিকাব মুখে চোখে কে যেন আবার আবীর ছড়াইয়া দিল, সে নিরুত্তর।

—এ সব আব হবে না। এতেও শেষ হযনি। কথায় বলে—যত সব পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা—এ বন্যাস্রোত নারী রোধ করতে পারে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, ইচ্ছে করলেই ছেলে, ইচ্ছে করলেই মেয়ে—যা চাইবে তাই পাবে। কন্যা-প্রসবিনী নারীকে পুত্রমুখ দেখবার জন্য আর তাকে তাগা মাদুলিতে সালঙ্কারা হতে হবে না।

লতিকার চোখে অবিশ্বাসের হাসি।

—কি করে জানলে? তুমি কি গুনতে জান?

পবিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, একটু জানি বই কি।

লতিকা মাথা ঝাঁকাইল; আদরের স্বরে বলিল, কি করে জানলে? বলো না?

—কেন ছেলে হয় আর কেন মেয়ে হয়, এ নিয়ে সায়েন্স অনেক দিন থেকে মাথা ঘামাচ্ছিল, এত দিন পরে ঠিক করতে পেরেছ।

—কি করে ঠিক করলে তারা? লতিকা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—আমি কি করে বলবো? আমি তো আর সায়েন্টিষ্ট নই। মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটাকে তারা একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে একটা বিরাট এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট হচ্ছে, বিশ লাখ গরু নিয়ে।

তারপব পবিত্র এ সম্বন্ধে তাহাকে সকল কথা জানাইল।

লতিকা অবাক হইল; বলিয়া উঠিল, এ কি সত্যি?

পবিত্র কোন উত্তর দিল না; শুধু একবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

কয়েক মিনিট পর সে আবার বলিল, এতে তোমাদের কত সুবিধা হয়েছে।

লতিকা অপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিল, কি আর সুবিধা হয়েছে?

—সুবিধা হয়নি? ইচ্ছে করলে মা হতে পারবে; খুশী না হলে হবে না। যদি মনে কর ১৫ই ডিসেম্বরে মা হবে—সেই দিনই হবে। অবশ্য ছেলেকে চুমো খেতে কয়েক মাস সবুব করতে হবে। খুশী হলে ফি বছর মা হবে। আব যদি না চাও, দুবছর বাদে, না হয় পাঁচ বছর পর—যে দিন খুশী সে দিন। শুধু ছেলে চাও ছেলেই পাবে—আর মেয়ে, তাই হবে। এর ভেতরে বেটাছেলের আর কোন কথাই চলবে না। এ নইলে কি আর স্বাধিকার!

লতিকা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, তা হলে তো—